প্রথম প্রকাশ ঃ ২৮শে সেপ্টেম্বর

প্রকাশক ঃ দেবী চট্টোপাধ্যায়
নবমন প্রকাশন
৯২, পি. কে. গুহ রোড
কলিকাতা-৭০০০২৮

মুদ্রক ঃ মিহির মুখোপাধ্যায়
টেম্পল প্রেস
২, ন্যায়রত্ন লেন
কলিকাতা-৭০০০০৪

উৎসর্গ

আমার পিতা শিশিরযুগের নাট্যশিল্পী
প্রয়াত শিবকালী চট্টোপাধ্যায়ের
স্মৃতির উদ্দেশে

সূচীপত্র

প্রকাশকের কথা

সমালোচনা-সাহিত্যে প্রবন্ধকার ও শিক্ষাবিদ শ্রীমনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় আজ সুপরিচিত ও প্রশংসিত। ১৯৩৩ সালের নভেম্বরে হাওড়া জেলার মৌরীগ্রামে জন্ম। পিতার কর্মজীবন কলকাতায় হবার কারণে এই শহরেই শৈশব থেকে বাস, শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্র। বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় জীবন থেকেই নাট্য ও সঙ্গীতে বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করেন এবং বিভিন্ন প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক দলে কাজ করেন। বর্তমানে তিনি গণসঙ্গীত শিল্পী ও নাট্য-সমালোচক রূপেও স্বীকৃত।

মনোরঞ্জনবাবু ষাটের দশকের সুরু থেকে বাংলা ভাষা-সাহিত্য ও ইতিহাসের শিক্ষকতা করছেন এবং নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। এ পর্যন্ত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় সাহিত্য, শিক্ষা, রাজনীতি, ইতিহাস, সঙ্গীত ও নাট্য বিষয়ে বহু প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তাঁর প্রবন্ধ মামুলি মৌমাছিতান্ত্রিক তথাকথিত 'প্রকৃষ্টরূপে বন্ধন' নয়, অধিকাংশই চিন্তার জট খোলার মত জোরালো ও ঝকঝকে।

সত্তরের দশক থেকে তিনি গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংগঠনের নেতৃত্বে কাজ করছেন। বর্তমানে শিক্ষক সমিতির মুখপত্র 'শিক্ষা ও সাহিত্য' এবং উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের 'সংসদ পরিচিতি' পত্রিকার সম্পাদকীয় উপদেষ্টা কমিটির সদস্য।

লেখকের প্রথম গ্রন্থ 'সংস্কৃতির সপক্ষে' ১৯৩৮ সালে প্রকাশিত হয়ে ১৯৩১ সালের মার্চে ৩য় সংস্করণের গৌরব অর্জন করে। দ্বিতীয় গ্রন্থ 'জীবনের সপক্ষে' শিল্পী-সাহিত্যিকদের সামাজিক ভূমিকা ও নাট্য-সঙ্গীত বিষয়ে মূল্যবান ও বিতর্কিত আলোচনা গ্রন্থ। ১৯৩২-৩৩ সালে মাতৃভাষা ও শিক্ষা এবং নন্দনতত্ত্ব বিষয়ে রচিত 'শিশুশিক্ষার ভাষা' ও 'সাহিত্য শিল্প ভাবনা' গ্রন্থ দুটির সম্পাদনায় খ্যাতি অর্জন করেছেন। কবিতা, ছড়া ও গণসঙ্গীত রচনাতেও তিনি বৈশিষ্ট্যের দাবি রাখেন। আমাদের পরবর্তী প্রকাশনা তাঁর নির্বাচিত কবিতা, ছড়া ও সঙ্গীতের সংকলন, যাতে স্বরলিপি সহ তাঁরই সুরারোপে গানও থাকছে।

আমরা এমন একজন গতিশীল লেখকের সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক মননধর্মী ও বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রবন্ধ-সংকলন প্রকাশ করতে পেরে আনন্দিত। অবশ্য এই

প্রয়াস তখনই সার্থক মনে করবো, যখন সাহিত্যের ছাত্র-ছাত্রী, সাধারণ পাঠক ও সংস্কৃতি আন্দোলনের অগ্রণী মানুষ গ্রন্থটির প্রকৃত মূল্যায়নে আগ্রহী হবেন এবং সুচিন্তিত পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করবেন।

লেখকের কথা

সুখের কথা, বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যের বই এখন, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন ছাপিয়ে শিল্প-সাহিত্যে অনুরাগী, আগ্রহী ও সাধারণ সংস্কৃতি কর্মীদেরও যথেষ্ট আকর্ষণ করছে। এ রাজ্যে প্রবন্ধ-সাহিত্যের যে-পরিমাণ চাহিদা ভারতের অন্য কোন রাজ্যে ততটা হয়নি। কারণ এখানে স্বাধীনতা-উত্তর গণতান্ত্রিক ও বামপন্থী আন্দোলনের ব্যাপ্তি ও গভীরতা তুলনায় বেশি। তাছাড়া এই অঞ্চলেই প্রথম ব্রিটিশ শাসনের বস্তুগত ও ভাবগত বুর্জোয়া আবহাওয়ার গোড়াপত্তন হবার কারণে যুক্তিবাদী চিন্তাধারার বীজ, রামমোহন-ডিরোজিও-অক্ষয় দত্ত-বিদ্যাসাগর-রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ মনীষিবৃন্দের উজ্জ্বল লেখনীতে, সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে হলেও, রোপিত হয়েছে। তারই উত্তরসাধনায় ও বিবর্তন-প্রক্রিয়ায় মননধর্মী সাহিত্যে আজ সারা ভারতের মধ্যে এ রাজ্যই অগ্রণী। সাক্ষরতায় কয়েকটি রাজ্য এগিয়ে থাকলেও প্রকৃত শিক্ষার অভাবে প্রবন্ধের বা যুক্তিবাদী সাহিত্যের কদর বাড়ে না। ছোট্ট রাজ্য হলেও কেরল ও ত্রিপুরার কাছেও এই যুক্তিবাদী গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের শিক্ষা অনেক বড় বড় রাজ্যেরও নেবার আছে।

মানুষের মনোভূমিতে যত বেশি বস্তুনিষ্ঠ চিন্তাধারার সার পড়বে ততই সে জানতে চাইবে বুঝতে চাইবে অর্থনীতি, রাজনীতি, ইতিহাস, শিক্ষানীতি, সাহিত্য-শিল্প ও সংস্কৃতির নানা অঙ্গনে পালাবদলের প্রকৃতি-পদ্ধতি ও পারস্পরিক সম্পর্ক।

লক্ষ্য করছি, একদিন যাঁরা যুক্তিবাদী সমালোচক ছিলেন, তাঁদের একাংশ আজ অধ্যাত্মবাদী ও ইয়াঙ্কিবাদী অবক্ষয়ে গা এলিয়ে দিচ্ছেন, অপরাংশ মার্কসবাদের দোরগোড়ায় এসেছেন, অন্দরে যাবার জন্য কড়া নাড়ছেন। এ রাজ্যের সাহিত্য-সংস্কৃতি আন্দোলনের অবদান এটাই—এই উত্তরণমুখী সংঘাতের বাতাবরণ রচনা।

এ বছর কার্ল মার্কসের মৃত্যুর শতবর্ষ স্মরণে লিখেছি প্রথম প্রবন্ধটি।

আমার সম্পাদিত নন্দনতত্ত্ব বিষয়ে রচিত 'সাহিত্য শিল্প ভাবনা' সংকলন-গ্রন্থে আমারই লেখা 'লেনিনের সাহিত্য-শিল্প চিন্তা' প্রবন্ধে আজও বিতর্কিত পার্টি-সাহিত্যতত্ত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা নেই বুঝে এই গ্রন্থে আবার আলোচনা করলাম। প্রেম, সৌন্দর্য, স্বপ্ন-কল্পনা মার্কসবাদীদের কাছে বর্জনীয়, এই রকম অবৈজ্ঞানিক ধারণা কাটাতে এবং লেখকের ব্যক্তিগত মতাদর্শের চেয়ে তাঁর সৎ ও বস্তুনিষ্ঠ রচনার ব্যাপ্তি ও মূল্য অনেক বেশি, এই কথাটা বোঝাতেই তৃতীয় এবং চতুর্থ প্রবন্ধ ; অর্থাৎ গ্রন্থের প্রথম চারটি প্রবন্ধ সাহিত্যতত্ত্বমূলক।

কথাশিল্পী সতীনাথ ভাদুড়ির তিনটি বড় উপন্যাসের আলোচনায় মার্কসীয় বিচারপদ্ধতিতে পুনর্মূল্যায়নে প্রয়াসী হয়েছি এবং 'জলাক'' পত্রিকার 'সতীনাথ ভাদুড়ি সংখ্যা'র সাহায্য নিয়েছি। এ পর্যন্ত লোক-সঙ্গীত ও লোকসাহিত্য নিয়ে অনেক গবেষণামূলক আলোচনা হয়েছে। কিন্তু গণসঙ্গীতও যে আজ সমর্যাদায় স্বীকৃত শিল্প, এ সম্পর্কে একমাত্র গণনাট্য পত্রিকায় ছাড়া তেমন আলোচনা হয়নি। এই গ্রন্থে লোকসঙ্গীত ও গণসঙ্গীতের রূপ-স্বরূপ ও সম্পর্ক বিশ্লেষণে প্রয়াসী হয়েছি। বিদ্রোহী ভারতের পটভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' আমাদের কিভাবে ও কতটা প্রভাবিত করেছে সেই বিষয়ে আবার বিতর্ক ওঠায় একটি প্রবন্ধ লিখেছি। এই রচনার ৭৩ পৃষ্ঠায় পাঞ্জাবের ভগত সিং নামটি অসতর্কতার ভুলে এসেছে। আমাদের গণ-সাহিত্যের উৎস সন্ধানে দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' ছাড়াও আরো কয়েকটি রচনার হদিশ পাওয়া গেছে। এই বিষয়ে প্রাসঙ্গিক উল্লেখ সহ 'গ্রামসমাজ ও গোবিন্দ সামন্ত' প্রবন্ধটি আগ্রহী ও অগ্রণী পাঠকদের জন্য রাখলাম। এই বিষয়ে আরও গভীর গবেষণা আশা করি।

শেষের পাঁচটি প্রবন্ধ সংস্কৃতি ও অপসংস্কৃতি বিষয়ক। গত এক দশক ধরে এই বিতর্কমূলক ইস্যু নিয়ে, ভারতীয় গণনাট্য সংঘের ও গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের (পূর্বতন সম্মিলনী) কনভেনশন, সম্মেলন ও সেমিনার মণ্ডগুলিতে নতুন করে যে বৈজ্ঞানিক আলোচনা উঠেছে, ইতোপূর্বে রচিত আমার সংস্কৃতির সপক্ষে' গ্রন্থে এবং এই গ্রন্থের প্রবন্ধগুলিতে, তার প্রভাবের ঋণ স্বীকার করি। 'বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের সংস্কৃতিচিন্তা' রচনাটি 'নন্দন' পত্রিকার শারদীয় ১৯৩৮ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। আজ সারা বিশ্বে যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনের সম্পূরক হবে বুঝে সামান্য পরিমার্জনা করে গ্রন্থ-ভুক্ত করলাম।

আমার লেখার কাজে বিভিন্ন সময়ে ব্যক্তিগতভাবে উৎসাহিত করেছেন শ্রদ্ধেয় মহঃ আব্দুল্লাহ রসুল, শ্রীমতী অনিলা দেবী, শ্রীরথীন্দ্রকৃষ্ণ দেব,

শ্রীনারায়ণ চৌধুরী এবং প্রীতিভাজন অরিন্দম কোঙার। পাণ্ডুলিপি পরিমার্জনায় সহযোগিতা করেছেন দ্বীপেন্দ্র শীল ও তুষার পাল। বন্ধুবর ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রচ্ছদ শিল্পায়নে যে আগ্রহ দেখিয়েছেন তা ভোলার নয়। আমার দুই কন্যা নবনীতা ও মনোনীতা এবং জামাতা শ্রীমান কার্তিক মজুমদারের অবিরাম তাগিদ আমাকে উৎসাহিত করেছে।

পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের অর্থানুকূল্য ছাড়া এই গ্রন্থ প্রকাশ কঠিন হত। কৃতজ্ঞতা জানাই টেম্পল প্রেসের কর্মী বন্ধুদের।

মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

মার্কসীয় নন্দনতত্ত্বের কয়েকটি বিতর্কিত প্রসঙ্গ

আজ অক্সফোর্ড-কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়েও প্লেটো, হেগেল, ডারউইন ও আইনস্টাইনের সঙ্গে মার্কসবাদও পড়ানো হচ্ছে। ইউরোপীয় দেশগুলির উচ্চতর জ্ঞানের ক্ষেত্রে মার্কসবাদ না জানা পণ্ডিতরা 'এ্যাকাডেমিক নিরক্ষরতা'র মধ্যে পড়েন বলে ধরা হচ্ছে। অথচ পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক ও অর্ধ-স্বাধীন দেশগুলির জাতীয়তাবাদী পণ্ডিতদের একাংশ এই মার্কসবাদকে 'বিদেশী বিষ' বলে সরিয়ে রাখতে গলদঘর্ম হচ্ছেন।

মার্কসবাদ জেনে তাঁরা বস্তুপ্রকৃতি ও মানবসমাজের ক্রম-বিবর্তনের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক নিরিখ পেয়ে নিজেদের জ্ঞানের বা পাণ্ডিত্যের সীমা ও স্ববিরোধিতা অতিক্রম করতে পারেন। তাঁরা যে সমাজবিকাশের ঘটনাকে 'প্রাকৃতিক নিয়ম' অথবা বিজ্ঞানের মধ্যে ঈশ্বরকে হাজির করে আত্ম-প্রতারণা করছেন—এই নব-হ্যামলেটীয় ট্রাজেডির নিষ্পত্তি হতে পারে একমাত্র মার্কসীয় বিশ্ববীক্ষার আলোকে। বিশ্বজগত ও মানব সমাজের ঐতিহাসিক ধারাকে উল্টো দিক থেকে দেখার ভ্রান্তি বা রোগ ঘোচাতে প্রকৃতির ও সমাজের বিবর্তন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে যথাক্রমে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদের দাওয়াই প্রয়োগে অব্যর্থ ফল পাওয়া যাবেই।

আমার সবিনয় নিবেদন, তাঁরা তো গ্রীকদর্শন, ইউরোপীয় রেনেসাঁ, আর্কিমিডিস, গ্যালিলিও, নিউটন, আইনস্টাইন, ধর্মতত্ত্ব, লোক-পুরাণ, হেগেল, বেকন, মিল, ম্যালথাস—এত কিছু জেনেছেন! মার্কসীয় দর্শন জানতে আপত্তি কিসের? মার্কসবাদ আকাশ থেকে পড়েনি। তা অতীতের এই সব কিছু বস্তুগত ও ভাবগত অবদানের বিকাশধারাকে সামগ্রিকভাবে ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করে এবং ব্যক্তিত্ব ও সমাজের বর্তমান অবস্থানের বিচ্ছিন্নতা, যন্ত্রণা ও দুর্দশার অবসানে পথ দেখায়, উৎসাহিত করে; অর্থাৎ সমাজটাকে যে বদলাতে হবে—এই বৈজ্ঞানিক-উপলব্ধিতে নিয়ে আসে।

সূত্রাকারে মোটা দাগে মার্কসবাদ হল ঃ

১. বস্তু আগে, চেতনা পরে। বস্তুই চেতনাকে নিয়ন্ত্রণ করে। এরা একে অপরের দ্বান্দ্বিক সম্পর্কে এসে বদলে যায়।

২. আদিম সাম্যবাদী বর্বর যুগের পর থেকে মানব-সভ্যতার ইতিহাস—শ্রেণী-সংগ্রামের ইতিহাস।

৩. উৎপাদনের উপায়, পদ্ধতি ও সম্পর্কটাই সমাজের ভিৎ এবং তারই উপর গড়ে ওঠে রাজনীতি, আইন, দর্শন, শিল্প-সাহিত্যাদি উপরিকাঠামো। ভিৎ বদলালে উপরিকাঠামোও বদলায়।

৪. উপরিকাঠামোর উপর ভিৎ-এর প্রাধান্য জবরদস্ত হলেও সবসময়েই উপরিকাঠামো ভিৎ-এর দাস্যবৃত্তি করে না, ঠুঁটো জগন্নাথ থাকে না। সে ভিৎ-কেও প্রভাবিত করে পরিবর্তনের দিকে। এই সমগ্র প্রক্রিয়ায় ইতি-নেতির সংগ্রামে শেষ পর্যন্ত ইতির জয় হয় এবং পরবর্তী পর্যায়ে নতুন সম্পর্কে সক্রিয় হয়ে ওঠে।

মার্কস-এঙ্গেলস নন্দনতত্ত্ব বিষয়ে আলাদা কোন মতবাদ রচনা করেননি। যেহেতু আজ পর্যন্ত সারা বিশ্বের শিল্প-সাহিত্যের বিকাশ মানুষেরই বিশ্ব-ইতিহাসেরই অবদান, তাই সঙ্গত কারণেই নন্দনতত্ত্বও মার্কসবাদের অঙ্গীভূত। তাছাড়া মার্কস-এঙ্গেলস ইস্কাইলাস, বালজাক, সেকসপীয়ার, সার্ভেন্তিস প্রমুখ মহান সাহিত্যিকদের সম্পর্কে যে প্রাসঙ্গিক আলোচনা করেছেন তাতেও ঐতিহাসিক বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণের সামগ্রিকতা প্রতিপাদন করে।

কাজেই সঠিকভাবেই পরবর্তী কালে 'মার্কসীয় নন্দনতত্ত্ব' নামে বিশিষ্ট মতবাদের আবির্ভাব হয়েছে—ভাববাদী, বস্তুবাদী থেকে মার্কসবাদী শিল্প বীক্ষণের উত্তরণ। এই শাখায় প্লেখানভ, ক্রিস্টোফার কডওয়েল, আর্নেস্ট ফিশার, জর্জ টমসন, জর্জি লুকাস, আর্নল্ড কেট্‌ল প্রমুখ নন্দনতাত্ত্বিকদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

রুশ দেশেই প্রথম এই বিষয়ে নন্দনতাত্ত্বিক বিতর্কের সূচনা হয়েছিল ঊনিশ শতকের শেষ দিকে। প্লেখানভ এবং প্রাসঙ্গিকভাবে লেনিন মার্কসীয় নন্দনতত্ত্বের সূচনা করলে ট্রটস্কি ও তাঁর শিষ্যরা বিরোধিতায় নেমে বললেন—'মার্কসবাদী পদ্ধতি কখনই শিল্প-সাহিত্য বিচারের পদ্ধতি হতে পারে না।' সম্ভবত বুর্জোয়া সাহিত্য-সমালোচক জেমস ফ্যারেলের 'এ নোট অন লিটারারি ক্রিটিসিজম'-এ উল্লেখিত মার্কসবাদের 'ফাংসনালিজম'-এর অপবাদের দ্বারা তাঁরাও প্রভাবিত হয়েছিলেন। কিন্তু এঙ্গেলস ১৮৫১ সালে 'নিউ ইয়র্ক ট্রিবিউন' পত্রিকায় এবং ১৮৮৮ সালে মার্গারেট হার্কনেসকে লেখা পত্রে স্পষ্ট ভাষায় ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন—অতীতে সব সাহিত্য-শিল্পই উদ্দেশ্যমূলক ছিল। এখন সমাজতান্ত্রিক উদ্দেশ্য বা প্রবণতা দোষের নয়।

শিল্পের ক্ষেত্রে মার্কসবাদের ভূমিকা তখনই সহজ ও স্পষ্ট হয়েছে, যখন মার্কসবাদকে অর্থনীতি ও ইতিহাসাদিতে সম্পৃক্ত বস্তুসত্য ও

ভাবাদর্শের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববীক্ষা বলে উপলব্ধি ও বিশ্বাস করা সম্ভব হয়। আমরা লক্ষ্য করি, যুগে যুগে দর্শনচিন্তার পরিবর্তনে শিল্পভাবনারও বিবর্তন হয়েছে। আর দর্শন সে তো প্রতি যুগের আর্থ-সামাজিক শ্রেণী-সম্পর্কগুলির প্রতিভাস ও গাইড-লাইন। গ্রীক যুগে যখন আরিষ্টটল বললেন—'দাসপ্রথা হল প্রকৃতি-নির্দিষ্ট যেহেতু কিছু মানুষ জন্মসূত্রেই দাস', তখন বুঝতে অসুবিধা হয় না দাসপ্রথার অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভিত্তির উপর দাঁড়িয়েই এ কথা বলেছেন এবং আরিষ্টটলের দর্শনতত্ত্ব ও নন্দনতত্ত্ব এই অর্থে অবিচ্ছিন্ন। কি ভাবে সেটাই বিচার্য। পূর্বে যে প্লেটোর দার্শনিক মতবাদ অনুসারে বলা হত 'শিল্প হল অনুকরণের অনুকৃতি', তার মধ্যে জগতকে পরমসত্তার ইমেজ বলে প্লেটোর সিদ্ধান্তকেই মানা হয়েছে। দর্শনে যা 'ডিভিনিটি, শিল্পতত্ত্বে তাকেই বলা হল 'ডিভাইন ম্যাড্‌নেস'। এই মতবাদ বদলে গেল আরিষ্টটলের কালে। তিনি বললেন—শিল্পের জন্ম স্বর্গীয় উন্মাদনা থেকে হয় না, তার উৎসার হয় প্রবৃত্তি ও বোধশক্তি থেকে।

"The poet being an imitator, like a painter or any other artist, must of necessity imitate one of three objects—things as they were or are, things as they are said, or thought to be or things as they aught to be."

দেখা যাচ্ছে, আরিষ্টটলে এসে আর 'ডিভিনিটি' থাকছে না। যে বস্তু রয়েছে তার বিকাশ বস্তুজগতের মধ্যেই হচ্ছে এবং সেটা বুঝতে বা প্রকাশ করতে কবি বা শিল্পীর আরোহাত্মক বুদ্ধির দরকার। বলাবাহুল্য 'বস্তুর যা হওয়া উচিত বা হবে'—এই অনুসিদ্ধান্তের মধ্যে আরিষ্টটলের দর্শনচিন্তার প্রতিফলন রয়েছে, যে দর্শন পুরোপুরি প্লেটোর ভাববাদও নয়, আবার পুরোপুরি বস্তুবাদও নয়। তার মধ্যে পূর্বেকার ডেমোক্রিটাস ও হেরাক্লিটাসের জড়বাদ কাজ করেছিল। এই হেরাক্লিটাসকেই 'দ্বন্দ্বমূলক দর্শনের পথিকৃৎ' বলে লেনিন অভিনন্দিত করেছেন। চূড়ান্ত বিশ্লেষণে দেখা যায়, আরিষ্টটলের বোধতত্ত্বের মধ্যে যেমন ডেমোক্রিটাসের জড়বাদ মিশেছে, তেমনি তাঁর সম্ভাব্যতা এবং অসম্ভাব্যতার বৈপরীত্য-সমন্বয়ের ধারণার উৎস হিসাবে হেরাক্লিটাসের 'বৈপরীত্যের দ্বন্দ্ব-তত্ত্ব'কেই ধরতে হবে। এই আলোচনার উদ্দেশ্যই হল, এটা বোঝা যে মার্কসের 'ঐতিহাসিক ও দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ' বা মার্কসবাদী দর্শন এবং তারই উপর দাঁড়ানো 'মার্কসবাদী নন্দনতত্ত্ব' আকাশ থেকে পড়া কোন ব্যাপার নয়।

এখন প্রশ্ন হল, সাধারণভাবে নন্দনতত্ত্বের আলোচনায় 'মেকানিক্যাল মেটেরিয়ালিজম' বা যান্ত্রিক জড়বাদ এবং 'আইডিয়ালিজম' বা ভাববাদের মধ্যে পার্থক্য কি ? এটা পরিষ্কার হলে তবেই 'ডায়ালেক্টিক্যাল মেটেরিয়ালিজম' বা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের বিষয়টি বোঝা সহজ হবে।

একদল বলেন, 'শিল্পই শিল্পের লক্ষ্য'। দার্শনিক চিন্তার ক্ষেত্রে এঁরা বিষয় বা 'অবজেক্ট'কে বিষয়ী বা 'সাবজেক্ট' থেকে বিচ্ছিন্ন করে বিচার করেন। অর্থাৎ শিল্পী-সাহিত্যিকের আত্মগত সত্তার কোন ভূমিকা স্বীকার করেন না। এই 'ফরমালিজম'-এর নান্দনিক ধারণা থেকেই বলা হয়েছে শিল্পই শিল্পের লক্ষ্য।

প্রধানত গত শতাব্দী থেকে যে 'শিল্পের জন্যই শিল্প' তত্ত্ব খুবই চালু হয়েছে, তার উৎস রয়েছে বিশুদ্ধ ভাববাদী দর্শনে। এই দার্শনিক মতবাদ বিষয় বা 'অবজেক্ট'কে বিচ্ছিন্ন করে এবং কোন গুরুত্বই না দিয়ে বিষয়ী বা শিল্পী-সাহিত্যিকদের আত্মগত উপাদান এবং ভোক্তাদের আবেগ-অনুভূতিকেই চূড়ান্ত মূল্য দিয়ে থাকে। এতে শিল্প-সাহিত্যের আস্বাদনটাই বড় ও শেষ কথা। এরই নামান্তর 'আর্ট ফর আর্টস সেক'। এই দুই ধারায় গরমিল নেই। একই কথা অন্যভাবে বলা—সমাজের সঙ্গে পার্থিব সম্পর্কগুলির সঙ্গে শিল্প-সাহিত্যের কোন লেনদেন নেই, শিল্পের লক্ষ্য শিল্প নিজেই।

আমার বক্তব্য যদি এখানেই শেষ করি, তবে অতিসরলীকরণের দায়ে পড়ব। কি জড়বাদের যান্ত্রিকতা, কি ভাববাদের অলৌকিকতা—এই দুই ধারার দর্শন যে গোড়া থেকেই সমাজকে বাতিল করেছিল তা নয়। সমাজ বিকাশের নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে এগোতে এগোতে একটা পর্যায়ে এসে, এরা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে, অর্থাৎ সমাজের উৎপাদন-ব্যবস্থা ও তজ্জাত শ্রেণী-সম্পর্কগুলির নানা জটিল টানাপোড়েনে শেষে ঐ সমাজ-নিরপেক্ষতার মতবাদে আশ্রয় নিয়েছে বলা যায়।

এমনও দেখা গেছে, জড়বাদ ও ভাববাদ এক-এক বিশেষ যুগে এসে নিজেদের মধ্যে বিবাদ করেছে, দার্শনিক বিশ্বাস একরকম, নন্দনতাত্ত্বিক মতবাদ অন্য, আবার নন্দনতত্ত্বগত ধারণা এক হয়েও সৃষ্টির বিচারে একই ব্যক্তির অন্য রকম ঘটেছে দেখা যায়।

ফরাসী কবি বদলেয়ার ১৮৪৮ সালের বিপ্লবের পর যে বললেন, 'শিল্পের জন্য শিল্প মতবাদ নেহাতই শিশুসুলভ', সেটা কি তাঁর ভাববাদী জীবনদর্শন

বদলে ফেলেই বললেন ? না, আদৌ তা নয়। রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন—'অসংখ্য বন্ধনমাঝে মহানন্দময় লভিব মুক্তির স্বাদ' তখনও যেমন ভাববাদী দর্শনে বিশ্বাসী থাকেন, আবার যখন বলেন—'নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস···দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে' তখনও তেমনি দর্শনের ক্ষেত্রে ভাববাদীই থাকেন। আবার মার্কসবাদী বা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী না হয়েও নেপোলিয়নীয় স্বৈরাচারের যুগে শেলী ১৮১৩-১৯ সালের মধ্যে 'কুইন ম্যাব', ও 'পিটালু ম্যাসাকার'-এর মত বিপ্লবী কবিতা লিখেছেন। কাজেই এই সব বিশ্লেষণের সুযোগ রেখেই সাধারণ ভাবে যেটা বলতে চাই, তা হল জড়বাদী ও ভাববাদী উভয় অংশই যখন 'সাবজেক্ট' ও 'অবজেক্ট'-কে বিচ্ছিন্ন করতে চায়, তখন প্রকারান্তরে শিল্প-সাহিত্যকেও সমাজ বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন বলে ঘোষণা করতে চায়। এখানেই মার্কসবাদের সঙ্গে এদের তফাৎ। মার্কসবাদীরা বলেন, চেতনাও আছে, বস্তুও আছে এবং এদের মধ্যে সম্পর্কও আছে। অর্থাৎ বস্তু থেকে চেতনা, আবার চেতনা বস্তুকে প্রভাবিত করে সংঘাতে—পরিবর্তনে। এইভাবেই সৃষ্টি হচ্ছে। এঁদের মতে, যুগ বিশেষের উৎপাদন ব্যবস্থাই মানুষের জীবন-পদ্ধতির জনক, আবার সেই জীবন-পদ্ধতি থেকেই তাদের ধ্যান-ধারণা, যুক্তি-অনুভূতি গড়ে ওঠে। কাজেই শিল্প-সাহিত্য যেহেতু চেতনারই রূপ বা বাস্তব অভিজ্ঞতারই প্রকাশ, তাই উৎপাদনভিত্তি বা সামাজিক ভূমিকার বাইরে শিল্প-সাহিত্য 'সোনার পাথরবাটি'। এ থেকে কেউ যদি মনে করেন, মার্কসবাদও এক ধরণের জড়বাদ বা চেতনা-নিরপেক্ষ বস্তুবাদ, তবে তিনি ভুল করবেন। কারণ মার্কসবাদ কখনই বলে না যে, চেতনা নিষ্ক্রিয় বা বস্তুকে বা অর্থনৈতিক ব্যবস্থাদিকে মোচড় দিতে তার কোনই প্রভাব নেই।

এঙ্গেলস এ সম্পর্কে সাবধান করে বলেছেন—'অর্থনৈতিক প্রয়োজনকে ভিত্তি করেই নানা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলে, এবং এই প্রয়োজনই শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক ক্ষেত্রে নিজেকে বদলে নেয়।' এখানে স্পষ্টতই ভিত্তির উপর সংস্কৃতিচেতনার প্রভাব-প্রক্রিয়ার কথা বলেছেন। অর্থাৎ বস্তু বা সমাজ থেকেই মানুষের জ্ঞান ও আবেগ-অনুভূতির জন্ম হয়; আবার বস্তু ও সমাজের দ্বন্দ্ব ও প্রগতির ধারায় পরিবর্তিত জ্ঞান-অনুভূতির সমবায়ে গড়া বিজ্ঞান ও শিল্প-সাহিত্যের হাতিয়ারে পুরোন জীর্ণ বাস্তবতার অবসানে নতুন বাস্তবতা বা সমাজগড়ার সংগ্রাম চলে। এইভাবেই মানুষের বস্তুবিশ্ব ও সামাজিক ইতিহাসের বিকাশ হচ্ছে।

শিল্প-সাহিত্যের উৎস সম্পর্কে মানুষের শ্রম ও উৎপাদনের ভূমিকা ব্যাখ্যা করে যে-প্লেখানভ বুচারের 'শিল্প-প্রসাধন থেকেই উৎপাদনশীল শ্রমের বিকাশ'-তত্ত্ব নাকচ ক'রে মার্কসবাদের নন্দনতাত্ত্বিক প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন, সেই প্লেখানভ সমাজ পরিবর্তনে শিল্প-সাহিত্যের ভূমিকা বিষয়ে প্রায় নেতিবাচক বক্তব্য রেখেছেন। এই ক্ষেত্রে মাও-এর ইয়েনান ফোরামের (১৯৪৩) মূল সিদ্ধান্ত—শিল্প-সাহিত্যের বৈপ্লবিক উপযোগিতার প্রশ্নেও প্লেখানভের নন্দনতাত্ত্বিক সীমাবদ্ধতা ধরা পড়ে। তাঁর এই রকম সীমাবদ্ধতার হদিশ সৌন্দর্যতত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর ডারউইনবাদীভিত্তিক বা জীব-বৈজ্ঞানিক জাতিগত বৈশিষ্ট্যের ধারণার মধ্যেও রয়েছে।

লক্ষ্যণীয় যে, প্লেখানভ শিল্প-সাহিত্যের উৎস এবং তার নিজস্ব পরিবর্তনের ধারাটি দেখিয়েই থেমে গেছেন। ক্রিস্টোফার কডওয়েল দেখিয়েছেন, ব্যক্তি ও সমাজের দ্বন্দ্ব নিরসনে, গোষ্ঠীচেতনার গঠনে এবং তারই প্রয়োজনে উৎপাদন ব্যবস্থার তথা সমাজের পরিবর্তনেও শিল্প-সাহিত্যের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। তিনি শিল্প-সাহিত্যের জন্ম-প্রক্রিয়াটি যে ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, তার মধ্যেই এর ভূমিকা বা সামাজিক প্রতিফলনের ঘটনা এসেছে। এর মূলে রয়েছে সদা-সক্রিয় দ্বন্দ্বপ্রক্রিয়া—মানবপ্রবৃত্তি ও বাস্তব পরিবেশ, ব্যক্তি-অভিজ্ঞতা ও গোষ্ঠীচেতনা, অর্থনৈতিক উৎপাদনের স্তর বা সীমাবদ্ধতা ও বাস্তবের চাহিদাবোধ—এইসব দ্বন্দ্বেরই একটা সামাজিকীকরণ ঘটে, একটা রূপের আধার চায়, যার নাম শিল্প-সাহিত্য। আদিম সমাজে এই রকম অর্থনৈতিক সামাজিক সম্পর্ক ছিল প্রত্যক্ষ, এখন শ্রমবিভাগের জটিল ও সূক্ষ্মতর স্তরে তা হয়েছে পরোক্ষ। শিল্প-সাহিত্যের মধ্যে মানুষ পায় তার প্রবৃত্তির ও বস্তুপ্রকৃতির মানবায়িত সামাজিক রূপ, যার সজীবতা ও সৌন্দর্য অবিরাম তার সত্তার ও তার বস্তুপরিবেশের পরিবর্তনে তাগিদ দিয়ে চলেছে।

এর পরেও কি শিল্প-সাহিত্যে 'বিশুদ্ধ ব্যক্তিসত্তা'র ভূমিকাকে গুরুত্ব দেবার কথা উঠতে পারে? দুঃখজনক ও যুক্তিহীন হলেও ওঠে। আমাদের মনে হয়, এই প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে যায় আর একটি অত্যাধুনিক বিতর্কের প্রস্তাবনায়। বিতর্কটি হল, শিল্প-সাহিত্যে শ্রেণী-চেতনা বা শ্রেণী-ইডিওলজির প্রশ্নে। মার্কসবাদীরা বলেন, যেহেতু সমাজ বিভিন্ন শ্রেণীর অবস্থানে ও শ্রেণীগত সংঘাতের সচল ব্যবস্থা, তাই সঙ্গত কারণেই শিল্প-সাহিত্যে শ্রেণীচেতনা বা ইডিওলজির প্রতিফলন ঘটতে বাধ্য। এই বিচারে 'বিশুদ্ধতা'র কোন স্থান নেই, উদ্দেশ্যমূলক হতেই হবে। ইলিয়াড-ওডিসি,

রামায়ণ-মহাভারত, উপনিষদ-কোরাণ-বাইবেল সবই উদ্দেশ্যমূলক এবং তা হওয়া অস্বাভাবিক বা দোষের নয়।

কিন্তু সমাজ-সংস্কৃতি একটা মিশ্র-প্রক্রিয়া। এতে বিভিন্ন শ্রেণীর ভাব-চিন্তা এমনই মিলেমিশে থাকে যে কোন্ শিল্প-সাহিত্যে কোন্ বিশেষ শ্রেণীর কি কি প্রতিফলন পড়েছে, সেটা আলাদা আলাদা করে ধরা ও বোঝা খুবই মুস্কিল। তবু শিল্পী-সাহিত্যিকের শ্রেণীগত অস্তিত্বের সূত্র ধরে তাঁর সৃষ্টি বিশ্লেষণ করলে প্রধানত তাঁর শ্রেণী-মানসিকতার উপাদান ও ভাঁজগুলি ধরা সম্ভব।

কাজেই সমাজে শ্রেণীর অবস্থান, শ্রেণী-মানসিকতা থেকে শিল্প-সাহিত্যে সেই শ্রেণীগত মূল্যবোধ বা ভাবাদর্শের প্রশ্ন যখন এসে পড়ে তখন সঙ্গত কারণেই শ্রেণীর রাজনৈতিক মতাদর্শ বা পার্টি-ইডিওলজির প্রশ্নও এসে পড়ে। এটা প্রথম তুলেছেন লেনিন ১৯০৫ সালে তাঁর 'পার্টি সংগঠন ও পার্টি-সাহিত্য' প্রবন্ধে। তাঁর 'পার্টিজানশিপ' বা 'পার্টিজম' হল একটি তত্ত্বগত ধারণা যা মার্কসীয় নন্দনতত্ত্বেরই অনুপূরক।

দেখা যায়, শিল্প-সাহিত্যে কোন শ্রেণীর রাজনৈতিক মতাদর্শের অস্তিত্ব ও প্রভাবের কথা বুর্জোয়া ভাববাদী নন্দনতাত্ত্বিকরা এক কথায় নাকচ করে দেন। এমন কি মার্কসবাদী আর্নেস্ট ফিশারও লেনিনের ঐ পার্টি-মতাদর্শের প্রতি দায়বদ্ধতার আবেদনকে সমালোচনা করে বলেছেন—শিল্প-বাস্তবতা হল সর্বজনীন ব্যাপার। একে বিশেষ কোন পার্টি-মতাদর্শের খোপে পুরলে এর সর্বজনীনতা নষ্ট হয়ে যায়—'আর্ট ইজ ইটসেল্ফ সোস্যাল রিয়ালিটি।' লক্ষ্য করার মত—সামাজিক উপযোগিতা নয়, সামাজিক বাস্তবতা। এখানে মাও-এর সঙ্গেও তাঁর গরমিল ধরা পড়ে।

লেনিনের পার্টিজানশিপ-এর তত্ত্বকে অনেকে সংকীর্ণ আন্তঃপার্টি রাজনৈতিক প্রশ্ন বলে মন্তব্য করেছেন। যসিপ ভিদ্‌মার (যুগোস্লাভ) ও জর্জ লুকাস (হাঙ্গেরিও) প্রমুখ মার্কসবাদী নন্দনতাত্ত্বিকরা পর্যন্ত এই দলে। লুকাস তো বলেছেন, এই তত্ত্বের ভূমিকা প্রাক-বিপ্লব যুগেই শেষ হয়ে গেছে।

মনে হয়, ফিশার নিজের স্ববিরোধিতা সম্পর্কে সচেতন থাকেননি। তিনি আদিম ইন্দ্রজালের যুগ থেকে শ্রেণী-সমাজে উত্তরণের স্তরে শিল্পের ভূমিকা সম্পর্কে শ্রেণী-বিরোধ, উৎপাদনী শক্তির বিকাশ, সমাজ-পরিবর্তন সব কথাই ঠিক ঠিক এনেছেন। অর্থাৎ তিনি যা বলেছেন, পার্টি-মতাদর্শের

প্রতি দায়বদ্ধতার প্রশ্নে সেটাই প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। সম্ভবত বিপ্লবী পার্টি ও জনগণকে আলাদা ভাবার কারণেই এই দ্বিধা বা সীমাবদ্ধতা ঘটেছে বোঝা যায়। ফিশার শিল্পের ভূমিকা সম্পর্কে বলেছেন ঃ

"The artist, living and working in a state of magic illusion, anticipated the birth of an all embracing collective. But as the illusory nature of this expectation became clear, as the apparent unity disintegrated, as the class-struggle flared up again, as the contradiction and injustices of this new situation created acute uneasiness, so the situation of the arts and of the artist became more difficult and more problematic.

In a decaying society, art, if it is faithful, must also reflect decay. And unless it wants to break faith with its social function, art must show the world as changeable. And help to change it."—*The Necessity of Art*, pp. 47-48.

দেখা যাচ্ছে, ফিশার শিল্প-সাহিত্যে সমাজ-পরিবর্তনকারী শক্তি বা ভূমিকার কথা স্বীকার করেও কিভাবে তার পরিবর্তন হবে, এ সম্পর্কে স্পষ্ট বক্তব্য রাখতে পারছেন না। কারণ তাঁর কাছে শিল্প মানুষের জন্য, জনগণের জন্য। কিন্তু তাঁর মতে, সে শিল্প সর্বজনীন শিল্প, পার্টি বা শ্রেণীশিল্প নয়। ফিশার শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শিল্প-সাহিত্যের বিপ্লবী ভূমিকা মানলেন ; কিন্তু পার্টি বা শ্রেণীগত দায়বদ্ধতার প্রশ্নে সম্ভবত বুর্জোয়া মানবতার আবেশ কাটাতে পারেননি। তাছাড়া লেনিন ও মাও যেখানে সামাজিক প্রয়োজনের দিক থেকে শিল্পকে দেখেছেন, ফিশার সেখানে শিল্পের দিক থেকে সমাজের সম্পর্কটা দেখেছেন। তাঁর সঙ্গে লেনিনের পার্টি-সাহিত্য বিষয়ক বক্তব্যের সমালোচনায় আর্নেস্ট কেট্‌লও সরব। যদিও তিনি বলেছেন সমাজ-বদলে শিল্প-সাহিত্য সাহায্য করবে, তবু বিশেষ রাজনীতির মানদণ্ডে শিল্প-সাহিত্যের ভূমিকা নির্দিষ্ট করা ঠিক নয় বলে মার্কসবাদ থেকে কিছুটা সরেও এসেছেন। এখানেও বুর্জোয়া মানবীয় ভাবাবেগের জট কাজ করছে। 'কমিউনিস্ট ইশ্‌তেহার' বলছে—"অতীত ইতিহাসের প্রতিটি সংগ্রাম ছিল সংখ্যাল্পের দ্বারা অথবা সংখ্যাল্পের স্বার্থে পরিচালিত সংগ্রাম। প্রলেতারিও সংগ্রাম হল বিরাট সংখ্যাধিক্যের দ্বারা বিপুল সংখ্যাধিক্যের মুক্ত সংগ্রাম। বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে প্রলেতারিও শ্রেণীর এই সংগ্রাম কন্‌টেন্ট-এ না হলেও ফর্ম-এর দিক থেকে বিশ্বের

প্রথম জাতীয় সংগ্রাম।" এই কারণেই মরিস কর্ণফোর্থ সঠিকভাবেই 'মার্কসিজম এ্যাণ্ড হিউম্যান ভ্যালুজ' গ্রন্থে বলেছেন—"যতদিন পর্যন্ত মানুষের দ্বারা মানুষকে শোষণ করার ব্যবস্থাবলীর উচ্ছেদ না হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত, সাধারণভাবে মানবীয় দৃষ্টিভঙ্গি ও স্বার্থ প্রকাশকারী ভাষায় নৈতিকতাকে সর্বজনীন মানবতার উপর দাঁড় করানো যাবে না।"

সার্ভেন্তিসের ডন কুইকজোট যখন বলেছিল—'পুরোন জগত হারিয়ে যাচ্ছে যাক, আমি পিছনের দিকে তাকাবো না', তখন সামন্ত সমাজের ধ্বংসস্তূপের উপর দাঁড়িয়ে নতুন বুর্জোয়া জগতের বৈপ্লবিক উন্মেষ হয়েছিল এবং তারই শ্রেণী-মানসিকতার প্রতিফলন হয়েছে ঐ চরিত্রের কথায়।

আজ বিশ্বসমাজ ব্যবস্থায় ঐ বুর্জোয়া পুঁজিবাদ ক্ষয়িষ্ণু ও মৃতপ্রায়। এরই গর্ভ থেকে জেগে উঠেছে বিপুল সংখ্যাধিক্যে প্রলেতারিয়েতের শ্রেণী ও তার অপরাজেয় বিপ্লবী শক্তি।

আজ এই বিশ্ব-পরিস্থিতির চূড়ান্ত বিশ্লেষণে এটাই বেরিয়ে আসে যে, প্রলেতারিয়েত শ্রেণীর পার্টি ও তার বিপ্লবী ইডিওলজি আলাদা নয়। পার্টি হল শ্রেণীর অগ্রণী প্রতিনিধি। শ্রেণীর ইডিওলজি পার্টি-মতাদর্শেরই নামান্তর।

সারা দুনিয়ায় আজ ৯০ শতাংশ মানুষ শোষিত অপমানিত। দেশে দেশে প্রলেতারিয়েত শ্রেণী, বিশেষ করে এক-তৃতীয়াংশ সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার প্রেরণায়, মুক্তি-সংগ্রামে একের পর এক সাফল্যের মাইল-ফলক পার হচ্ছে। দেশে দেশে শিল্প-সাহিত্যে এই সংগ্রামী শ্রমজীবী শ্রেণীর পার্টি-ইডিওলজি প্রতিফলিত হলে কি মানবতা, বাস্তবতা ও সর্বজনীনতা নষ্ট হতে পারে? শোষণের দিকে মানবতা বা নৈতিক সৌন্দর্য ফুটতে পারে না। ঐ ভয়ংকর কুৎসিত শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সামিল জনগণের দিকে, জনগণের বিপ্লবী মতাদর্শের দিকেই মানবসভ্যতার শ্রেষ্ঠতম সৌন্দর্যের প্রকাশ।

লেনিনের পার্টি-সাহিত্যতত্ত্বের মর্মকথা

লেনিনের কাছে শিল্প-সাহিত্যের 'পার্টিজানশিপ' হল একটি তত্ত্বগত ধারণা, যা মার্কসীয় নন্দনতত্ত্বেরই অনুপূরক। ভাববাদীরা যেখানে বস্তু-বিশ্ব ও জনগণ থেকে শিল্পকে আলাদা করেন, লেনিন সেখানে এই 'পার্টিজানশিপ'-এর মতবাদ এনে আর এক দিক থেকে আরও প্রত্যক্ষ ভাবে সমালোচনা সাহিত্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন।

লেনিনের এই সাহিত্যতত্ত্ব হল জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতার সর্বোচ্চ রূপ। এরই প্রেরণায় যুক্তিবাদী ও প্রগতিশীল লেখক-শিল্পীগণ আরও বেশি সচেতনভাবে খোলাখুলি নিজেদের প্রতিভাকে জনগণের স্বার্থে, সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে নিয়োগ করতে এগিয়ে এসেছেন। অজ্ঞ ও নিরক্ষর জনগণের সাংস্কৃতিক জীবন ও অতীত ঐতিহ্যকে খাটো করে দেখার যে 'এলিত'-সুলভ বিচ্ছিন্নতা, তার মূলে আঘাত করে তিনি বললেন—কোন মানুষই কোন-না-কোন শ্রেণীর প্রতি পক্ষপাত থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখতে পারে না। অতীত ও বর্তমানের বহু ভাববাদী মানবপ্রেমী বিমূর্ত অলীক সব আদর্শ দিয়ে সমাজ-সমস্যার সমাধানে একটা কাল্পনিক নৈতিক জগৎ সৃষ্টি করেন। 'পার্টিজানশিপ'-এর আদর্শ শিল্পীকে কেবলই বস্তু ও সমাজমুখীই করে না, সেইসঙ্গে জনগণের সংগ্রামে সক্রিয় করে তোলে আগামীদিনের নতুন সমাজতান্ত্রিক জীবন গড়তে।

উল্লেখযোগ্য যে, লেনিন এই থিসিস প্রকাশ করেন ১৯০৫ সালে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের উপর জারের প্রচণ্ড আক্রমণ নেমে আসার পর ভয়ংকর সন্ত্রাস ও হতাশার পরিবেশে। তখন স্বভাবতই পেটি-বুর্জোয়া লেখক-শিল্পীদের বড় অংশ জনগণের রাজনৈতিক সংগ্রাম ও সাংস্কৃতিক মান সম্পর্কে আস্থা হারিয়ে সমকালের ইউরোপীয় বুর্জোয়া দর্শন ও শিল্পতত্ত্বের প্রতি ঝুঁকে পড়েন। এই ক্ষতিকর প্রবণতা থেকে তুলে এনে শ্রমজীবী সংগ্রামী জনগণের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক শক্তির অপরাজেয়তার মূল্যবোধ জাগানোর আশু প্রয়োজনকে সামনে রেখেই তিনি সাহিত্যতত্ত্বের এই থিসিস প্রচার করেন।

রুশ সাহিত্য জগতে জনগণের 'পার্টিজানশিপ'-এর কথা উনিশ শতকের প্রায় গোড়া থেকেই শোনা গেছে। কিন্তু বেলিনস্কি, চের্নিসেভস্কি ও ডব্রোলিউবভের কণ্ঠে এই শব্দটি অনেকটা ভিন্ন সুরেই উচ্চারিত হয়েছে।

কারণ তখন শ্রেণী-সংগ্রামের স্তর, জনগণের রাজনৈতিক সচেতনতার স্তর এমন পর্যায়ে ওঠেনি যাতে 'পার্টিজানশিপ'-এর অর্থ স্পষ্টভাবে ও আধুনিক অর্থে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। ১৮৪৭ সালে বেলিনস্কি লেখকদের পার্টিজানশিপকে ব্যঙ্গ করে বলেছেন—ওটাও এক ধরণের গোঁড়া সংস্কার। আবার বুর্জোয়া আদর্শবাদী লেখক-শিল্পীরা যে পার্টির ঊর্ধে থাকে বলে মনে করেন এই ঘটনাকে চের্নিসেভস্কি প্রায় আধুনিক অর্থে আত্মপ্রতারণা বলে মন্তব্য করেছেন। সাহিত্যে পার্টি বা শ্রেণী-আনুগত্যের প্রশ্নটিকে সমালোচনা করে ১৮৫৮ সালে বিপ্লবী গণতন্ত্রীদের কাছে পরমপুরুষ নিকোলাই ডব্রোলিউবভ বলেছেন—"পার্টি বলতে ঠিক কাকে বলে অথবা পার্টির সেবা করা নিয়ে সাহিত্যের মাথা ব্যথা নেই। সাহিত্য কার পক্ষে বা কার বিরুদ্ধে কথা বলছে এটাও দেখার দরকার নেই।"

রুশ দেশের বাইরে প্রায় একই সময়ে জার্মান দার্শনিক কান্ট এই প্রশ্নটাকে একটু অন্যভাবে তুলেছেন। তিনি সৌন্দর্যবোধের প্রশ্নে (অর্থাৎ নান্দনিক বিচারে) আত্মগত সাপেক্ষতার প্রতিষ্ঠা দিয়ে উপযোগিতাবাদের দাবি নাকচ করেছেন।

১৯০৫-৬ সালে লেনিনের প্রচারিত এই তত্ত্বের সঙ্গে বিশ্বসংস্কৃতির বিকাশে শ্রমজীবী জনগণের সমৃদ্ধ ইতিহাসের দাবিটি জড়িত। বুর্জোয়ারা যেখানে সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে জনগণের ভূমিকা অস্বীকার করেছে, লেনিন সেখানে তাঁর এই পার্টিজানশিপ-এর তত্ত্ব প্রচার করে দেখালেন, সমাজতান্ত্রিক আদর্শের স্বার্থে কোটি কোটি জনগণের সাংস্কৃতিক ও আত্মিক জীবনের সমুন্নতি ঘটানোর সাধনাতেই শিল্পের প্রকৃত মুক্তি ঘটতে পারে।

শিল্পের মুক্তি মুষ্টিমেয় সুবিধাভোগী পরশ্রমজীবীদের ভাববিলাসিতা, যৌন-সর্বস্বতা বা টাকার থলির মধ্যে নেই।

লেনিনের এই থিসিস প্রচারের একটি তাৎক্ষণিক ঐতিহাসিক তাগিদের উল্লেখ করা দরকার। অবশ্য তত্ত্বগত প্রশ্নে ঐ ঘটনার মিল যথেষ্টই রয়েছে।

রাশিয়ায় এই সময়ে কিছু স্বেচ্ছাচারী মেনশেভিক (সংশোধনবাদী) লেখকশিল্পী বুর্জোয়া সাহিত্যাদর্শের কুৎসিত হাতছানিতে মেতে উঠেছিলেন। ১৯০৫ সালে জার্মান বুদ্ধিজীবী আর্নেস্ট ম্যাক্ 'ইরেকেন্‌ৎনিস আন্দ্ ইর্তাম' প্রকাশ করে মানবসংস্কৃতিকে 'আপার টেন থাউজ্যান্ড'-এর সম্পত্তি বলে ঘোষণা করেন। এই ম্যাকিবাদের ভূত রুশী লেখক-শিল্পীদের বেশ বড় অংশকেই

প্রভাবিত করছে দেখে লেনিন ঘোষণা করলেন—'আর্ট বিলংস্ টু পিপ্‌ল।' মূলত এই ভিত্তি থেকেই তাঁর পার্টিজানশিপ-এর তত্ত্ব জনপ্রিয়তা ও সর্বজনীনতা অর্জন করেছে। অপরপক্ষে ম্যাক তাঁর গ্রন্থে বলেছেন: শিল্প ও বিজ্ঞান সহ সমস্ত সংস্কৃতির বিকাশ সামাজিক সমঝওতার মধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। কাজেই ঐ 'আপার টেন থাউজ্যাণ্ড'-এর পক্ষভুক্ত লেখক-শিল্পীদের কাছ থেকে নিচের তলার শ্রমজীবী মানুষ সহানুভূতি আশা করে। কারণ তাদের শ্রমের উপর ভর করেই তাঁরা শিল্প সংস্কৃতির ইমারত গড়তে পেরেছেন। ম্যাকের বক্তব্যের চূড়ান্ত বিশ্লেষণে দাঁড়ায়—জনগণ উচ্চতর আত্মিক সংস্কৃতির অধিকারী নয়। তারা শুধু শ্রমের বাস্তব ভিৎ গড়ে দেয়, আর 'আপার টেন থাউজ্যাণ্ড' শিল্প-সংস্কৃতির মূল্যবোধ সৃষ্টি করে।

রুশ সাহিত্য-সমালোচক ভ্লাদিমির শেচরবিনা তাঁর 'লেনিন ও সাহিত্যের সমস্যা' গ্রন্থে এই প্রসঙ্গটির ব্যাখ্যায় বলেছেন—

"To counter literary careerism, anarchism and individualism, Lenin proposed developing a genuinly free literature, frankly linked with the people and based on ideas of scientific socialism, a literature that would serve those millions of workers who form the flower of the country, its strength and its future. He saw in the people a living spirit from which the artist would draw his inspiration, strength and genuine freedom to create."

মূলত এটাই হল, মার্কসীয় নন্দনতত্ত্বের অনুপূরক লেনিনীয় পার্টি-সাহিত্যতত্ত্ব। একে নির্দিষ্ট ও সংকীর্ণ অর্থে তখনও যেমন অনেক বুদ্ধিজীবী-সমালোচক ভুল করেছিলেন, আজও তেমনি অনেকেই এই মতবাদকে 'পার্টিসাহিত্যের জবরদস্তি' বলে কুৎসা করেন। সেই সময়ে রুশ দেশে 'স্মেনা ভেখ্' গোষ্ঠীর মুখপাত্ররা লেনিনের এই থিসিস ও গোর্কির সাহিত্যকে 'রাজনৈতিক উদ্দেশ্যমূলক' বলে প্রচার করে ঘোষণা করল—শিল্পীর স্বাধীনতা শুধুমাত্র তাঁর ব্যক্তিসত্তার বিচ্ছিন্নতা ও সমগ্র ঐতিহাসিক যুগের মূল সমস্যা থেকে সরে থাকার মধ্যে পরিতৃপ্ত হতে পারে। একই সময়ে পাশ্চাত্য দেশেও রুশ লেখক-শিল্পীদের রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না। এই ধরণের দুশ্চিন্তার কালো ছায়ায় রুশ বুদ্ধিজীবীদেরও অনেকে আশ্রয়

নিতে চাইলে লেনিন স্পষ্ট ভাষায় জানালেন—"প্রগতিশীল লেখকদের রাজনৈতিক অবস্থান বলতে সেটাই বোঝায়, সর্বপ্রথমেই সমকালের বাস্তব-পরিস্থিতির আত্মীকরণ এবং সেইসঙ্গে জনগণের স্বার্থের মুখপাত্র হওয়া।"

লেনিনের এই পার্টিজানশিপ-এর সাহিত্যতত্ত্বের সঙ্গে কিছুদিন পরেকার রচনা 'বস্তুবাদ ও অভিজ্ঞতাবাদী সমালোচনা' গ্রন্থের সঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়। বিশ্বপ্রকৃতি, বস্তুজগৎ ও মানবসমাজ—এই তিনের মধ্যে গণমানসে ও ব্যক্তি-সত্তায় যে প্রতিফলনাত্মক প্রক্রিয়া চলে তারই ফলে শিল্প-সাহিত্যের জন্ম ও বিকাশ সম্ভব হয়েছে। শিল্পের সত্য ও সুন্দরকে খুঁজতে হবে এরই মধ্যে এবং যেহেতু জনগণ ও তার উৎপাদনশীল শ্রমই মৌলিক শক্তি তাই শিল্প-সাহিত্যের 'পার্টিজানশিপ'-এর ভিত্তি রয়েছে ঐ উৎপাদনশীল শ্রম তথা জনগণের ক্রমবিকাশের দ্বন্দ্বমূলক ইতিহাসে। লেনিন তাঁর এই প্রতিফলনের তত্ত্বে বা 'বস্তুবাদী ও অভিজ্ঞতাবাদী সমালোচনা'তে ম্যাকিবাদ বা ব্যক্তিসর্বস্ব আদর্শবাদ খণ্ডনের উদ্দেশ্যে 'পার্টিজ্ ইন ফিলসফি এ্যাণ্ড ফিলসফিক্যাল ব্লকহেড' নামে একটি অধ্যায় সংযোজন করেছেন। এতে আবার জোরের সঙ্গে 'সোস্যালিস্ট পার্টিজানশিপ'-এর সাহিত্যাদর্শকে উচ্চতম বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদী দার্শনিক প্রতীতি বলে ব্যাখ্যা করেছেন।

বস্তুত এই তাত্ত্বিক হাতিয়ারেই তিনি বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায় 'প্রলেটকাল্ট' বা অতিবাম বিচ্যুতির সর্বনাশ থেকে শিল্প-সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে রক্ষা করেছেন। লেনিন দেখিয়েছেন ঐ ধরণের বাগ্দানভীয় সুডো-রোমান্টিক বিপ্লবীয়ানা শেষ পর্যন্ত ম্যাকিবাদী ব্যক্তিতান্ত্রিক নৈরাজ্যের দিকেই শিল্প-সাহিত্যকে নিয়ে যায়। জনগণের ঐতিহাসিক বিকাশের ধারায় সঞ্চিত ও অর্জিত শিল্প-সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন কোন বিপ্লবী প্রলেতারিও সাহিত্য হতে পারে না।

পাশ্চাত্যের বুর্জোয়া লেখক-বুদ্ধিজীবীদের উদ্দেশ্যে লেনিন প্রশ্ন রেখেছেন—

"There can be no real and effective freedom in a society in which the masses of working people live in poverty and handful of rich live like parasites. Are you free in relation to your bourgeois publishers, Mr. Writer, in relation to your bourgeois public, which demands that you provide it with pornography in novels and paintings and prostitution as a supplement to 'sacred' scinic art ?"

এই তীব্র শ্লেষাত্মক বক্তব্যের পরই ঐ 'পার্টি সংগঠন ও পার্টি সাহিত্য' প্রবন্ধে তিনি প্রগতিশীল লেখক-বুদ্ধিজীবীদের উদ্দেশ্যে পার্টিজানশিপ-এর মর্মকথা উপলব্ধির আবেদন জানিয়ে বলেছেন ঃ আমাদের কাজ নতুন ও কঠিন। কিন্তু এ সাহিত্যই প্রকৃত অর্থে মুক্ত সাহিত্য ; কারণ এই সাহিত্য পুঁজি বা টাকার থলির কাছে বন্ধকী সাহিত্য নয়। এই সাহিত্য আত্মসর্বস্ব পেশাগত লোভের কাছে দাস্যবৃত্তি করবে না। এই সাহিত্য 'উচ্চ দশ হাজার'-এর মেদবহুল অধঃপাতের সেবা করবে না। এই সাহিত্য লক্ষ কোটি শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থে মানবজাতির বৈপ্লবিক চিন্তা-কল্পনাকে উজ্জ্বলতর করবে। আদিম, কাল্পনিক ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের ঐতিহাসিক ও বস্তুবাদী সম্পর্কের বিকাশধারাকে নানা আঙ্গিকে বৈচিত্র্যময় সাহিত্যশিল্পের দিগন্ত প্রসারিত করবে এই পার্টিজানশিপ-এর সাহিত্যাদর্শ।

লেনিন যখন বললেন, 'সমস্ত সোস্যাল ডেমোক্র্যাট সাহিত্যকে অবশ্যই পার্টি সাহিত্য হতে হবে', তখন মুক্তিকামী জনগণের প্রতি, সমাজতন্ত্রের প্রতি দায়বদ্ধতার মহত্তম সার্থকতার অর্থেই পার্টিজানশিপ-এর সাহিত্যতত্ত্বের মর্মার্থ উপলব্ধি করতে বলেছেন, বোঝা যায়।

সৌন্দর্যবোধের উৎস সন্ধানে

প্রার্থনা করো—'হে ঈশ্বর আমাদের প্রতিদিনের রুটি দাও'—গরিব প্রজা ও ক্রীতদাসদের পাড়ায় পাড়ায় যিশু এই ধর্ম প্রচার করে জনপ্রিয় মনীষার সুন্দর প্রতীক, অসংখ্য লোকগাথার কাঙ্খিত আবেগ হয়েছেন।

ক্রুদ্ধ রাজা ঘাতকদের নিয়োগ ক'রে ঐ 'সুন্দর'কে ক্রুশবিদ্ধ ক'রে ঐ 'সুন্দর'-এর মূর্তি স্থাপন করেছেন পরিশীলিত মনোরম আলোকমালায় সজ্জিত অভিজাত চার্চে। শিল্পীদের মানসপটে ঐ ক্রুশবিদ্ধ যীশুর মূর্তিতে ফুটে উঠেছে বিশ্বসত্তার অরূপ সুন্দর!

আবার পূর্ণিমা চাঁদ কবির চোখে ঝলসানো রুটির মত অথবা রুটি পূর্ণিমা চাঁদের মত সুন্দর, প্রিয়ার মুখ পূর্ণিমা চাঁদের মত সুন্দর, এবং কোন কোন কবির হাতের মুঠোয় উজ্জ্বল নক্ষত্রগুলি রূপোর টাকার মত সেতার বাজায়।

সৌন্দর্যের উৎস সন্ধানে কোথায় যাব? তার জন্ম-প্রক্রিয়া কি একই নিয়মে বাঁধা? দার্শনিক প্লেটো বলেছেন—'ঈশ্বর অজাগতিক আচ্ছন্নতার মধ্যে কথা বলেন। যৌথবোধেরই নাম ঈশ্বর।' আবার স্বামী বিবেকানন্দ বললেন—'অন্ন! অন্ন! যে ভগবান এখানে আমাকে অন্ন দিতে পারেন না, তিনি যে স্বর্গে আমাকে অনন্ত সুখে রাখবেন এ কথা আমি বিশ্বাস করি না। [১৮৯৪ সালের ১৯ নভেম্বর দক্ষিণী সাধক পেরুমলের কাছে লেখা পত্রাংশ]

যদি আমার সুন্দরকে ঘ্রাণে ও দৃষ্টিতে পাই এইভাবে—'আমার প্রিয়া মৌ মৌ করা ভাতের গন্ধে/আমার প্রিয়া ডুরে শাড়ী পরা কিষাণীর গতিছন্দে', তবে কি অজন্তা-ইলোরার কাছে আমার এই সুন্দর যথেষ্ট পরিমাণে ম্লান হয়ে যাবেই? যায় তো কাদের কাছে যাবে?

'মানসসুন্দরী'র কাছে নতজানু কবির স্বপ্ন—

"সংগীত তরঙ্গধ্বনি উঠিবে গুঞ্জরি
সমস্ত জীবনব্যাপি থর থর করি।
নাই বা বুঝিনু কিছু নাই বা চলিনু
ছন্দোবন্ধ পথে, সলজ্জ হৃদয়খানি
টানিয়া বাহিরে। শুধু ভুলে গিয়ে বাণী

কাঁপিব সংগীত ভরে নক্ষত্রের প্রায়
শিহরি জ্বলিব শুধু কম্পিত শিখায়।"

['মানসসুন্দরী' রবীন্দ্রনাথ]

মানস সৌন্দর্যের জন্য বিদীর্ণ ভাববাদী কবির এই প্রার্থনার পাশে বিজ্ঞানী-দার্শনিক ফ্রেডেরিক্ এঙ্গেলস-এর বিশ্ববোধের সৌন্দর্য এইভাবে গুঞ্জরিত হয়—

"ছায়াপথের প্রত্যন্ততম নক্ষত্র চক্রের দ্বারা পরিবেষ্টিত আমাদের এই মহাজাগতিক দ্বীপের অগণিত সূর্য ও সৌরজগতের বিকাশ ঘটেছে ঘূর্ণ্যমান দীপ্তিময় বাষ্পপুঞ্জের সংকোচন ও শীতল হওয়ার ফলে। এই বাষ্পপুঞ্জের গতির নিয়ম হয়তো উদ্ঘাটিত হবে কয়েক শতকের পর্যবেক্ষণ থেকে নক্ষত্রদের প্রকৃত গতির হদিশ পাবার পর। স্বভাবতই এই বিকাশ সর্বক্ষেত্রে সমান গতিতে হয়নি। আমাদের নাক্ষত্রিক জগতে এমন অন্ধকার দেহ, যা নিতান্ত গ্রহ নয় সুতরাং মৃত সূর্য; অন্যদিকে বাষ্পীভূত নীহারিকাপুঞ্জের একাংশ আমাদের নক্ষত্রমণ্ডলের মধ্যে রয়েছে অসম্পূর্ণ সব সূর্যের আকারে, অন্য নীহারিকাগুলি হল সুদূরবর্তী মহাজাগতিক দ্বীপপুঞ্জ, বিকাশের স্তরে স্তরে সদাসক্রিয়—"

[প্রকৃতির দ্বান্দ্বিকতা—ফ্রেডেরিক এঙ্গেলস]

এই যে ভাববাদী ও বস্তুবাদী দৃষ্টিতে সুন্দরের ধারণা, সেটির পার্থক্য কবি টমাস গ্রীন দেখালেন এইভাবে—

"যখন আদম খুঁড়ছে মাটি
ইভ রয়েছে মগ্ন বয়ন কাজে
তখন কি কেউ সেজেছিল
ভদ্রলোকে সাজে?"

এবার দেখা যাক, উপরে সৌন্দর্যবোধের যে কয়টি নমুনা তুলে ধরেছি তাই থেকে কি কি সারকথা পেলাম।

এক. যারা রুটি বানায়, মাটি কাটে, বয়ন করে তাদের কাছে কাঙ্খিত সুন্দর সেইগুলিই। পাথর কেটে গুহাঘর বা পাথরের নানা হাতিয়ার বানানোর যে আনন্দ মানুষ প্রথম পেয়েছিল সেইটাই তার প্রাথমিক সৌন্দর্য-বোধের আনন্দ। যীশু যে রুটির জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে বলেছিলেন, এই লোকধর্মের মূলে সেই বাস্তবতা কাজ করেছে, যে-তাগিদে আদিম মানুষ প্রকৃতিকে ও বস্তুগত উপকরণকে দখলে পাওয়ার সংগ্রামের স্তরে ইন্দ্রজাল বা ম্যাজিকের কল্পনা করেছিল, আদিম পুরাণ ও রূপকথার

জন্ম দিয়েছিল। অর্থাৎ যে আদিম যৌথ সমাজে পাখির উড়ে যাওয়া দেখে ঐ পাখিকে খাদ্য হিসাবে পাওয়ার তাড়নায় পুষ্পক রথ (পিছনে ধাওয়া করা ঈগল) কল্পনা করেছিল।

রাজা রুটি কেড়ে নিয়েছে। বঞ্চিত মানুষ ইন্দ্রজাল বা রাজার চেয়ে হাজার গুণ শক্তিসম্পন্ন দেবতা বা ঈশ্বরের কাছে ঐ রুটি পাওয়ার জন্য 'যজ্ঞ' বা মানসিক ও শারীরিক শক্তি সংগ্রহের প্রক্রিয়ায় অংশ নিয়েছে। তখন এটাই ছিল কাঙ্খিত বস্তু বা প্রকৃতিকে (যা ছিল তাদের কাছে সুন্দর) পাওয়ার জন্য এবং তা পেয়ে পুনরায় উৎপাদন করার জন্য সাধনা। এই প্রক্রিয়াতেই রুটির সঙ্গে ঈশ্বর ও পূর্ণিমা চাঁদ, নক্ষত্রের সঙ্গে রৌপ্য মুদ্রার কল্পনা হয়েছে। এই হল সৌন্দর্যসৃষ্টির বস্তুগত প্রক্রিয়া। কবি টমাস গ্রীন এই বস্তুবাদ ও ভাববাদের তফাৎ দেখিয়েছেন আদম-ইভের শ্রম-প্রক্রিয়ার সঙ্গে 'ভদ্র, শ্রমবিচ্ছিন্নতার ভাববাদী অঙ্গকলার' বৈপরীত্য এনে।

দুই, প্লেটো যে বললেন, ঈশ্বর হল পরিদৃশ্যমান জগত থেকে আলাদা এক নিরালম্ব মহাজাগতিক মহাসত্তা, আরিস্টটল তাকেই ভাগাভাগি করে নিয়ে বললেন, না ঈশ্বরের মহাসত্তা পুরোপুরি নিরালম্ব অপার্থিব নয়। এ জগত তাঁর অপূর্ণ সত্তার লীলা। এই অপূর্ণকে পূর্ণতর রূপ দেওয়ার প্রক্রিয়াই হল সৌন্দর্যসৃষ্টি—চিন্ময় আত্মার জ্যোতি—যে জ্যোতির ভাবমূর্তি হয়ে ক্রুশবিদ্ধ যীশু বিরাজ করেছে রাজা-পুরোহিতের চার্চে। এরই পরবর্তী স্তর হেগেলের ভাববাদী দর্শনে এই বলে প্রতিষ্ঠা পেল—সৌন্দর্য বা পরমসত্য হল ইন্দ্রিয়াতীতকে ইন্দ্রিয়াত্মক রূপে ফুটিয়ে তোলা। রবীন্দ্রনাথের 'মানস-সুন্দরী'র জন্ম এই আত্মগত প্রক্রিয়াতেই হয়েছে। তাছাড়া পূর্ণিমা চাঁদের মধ্যে যে-কবি প্রিয়ার মুখ দেখেন, তাঁর আত্মগত কল্পনার পাশে আর এক কবি ভাতের গন্ধ বা ডুরে শাড়ী-পরা কিষাণী বৌ-এর প্রত্যক্ষ বস্তু-সত্যকেই সৌন্দর্য্যায়িত করেছেন।

এইভাবে যুগে যুগে সৌন্দর্যকে মানুষই সৃষ্টি করেছে। পশু-পাখিরা তা পারে না। আবার কেউ কেউ হয়ত বলবেন, কেন? পাখিদের বাসা, মৌচাক, মাকড়সার জাল কি সুন্দর সৃষ্টি নয়? উত্তরে বলবো, ঐ সব ঘটনার মধ্যে তাৎক্ষণিক শারীরিক প্রয়োজনই মিটেছে, নেহাতই জৈব ঘটনা।

আদিম স্তরে মানুষ পাখি দেখে পাখির গানের মাধুর্য অনুভব করেনি, পাখি শিকার করে খাওয়ার কথাই ভেবেছে। পাহাড় কেটে গুহার মধ্যে বাস করার কথাই ভেবেছে, অজন্তা-ইলোরার কথা তখন ভাবতেই পারেনি। মানুষ

তার উৎপাদনের উপায়, পদ্ধতি ও সম্পর্ক অবিরাম পরিবর্তন করে তার মনন ও কল্পনার গুণগত ও বস্তুগত পরিবেশের রূপান্তর ঘটিয়েছে। কিন্তু পাখি, মৌমাছি, মাকড়সা আজও বাসা, চাক, জাল বানায়। অর্থাৎ ওরা তাদের জৈবতার সীমা অতিক্রম করতে পারেনি। মানুষ কিন্তু বস্তু ও প্রকৃতির পুনরুৎপাদন করে বিষয় গড়েছে ও বিষয়ী হয়েছে। তা যদি না হত তবে আজও মানুষ গুহায় বাস করত, গাছের ছাল পরেই শীত নিবারণ করত। একদিন যে-বকের সারি দেখে মানুষ তীব্র ক্ষুধায় শিকারের জৈব তাগিদ বোধ করেছে, আজ সেই মানুষ কবি হয়ে অসামান্য কবিতার বা 'বলাকা'র (রবীন্দ্রনাথ) ছন্দ-সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছে। কারণ আজ মানুষের পুনরুৎপাদনের ক্ষেত্র লক্ষ লক্ষ গুণ বেড়ে গেছে।

এই যে প্রকৃতি বা বস্তু, বিষয় ও বিষয়ীর গতিশীল সহ-সম্পর্কের ছন্দ, সেইটাই মানবিক উৎপাদনের সৌন্দর্য। আজ সে নদীতে বাঁধ দিয়ে, সাগরে বাষ্পপোত ভাসিয়ে, (বানরসেনার কাল্পনিক বা ঐন্দ্রজালিক সেতুবন্ধন নয়), পাথর কেটে অজান্তা-ইলোরা সৃষ্টি করে, দুর্গ-প্রাসাদ নির্মাণ করে মানবিক ও সামাজিব উৎপাদনের উন্নততর স্তরে এসেছে। মানুষের সৌন্দর্যবোধের জন্ম ও বিকাশ এইভাবেই সম্পন্ন হয়।

সমাজবিজ্ঞানী বুচার যে বলেছেন, গুহা বানানো, গাছের ছালের পোষাক বানানো থেকেই মানুষ উৎপাদন করেছে, অর্থাৎ আগে শিল্প, পরে উৎপাদনী শ্রম এ কথা ঠিক নয়। আসলে মানবিক ও সামাজিক শ্রমের স্তরেই সৌন্দর্যের সৃষ্টি। এই শিল্প-সৌন্দর্যই আবার তাকে উন্নততর শ্রমে ও উৎপাদনে উৎসাহ ও শক্তি যুগিয়েছে। এই শ্রম, উৎপাদন, ইন্দ্রিয়াত্মক অনুভব ও মনন-প্রক্রিয়ার বিকাশ, এইতেই সৌন্দর্যবোধ যুগে যুগে রূপান্তবিত হয়েছে। অর্থাৎ মানুষ এই সৌন্দর্যের নিয়ম অনুসারে উৎপাদন করে প্রকৃতির বা বস্তুর রূপান্তর ঘটায় এবং সেইসঙ্গে নিজেকেও ঐ প্রক্রিয়ার অঙ্গীভূত করে।

জীববিজ্ঞানের সূত্রে ডারউইন যে বলেছেন, প্রাণীর অস্তিত্বরক্ষার তাগিদের মধ্যেই সৌন্দর্যের অনুভব নিহিত রয়েছে এবং এই অনুভব অনেক পশু-পাখির মধ্যেও রয়েছে—এ কথা ঠিক নয়। পাখি বা মাকড়সা আদৌ ভাবতে পারে না যে, সে সুন্দর বিষয় নির্মাণ করছে। কারণ তার কাজের মধ্যে জৈব প্রয়োজনের বাইরে কোন সামাজিক সত্তার ভূমিকা নেই। মানুষের উৎপাদনশীল শ্রম-প্রক্রিয়ায় বস্তুপ্রকৃতির যে মানবিকীকরণ ঘটে, তার ইন্দ্রিয়-গুলিও যে মানবায়িত হয় সেটাই সৌন্দর্যবোধের মৌলিক শর্ত। কার্ল

মার্কস তাঁর ১৮৪৪ সালে লেখা 'অর্থনৈতিক দার্শনিক পাণ্ডুলিপি' গ্রন্থে এই প্রসঙ্গেই বলেছেন—

"For not only the five senses but also the so-called mental senses—the practical senses (will, love etc)—in a word, human sense—the humanness of senses—comes to be by virtue of its objects, by virtue of humanised nature."

যদিও এই প্রক্রিয়ার বিকাশেই সূত্রায়ন হয়েছে—সর্বব্যাপ্ত বিশ্বপ্রকৃতি মানুষের শরীরী অঙ্গ বা তার জৈব শরীরের অজৈব উপাদান, তবু এই উপাদানের নিজস্ব কোন সৌন্দর্য নেই। আবার ভাববাদী প্রক্রিয়াতেই 'চেতনার রঙে পান্না সবুজ' হয়, কবির 'মনোভূমি অযোধ্যার চেয়ে সত্য' হয়। এতে বিষয়ীই বিষয় বা বস্তুর অস্তিত্বের নিয়ামক হয়—পুনরুৎপাদন-প্রক্রিয়ায় বস্তু থেকেই বিষয়-বিষয়ীর অনুভব জন্মায় না।

বিষয়ী বললেন, এটা 'সত্য', আর তখনই তা কবি কীটসের মতে 'সুন্দর' হল। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে 'শোষণ' তো সত্য ঘটনা! তা কি সুন্দর? এইখানেই সত্য ও সুন্দরের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক, শ্রম ও উৎপাদনের সম্পর্ক এসে পড়ে। বিশুদ্ধ সৌন্দর্য বা শাশ্বত সত্য বলে কিছু নেই।

প্রসঙ্গত বলি, রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যচেতনাকে (যার দ্বন্দ্ব ও বিকাশ ঘটেছে) পুরোপুরি ক্ল্যাসিকাল ভাববাদ বলা চলে না। ভাববাদীরা বলেন, চৈতন্য থেকেই বস্তু ও বিশ্ববোধ; অর্থাৎ তাঁরা বিষয়কে বস্তুজগত থেকে বিচ্ছিন্ন করে মনোরাজ্যে বন্দী করেন। আর অপেক্ষাকৃত আধুনিক ভাববাদের অন্যতম প্রবক্তা বার্কলি বললেন, 'আমাদের ভৌত বিষয়গুলি আমাদের সংবেদনের যোগফল। এরই নাম বিষয়ীগত ভাববাদ। মানুষের সংবেদনের বাইরে ইন্দ্রিয়ের কোন কাজ নেই। সংবেদনের মাধ্যমে যে জ্ঞান অর্জন করছে সেটাই তার চৈতন্যের অংশ, এর বাইরে জগত বলে কিছু নেই। অর্থাৎ বার্কলীয় দর্শনের এই রাস্তা ধরেই বিজ্ঞানের মধ্যে অধ্যাত্মবাদ ঢুকে পড়েছে। মানব-পরিবেশের দ্বারা মানুষ আচ্ছাদিত বা চালিত নয়, সংবেদনের দ্বারা সীমায়িত। এই থেকেই এল রবীন্দ্রনাথের—বিশ্বজগৎ আমার সৃষ্টি, আমার চেতনার সৃষ্টি, যাকে দার্শনিক পরিভাষায় বলা যায় 'সলিপসিজম্' বা অহংবাদ।

মোটকথা, ভাববাদীদের কাছে সৌন্দর্য হল বস্তুজগত থেকে সম্পর্কবিহীন আলাদা এক গুণ, মানুষের মনের স্বতোৎসারিত অনুভব, তার আত্মিক সত্তার

প্রকাশ। এঁদের 'এ্যাবসোলিউট' বা ব্রহ্মাস্বাদের অবস্থান সাধকের চিদ্‌লোকে, কবির মানসকল্পনায়, শিল্পীর কল্পজগতে। এঁরা হেগেল ও আনন্দবর্ধনের অনুবর্তী হয়ে বলেন, আদিম শিল্পের অমার্জিত ও সংকীর্ণ বস্তু প্রাধান্যের যায়গায় আধুনিক যুগের আত্মগত ভাবকল্পনার প্রাধান্য এসে সৌন্দর্যকে বিশুদ্ধ ও বিমূর্ত স্তরে উন্নীত করেছে। এঁদের আর এক দল ক্রোচেপন্থীরা বলেন, দর্শন ও বিজ্ঞান থেকে শিল্পের সৌন্দর্য আলাদা : বিষয় বড় নয়, যা অভিব্যক্ত হল সেটাই আসল। কাজেই বিষয়-নির্বাচনের মধ্যে সৌন্দর্য ফুটতেই হবে এমন কথা নয়। যা শিল্পীর বা কবির আত্মাকে আন্দোলিত করবে তাই-ই সুন্দর ও সত্য।

এই থেকেই শিল্পের স্বাধীনতা বা বিশুদ্ধ বিমূর্ত সৌন্দর্যের মতবাদ গড়ে উঠেছে।

প্রক্রিয়াটা প্রায় একই রকম। শুধু পরিবেশ বদলেছে। আদিম মানুষের কাছে যখন প্রতিবন্ধক ছিল প্রকৃতি তখন সে দাবাগ্নি দেখে, ঝড়বৃষ্টির তাণ্ডব দেখে ভয় পেয়ে যৌথভাবে দেবতা বা ইন্দ্রজাল কল্পনা করেছে, প্রার্থনা করেছে—অন্ন, গোধন, অশ্বধন, দাসধন দাও। স্বভাবতই এইভাবে যে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতা, তার মধ্যে আধুনিক বিজ্ঞানের মত কার্য-কারণ উপলব্ধি নেই। এ সম্পর্ক নেতিবাচক হলেও বস্তু-প্রকৃতির সঙ্গে মানবিক সম্পর্কের চাহিদায় ও টানাপোড়েনে ঐ ধরণের ঐন্দ্রজালিক ঘটনা সর্বদাই একটা তীব্র ইতিবাচক প্রেরণা দিয়েছে।

আজকের মানুষের কাছে প্রতিবন্ধক হল তার শ্রেণীবিভক্ত পুঁজিবাদী সমাজ। সামন্তযুগীয় ধর্মীয় ভাববাদের স্তর পেরিয়ে আজ সে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির জয়-জয়ন্তীর যুগে এসেও উৎপাদনের উপায়গুলি থেকে, পুঁজিনিয়ন্ত্রিত সমাজ থেকে শুধু বিচ্ছিন্নই নয়, তার শ্রম, সৃষ্টি ও তার সমগ্র শরীর-সত্তাই পণ্যে রূপান্তরিত। এই অবস্থায় একদলে আত্মসমর্পণ করে নৈরাশ্যের বা অবক্ষয়ী আত্মসর্বস্বতার দর্শনে তলিয়ে যাচ্ছে, আর একদল নিজেরই বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিসত্তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে জটিল ও বিমূর্ত অলীক কল্পলোকের আশ্রয়ে সৌন্দর্যের সন্ধান করছে ; অর্থাৎ মাছ বঁড়শি এড়িয়ে লাফিয়ে পাশের জালে পড়ছে। এরই পারিভাষিক নাম সুররিয়ালিজম, কিউবিজম ইত্যাদি।

এই ধারার আধুনিক ইউরোপীয় সৌন্দর্যবাদীরা ভ্যানগগের 'পটাটো ইটার্স' দেখে বলেন, নেহাতই সরল বস্তুবাদ ; বুলগেরীয় ভাস্কর্যশিল্পীর যুদ্ধের পটভূমিকায় সৃষ্ট 'কোরিয়ান চিলড্রেন' অথবা রোমানীয় শিল্পী

কাজনোভস্কির 'হিরোজ অব লেবার' দেখে বলেন, বড্ড উদ্দেশ্যমূলক বা রাজনৈতিক। অথচ বুর্জোয়া উন্মেষযুগের ভাববাদী দর্শনের আলোকেও এইসব অসাধারণ শিল্প-সৌন্দর্য যথেষ্ট মর্যাদা পায়, বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদী চোখের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম।

সৌন্দর্যের উৎস সন্ধানে জীববিজ্ঞানের শাখায় ডারউইনবাদের একটা ভূমিকা রয়েছে। ডারউইন বলেছেন—প্রকৃতি থেকেই বস্তু ও বিষয়ের সৌন্দর্য জন্মায়। মানবসৃষ্টির আগেই সৌন্দর্যের অনেক প্রাকৃতিক আধার জন্মেছিল। অর্থাৎ মানুষকে তৃপ্তি দেবার জন্য নয়, নিজেদের জৈব প্রয়োজনেই সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়েছে। কীট-পতঙ্গকে আকর্ষণ করে প্রজনন-ক্রিয়া সম্পাদনের জন্যই ফুলে সৌন্দর্য, পুরুষ পাখি নাচে গায় স্ত্রী পাখিকে যৌন সঙ্গমে আকর্ষণ করতে, গাছপালা, নদী-পাহাড়, ফলফুলের বিচিত্র রঙ শুধু প্রাণী-জগতকে এই রকম আকর্ষণের প্রয়োজনেই ফুটেছে। এককথায়, ডারউইনের মতে, সৌন্দর্যের নিয়ম প্রাকৃতিক। কিন্তু কি করে এই সৌন্দর্যবোধ মানুষ ও প্রাণীদের মধ্যে জাগে তার ব্যাখ্যায় তিনি 'অত্যন্ত দুর্বোধ্য ব্যাপার' বলে থেমে যাবার আগে 'স্নায়ুতন্ত্রের গঠন' বলে দায় সেরেছেন।

দেখা গেল, ভাববাদীরাও যেমন মানব সমাজের বিকাশ প্রক্রিয়ায় সৌন্দর্য-বোধের ভূমিকা প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি, ডারউইনও তেমনই এক যায়গায় এসে থেমে গেলেন। অবশ্য আর এক জীববিজ্ঞানী হেকেল ঠিক ডারউইনের রাস্তায় না গিয়ে মানুষের ইন্দ্রিয়গুলির বিকাশের সঙ্গে মানুষের সৌন্দর্যানুভবের, তার 'ডেকরেটিভ আর্ট'-এর ইতিহাসকে ব্যাখ্যা করে বলেছেন—সরল সহজ থেকে জটিলতর এবং প্রাথমিক থেকে উচ্চতর পর্যায়ে স্পর্শ, স্বাদ, ও দর্শনেন্দ্রিয়ের সমুন্নতির কারণেই মানুষ আদিম বর্বরতার যুগকে পার হয়ে সভ্যতার মাইল-ফলকগুলি পার হয়ে এসেছে।

তবু এই ব্যাখ্যাতেও 'কিন্তু' রয়েছে। এই তত্ত্বে কল্পনা ও চিন্তারাজ্যের সঙ্গে সৌন্দর্যের সম্পর্ক স্পষ্ট হয়নি। ঠিক কথা, মানুষের চোখ দীর্ঘ বিকাশের পথে এসেছে। তবু মানুষের চোখের সঙ্গে, দৃশ্যজগতের সঙ্গে তার কল্পনা ও চিন্তা শক্তির যোগ আছে বলেই ঈগল বা পিঁপড়ের দৃষ্টি অনেক বেশি তীক্ষ্ম হওয়া সত্ত্বেও মানুষ সৌন্দর্যের উপলব্ধি অর্জন করেছে। তাছাড়া মানুষ চোখের সীমা যন্ত্র দিয়েও অতিক্রম করেছে, হাতিয়ারের সম্প্রসারণ করেছে। বিজ্ঞান-প্রযুক্তির অগ্রগতি ঘটিয়েও সে সৌন্দর্যকে মানবায়িত করেছে। হেকেলের চোখ শুধু দেখার ইন্দ্রিয়, কিন্তু কার্ল মার্কস-এর

সৌন্দর্যতত্ত্বে মানবায়িত দৃষ্টি নিছক শারীরিক ইন্দ্রিয় নয়। তাঁর মতে, মানুষ তার শ্রমের দ্বারা পুনরুৎপাদনের দ্বারা কেবল তার পরিবেশকেই বদলায়নি, সেইসঙ্গে নিজেকেও রূপান্তরিত করে চলেছে। আসলে সৌন্দর্য-বোধের মার্কসীয় ব্যাখ্যাই প্রকৃত বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর দাঁড়িয়েছে এই কারণে যে, এর মধ্যে মানুষের উৎপাদনশীল শ্রম ও সুদীর্ঘ সামাজিক অনুশীলনের ভূমিকা প্রমাণিত হয়েছে। এই সামাজিক অনুশীলনের ফলেই মানুষের মন, মস্তিষ্ক ও বোধের ইন্দ্রিয়গুলি ধাপে ধাপে পরিশীলিত ও সমুন্নত হয়েছে, এই মূল্যায়ন গ্রহণ করার অর্থ, আদিম যুগ থেকে আজ পর্যন্ত মানুষের সংস্কৃতি ও সভ্যতার অঙ্গীভূত সৌন্দর্যবোধের তথা চিত্র, সঙ্গীত, সাহিত্য ও অন্যান্য শিল্পকলার ক্রমবিকাশকে বিশ্বইতিহাসেরই অবদান বলে স্বীকার করা।

প্রশ্নটা সাহিত্যের ? না ব্যক্তি-সাহিত্যিকের ?

এক জাতের লেখক আছেন যাঁরা ভাবেন, লেখার সময় তিনি একা। লেখা হলে পাঠক পড়েন ও উপভোগ করেন। এই 'একা' থাকার ব্যাপারটা কি? তিনি কি স্বয়ম্ভূ? তাঁর মন ও মনন কি মঙ্গলগ্রহ থেকে তাঁর শরীরে ভর করে?

আসলে কোন অবস্থাতেই লেখক ও পাঠক একা নন। অতীত ও বর্তমান সমাজধারার পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ উপাদানের দ্বন্দ্বমূলক প্রক্রিয়া উভয় অংশের ব্যক্তিত্বের গঠনে—তাঁদের মনে ও মননে, অনুভবে ও কল্পনায় কাজ করছে প্রতিনিয়তই।

কাজেই যাঁরা মনে করেন, 'আমি একা' তাঁরা জঁ-পল সার্ত্রের সেই চরিত্রটির মত যে সারা জীবন প্রাণপণে ভেবে গেল 'আমি রাজনীতির বাইরে', শেষে দুর্ঘটনায় মৃত্যুর পূর্ব-মুহূর্তে চিৎকার করে উঠল—'ওঃ এটাও রাজনীতির চক্রান্ত'!

তবু সাহিত্যসৃষ্টির মত সাহিত্য-বিচারও জটিল প্রক্রিয়া। সমাজের শ্রেণী-অবস্থানে, ব্যক্তিগত দার্শনিক ও রাজনৈতিক মতাদর্শে লেখক বা শিল্পী একটা বিশেষ খোপে নিবদ্ধ থাকতে পারেন। কিন্তু তিনি যদি সৎ ও নিষ্ঠাবান শিল্পী হন, তবে সচেতন ঐ ব্যক্তিসত্তার সীমা অতিক্রম ক'রে ব্যাপক বাস্তবসত্যের অনেক উপাদান তাঁর সৃষ্টির মধ্যে থাকতে পারে। এ কথা ঠিকই, কোন ব্যক্তিই প্রচলিত অর্থনৈতিক বিধিব্যবস্থা, আইন-প্রশাসন, ধ্যান-ধারণা, মূল্যবোধের বাইরে থাকতে পারেন না। প্রশ্নটা এখানে নয়। প্রশ্ন হল, তবে কি সাহিত্যবিচারে স্রষ্টার সচেতন মতাদর্শের দিক থেকে সৃষ্টিকে দেখবো? নাকি তাঁর সৃষ্টির সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভাবের ভাল-মন্দের হিসাবটা আনবো?

ব্যক্তিগত সচেতন মতাদর্শে রক্ষণশীল হলেও সৃষ্টির মধ্যে প্রগতিশীল উপাদান ফুটে উঠেছে এমন নজিরও যেমন আছে, তেমনই ব্যক্তিগত মতাদর্শে প্রগতিশীল হয়েও শিল্পীসত্তার দুর্বলতার কারণে সৃষ্টির মধ্যে রক্ষণশীল উপাদান বা বাস্তবের খণ্ডিত রূপ এসে পড়েছে, এমন নজিরও বিরল নয়। অবশ্য এ ক্ষেত্রে ব্যক্তিসত্তা ও শিল্পীসত্তার 'প্যাকেজ ডিল' ভাগ হয় না, মাত্রার তফাৎ ও অচেতন শিল্প-প্রক্রিয়ার কারণেই এমনটা ঘটে যায়।

এবার সমগ্র সমস্যাটির বিচারে অতীতের কয়েকটি ঐতিহাসিক সাহিত্য মূল্যায়ন-পদ্ধতির নজির তুলে ধরছি।

ফ্রেডেরিখ্ এঙ্গেলস ১৮৮৮ সালের এপ্রিলে ইংরাজ সমাজতন্ত্রী লেখিকা মার্গারেট হার্কনেসকে লেখা এক পত্রে তাঁর 'সিটি গার্ল' উপন্যাস পাঠের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেছেন এই বলে—'আমার মতে বাস্তবতা মানে কেবলমাত্র খুঁটিনাটি বর্ণনা নয়। আসলে প্রতিনিধিত্বমূলক চরিত্রকে প্রতিনিধিত্বমূলক পরিবেশে ফুটিয়ে তোলাই বড় কথা। আপনার লেখায় চরিত্রগুলি যতটা প্রতিনিধিত্বমূলক, পরিবেশ ততটা বাস্তবসম্মত হতে পারেনি। চরিত্রগুলির একঘেয়েমী, যন্ত্রণা ও দুর্দশা বাইরে থেকে চাপানো মনে হয়েছে। এটা ১৮০০-১০ সালের মধ্যে সাঁ-সিমো ও রবার্ট ওয়েনের দিনগুলিতে মানানসই হলেও, ১৮৮৭ সালের সর্বহারা শ্রেণীর সংগ্রামী পটভূমিকায় অত নিষ্ক্রিয়তা ও ঔদাসীন্য সঠিক বাস্তবতা পায়নি।

এই পত্রে আমরা লক্ষ্য করি, এঙ্গেলস সমাজতন্ত্রী হার্কনেসকে তাঁর রচনার সার্টিফিকেট রূপে ধরেননি। তিনি প্রধানত রচনার ঐতিহাসিক বাস্তবতার ফাঁকটা বৈজ্ঞানিক নিরিখে ধরিয়ে দিয়েছেন। অর্থাৎ মতাদর্শে সমাজতন্ত্রী হয়েও লেখিকা কোথায় ব্যর্থ হয়েছেন সেটা সহানুভূতির সঙ্গেই সমালোচনা করেছেন।

ঐ একই পত্রে এঙ্গেলস বালজাকের প্রসঙ্গ এনে বলেছেন—'বালজাক ছিলেন মতাদর্শে লেজিটিমিষ্ট (জমিদার অভিজাততন্ত্রের সমর্থক—লেখক)। তাঁর কাছে ভাল সমাজ কিভাবে নির্বোধ অধঃপাতে তলিয়ে যাচ্ছে, সেটাই তাঁর উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। তাঁর সহানুভূতি ঐ ধ্বংসোন্মুখ শ্রেণীর প্রতিই পড়েছে। কিন্তু তিনি যখন ঘটনা ও চরিত্রগুলি তীব্র বাস্তবতায় আঁকেন তখন তাদের সম্পর্কে তাঁর তীক্ষ্ন ব্যঙ্গ ও তিক্ত মনোভাব এমনভাবে পড়েছে, তাতে তাঁর রাজনৈতিক গোঁড়ামির ঊর্ধে অভিজাতশ্রেণীর ভয়ংকর অবক্ষয়ের ছবিকে ঐতিহাসিক পটভূমিকায় এমনভাবে এঁকেছেন যাতে তখনকার (১৮৩০-৩৬) বামপন্থী রিপাবলিকান নেতৃত্বের উজ্জ্বল দিকটাই পাঠকমনে প্রভাব ফেলেছে। এইখানেই শিল্পী বালজাকের বাস্তববোধের জয় সূচিত হয়েছে।'

এই ঘটনা থেকে কি বেরিয়ে এল? বেরিয়ে এল, ব্যক্তিগত মতাদর্শে প্রগতি-বিরোধী হয়েও ঐতিহাসিক সত্যটা সৎ শিল্পীর হাতে চাপা থাকেনি। বালজাকের ব্যক্তিগত রাজনৈতিক মতবাদ গতিশীল বাস্তবতার চাহিদাকে

আড়াল করেনি (যা প্রতিক্রিয়াশীল লেখক-শিল্পীরা শাসকশ্রেণীর প্রিয় হবার ঝোঁকে প্রায়শই করে থাকেন)। বালজাকের উপন্যাস শিল্পসৃষ্টি হিসাবে মহান। ঐতিহাসিক বাস্তবতা ও শিল্পীর সততার দাবি ব্যক্তি-বালজাককে অতিক্রম করেছে। ব্যক্তি-বালজাক মানুষকে কতটা আর প্রভাবিত করতে পারে ? কিন্তু তাঁর সৃষ্টি যুগসত্যের উজ্জ্বল ছবি হয়ে চিরায়ত মূল্য পেয়েছে।

এখানে একটা কথা অবশ্যই স্মরণ রাখা দরকার। আমাদের কালেও কিছু লেখক-শিল্পী ও সাহিত্য-সমালোচক বুর্জোয়া বাস্তবতা বা 'ক্রিটিক্যাল রিয়ালিজম্'-এর খাতিরে মার্কস-এঙ্গেলস-এর বালজাক-মূল্যায়নের নজিরে এই সিদ্ধান্তে আসতে চাইছেন—আমরাও বুর্জোয়া অবক্ষয়ের ছবি আঁকতে পারি। আমরাও খোলামেলা মানবিকতা, ইন্দ্রিয়াত্মক ভোগ-বাসনা, লোভ-লালসা ও ক্ষয়-দুর্বলতার খুঁটিনাটি বাস্তব বর্ণনা, এমনকি শ্রমিক বস্তিতেও যেমন যেমন পচাগলা করুণ প্রাত্যহিকতা দেখছি, সেইসব পাঠক সাধারণের সামনে তুলে ধরতে পারি।

আমার বক্তব্য, এইসব হল বর্তমান সমাজের খণ্ডিত, বিকৃত ও অসম্পূর্ণ বাস্তবতা, আদৌ ঐতিহাসিক বাস্তবতা নয়। মার্কস-এঙ্গেলস সাহিত্য মূল্যায়নে কখনই এই বিচারকে অপ্রধান করেননি, বরং উল্টো। মনে হয়, ঐ সব লেখক ও সমালোচক এঙ্গেলস-এর 'সিটি গার্ল' উপন্যাসের সমালোচনার ঐ অংশটি—যেখানে শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবী সংগ্রাম ও তার মূল্যবোধের পট-ভূমিকায় শুধু বিষাদ ও দুর্দশার খুঁটিনাটি বর্ণনার দোষের কথা বলেছেন—এই দিকটা বেমালুম ভুলে যান।

মার্কস তাঁর 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থের ৩য় খণ্ডে বালজাকের শেষ উপন্যাস 'লা পেসান্স'-এ শোষক জমিদার কিভাবে কৃষককে বঞ্চিত করে, অর্থ ও জমি আত্মসাৎ করে দেখিয়েছেন। চরিত্র ও পটভূমির সঠিক বাস্তবতায় দেখিয়েছেন কিভাবে শোষকের তৈরী জালে অসহায় কৃষক জড়িয়ে পড়ে।

এই ঘটনায় উৎসাহিত হয়ে আজও যদি কোন কথাসাহিত্যিক ঐ ভাবে জমিদার-জোতদারের সঙ্গে ক্ষেতমজুর ও গরিব চাষিদের সম্পর্ক এঁকে মার্কস-এর বালজাক মূল্যায়নের দোহাই দিয়ে পাশ মার্কা পেতে চান, তবে বলবো তাঁরা বৈজ্ঞানিক সাহিত্য-মূল্যায়নের বা ঐতিহাসিক বাস্তবতার পদ্ধতিটা ধরতেই পারেননি। পারেননি বলেই প্রচলিত সমাজের কেবল অবক্ষয়ী ছবির উন্মোচন করাকেই প্রগতিবাদী সাহিত্যের কাজ বলে ভুল করছেন।

বালজাকের সময়ে কৃষকদের অবস্থা, আর এখনকার কালের কৃষকের অবস্থা

এক নয়। মার্কস বেঁচে থাকলে কি এখনকার কৃষকদের ঐ রকম অসহায় নিষ্ক্রিয়তা ও নির্বোধ অধঃপতনের চিত্রকে বাস্তবসম্মত শিল্পসৃষ্টি বলে ছাড়পত্র দিতেন? আজ থেকে একশ' বছর আগেও এঙ্গেলস সমকালের শ্রমিকদের নিষ্ক্রিয়তা বা নির্বোধ দুর্দশার কাছে গা ভাসিয়ে দেওয়ার ছবিকে অবাস্তব বলেছেন। অবশ্য তা যে ইউরোপীয় বুর্জোয়া বিকাশের পটভূমিকায় এটাও নজরে রাখা দরকার।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সফল হবার পর সোভিয়েত রাশিয়ার শিল্প-সাহিত্যের প্রশ্নে, ব্যক্তির মতাদর্শ ও তাঁর সৃষ্টির মূল্যায়নের প্রশ্নে, অতীতের শিল্প সাহিত্যগত অবদান বিচারের প্রশ্নে লেনিনকে 'প্রলেতকাল্ট' বা অতিবাম বুদ্ধিজীবী-সমালোচকদের সঙ্গে যে বিতর্কে নামতে হয়েছিল তারই জের হিসাবে তাঁর টলস্টয়ের ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্য-মূল্যায়ন আমরা পেয়েছি। লেনিন বলেছেন:

"এমন একজন শিল্পীর সঙ্গে আমাদের বিপ্লবের নাম যুক্ত করছি যিনি বিপ্লব থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রেখেছিলেন। এতে অনেকেই আশ্চর্য হবেন এবং ভাববেন এটা নেহাতই আরোপিত সম্পর্ক দেখানো। কি করে তাঁর উপন্যাসকে বিপ্লবের দর্পণ বলা যাবে যাতে সবকিছু ঠিকঠিক প্রতিফলিত হয়নি?

"কিন্তু আমাদের বিপ্লব পুরোপুরি জটিল ব্যাপার। জনগণের এমন বড় অংশই এতে জড়িয়ে পড়েছেন ও অংশ নিয়েছেন যাঁরা সম্পূর্ণ সচেতন-ভাবে বুঝতে পারেন না কি ঘটছে, কি ঘটতে চলেছে। এমনকি তাঁরা অনেকেই প্রকৃত সেই ঐতিহাসিক ভূমিকা থেকে নিজেদের সরিয়ে রাখছেন যার প্রবাহের সঙ্গে প্রতিনিয়তই দ্বন্দ্ব-সংঘাতে আসছেন। এবং শিল্পী যদি প্রকৃতই মহৎ হন তাহলে অন্তত কিছু পরিমাণে বিপ্লবের এইসব উপাদান তাঁর সৃষ্টিতে প্রতিফলিত করবেনই—টলস্টয়ের সাহিত্য, মতামত ও দর্শনের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব তা যেন ক্রন্দনরত। একদিকে তিনি একজন মহান শিল্পী, এক বিরাট প্রতিভা যিনি শুধু রুশজীবনের অতুলনীয় চিত্রই আঁকেননি, সেইসঙ্গে বিশ্বসাহিত্যে প্রথম শ্রেণীর অবদান রেখেছেন। অপরদিকে আমরা পেয়েছি জমিদারতন্ত্র ও খ্রীষ্টভাবনায় আচ্ছন্ন এক ব্যক্তিকে। একদিকে পেয়েছি অসাধারণ শক্তি, দূরদর্শিতা, মিথ্যা ও ভণ্ডামির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ; অপরদিকে পেয়েছি টলস্টয়বাদ, যিনি জনসমক্ষে নিষ্ঠ নিজের বুক চাপড়ে

বলছেন—আমি বজ্জাত কিন্তু আমি নৈতিক আত্মশুদ্ধির প্রচারক। আমি মাংস বেশি খাই না, আমি ভাতের মণ্ড খাই। একদিকে তিনি ধনতান্ত্রিক শোষণ, সরকারী সন্ত্রাস, আইন-আদালত ও প্রশাসনের হাস্যকর কাণ্ড ইত্যাদির নির্মম সমালোচক ; অপরদিকে তিনি প্রচার করেছেন—হিংসার দ্বারা অন্যায়ের প্রতিরোধ ক'রো না। একদিকে আমরা পাই পরিচ্ছন্ন বাস্তবতা ও সমাজের সমস্ত মুখোশ টেনে খুলে দেওয়া ; অপরদিকে তিনি প্রচার করেছেন জগতের সবচেয়ে ক্ষতিকর জিনিস—ধর্ম, যার প্রভাবে তিনি চান সরকারের মন্ত্রী-আমলাবা সবাই এক-একজন বিশুদ্ধ যাজক হয়ে যাবে।"

লেনিন এরপর বলেছেন—"টলস্টয়কে বর্তমান কালের (লেনিনের সময়ের —লেখক) শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামী দৃষ্টিকোণে বা সমাজতন্ত্রের পটভূমিকায় বিচার করলে ভুল হবে। কৃষি-অর্থনীতির প্রাচীন ভিত্তিতে কিভাবে চিড় খেয়েছে এবং নবোদ্ভূত বুর্জোয়া ব্যবস্থার প্রভাবে কৃষকজীবনে ও সমগ্র গ্রাম সমাজে কি কি দ্বন্দ্ব ও মূল্যবোধের সংঘাত সৃষ্টি হয়েছে, সেটা যে তিনি সততার সঙ্গে অসাধারণ শিল্প-প্রতিভায় তুলে ধরেছেন, এই ঘটনাই আমাদের বিপ্লবের দর্পণ হিসাবে কাজ করছে—ধনতন্ত্রের বিকাশ সবকিছু পরিবর্তন করছে এবং পরিস্থিতিকে এমনভাবে ঘনীভূত করছে যাতে লক্ষ লক্ষ কৃষক জাগ্রত হচ্ছে এবং জমিদার ও সরকারের প্রতি তাদের ঘৃণার মধ্য দিয়ে ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে—বিপ্লবী গণতান্ত্রিক সংগ্রামের জন্য।"

লেনিনের টলস্টয়-মূল্যায়ন থেকে সাহিত্য বিচারে ঐতিহাসিক বা দ্বন্দ্বমূলক সামগ্রিক বাস্তবতার গুরুত্বও যেমন প্রমাণিত হল, তেমনি ব্যক্তিগত মতবাদের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও শিল্পীর সততার কারণে সৃষ্টির মধ্যে অনেক গতিশীল ও ইতিবাচক উপাদান পরবর্তী প্রজন্মের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে যে পরিবাহিত হয়, এটাও বেরিয়ে এল। এইভাবে বার করে আনাই সাহিত্য-সমালোচনার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি যার পরিভাষা মার্কসীয় বিচারপদ্ধতি।

আর একটি অপেক্ষাকৃত কম প্রচারিত অথচ মূল্যবান বিচারের উল্লেখ করবো।

লেনিন পুঁজিবাদের চূড়ান্ত স্তরকে 'মরিব্যাণ্ড ক্যাপিটালিজম' বা সাম্রাজ্য-বাদ বলেছেন। এই সাম্রাজ্যবাদ চায় বিশ্ব-জনগণকে তার সংগ্রামী ও মানবিক অতীত থেকে বিচ্ছিন্ন করতে বা সেই সম্পর্কে বিকৃত ধারণায় আচ্ছন্ন রাখতে।

সমাজতন্ত্র তার সেই অতীতের বঞ্চনা, বিচ্ছিন্নতা ও অসম্মান মুছে দিয়ে মানবসংস্কৃতির ধারাবাহিক ঐতিহ্যের উপর জনগণকে দাঁড় করিয়ে আরও উন্নত ও সমৃদ্ধ করতে বদ্ধপরিকর।

লেনিনের সার্থকতম উত্তরসাধক যোশেফ স্তালিন রাজনীতি, রণনীতি ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ক্ষেত্রেও যেমন, শিল্প-সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও তেমনই অসাধারণ স্থৈর্য, বিচক্ষণতা ও দৃঢ়তার সাথে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক নির্মাণে বিস্ময়কর নেতৃত্ব দিয়েছেন।

গণ-সংস্কৃতির বিকাশে, সাংস্কৃতিক মান উন্নয়নে চলচ্চিত্রের অপরিসীম শক্তি বুঝে ১৯১৯ সালে সমগ্র চলচ্চিত্র শিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত হবার পর একে একে আইজেনস্টাইনের 'দি স্ট্রাইক', জর্ডোভদিনের 'মাদার' ও 'স্টর্ম ওভার এশিয়া', ডভঝেঙ্কোর 'আর্থ' এবং নিকোলাইয়ের 'দি রোড টু লাইফ' প্রভৃতি মহান সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে।

১৯২৪ সালে লেনিনের মৃত্যুর পরের বছর স্তালিনের নেতৃত্বে সোভিয়েত সাহিত্য শিল্পের নীতি নির্ধারক প্রস্তাবে বলা হয়—"শিল্প-সাহিত্যের বিভিন্ন উপাদান ও শ্রেণীগত মর্মবস্তু নিখুঁতভাবে বুঝেও পার্টি (বলশেভিক বা কমিউনিস্ট পার্টি—লেখক) কখনই আঙ্গিকের ব্যাপারে কোন নির্দিষ্ট বিশেষ রীতিকে যান্ত্রিকভাবে চালু রাখার পক্ষে ফতোয়া দিতে পারে না—শিল্প-আঙ্গিকের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধারার ও গোষ্ঠীর মধ্যে অবাধ প্রতিযোগিতাকে পার্টি অবশ্যই উৎসাহিত করে।"

শিল্প-সাহিত্যের প্রশ্নে কমিউনিস্ট মতাদর্শকে যাঁরা গোঁড়ামিপূর্ণ এবং স্তালিন-পর্বকে যাঁরা 'ত্রাসমূলক শৃঙ্খলায় স্তব্ধ' বলে মনে করেন তাঁদের সামনে স্তালিনের নেতৃত্বে গৃহীত এমন একটি ঐতিহাসিক প্রস্তাব তুলে ধরা আনন্দের বৈকি! তাছাড়া এর আরও একটা দিক আছে। প্রশ্ন হল, ঐ সময়ে কেন ঐ রকম নীতি নির্ধারণ ও প্রস্তাব গ্রহণের প্রয়োজন হল? লেনিনের সময়ে যে 'প্রলেটকাল্ট' ঝোঁক তাঁর ব্যক্তিত্ব ও যুক্তির কাছে গুটিয়ে গিয়েছিল, তাঁর মৃত্যুর সঙ্গেই আবার ঐ অতি-বাম হটকারী ঝোঁক মাথা চাড়া দিলে স্তালিনকে তার মোকাবিলায় নামতে হয়।

স্তালিনের সময়ে রুশ নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রেই এই ধরণের বিতর্ক তীব্র ও ব্যাপক আকার নেয়। ইতিপূর্বে লেনিন বগদানভের অভিজ্ঞতাবাদী দর্শন (এম্পিরিসিজম) খণ্ডন করেছিলেন 'মেটেরিয়ালিজম এ্যাণ্ড এম্পিরিও ক্রিটিসিজম' গ্রন্থের অস্ত্রে, আর স্তালিনকেও সেই একই বগদানভীয়

সংকীর্ণতাবাদী ঝোঁকের বিরুদ্ধে রাজনীতি ও শিল্প-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কঠিন সংগ্রামে নামতে হয়েছে।

১৯২৫ সালে আর্ট থিয়েটারের বিপুল দর্শক সমাগমে অভিনীত হচ্ছে বুলকাগভের 'দি ডেজ অব দি টার্বিন' (নাট্যকারের 'হোয়াইট গার্ড' উপন্যাসের নাট্যরূপ)। বগ্দানভীয় প্রলেট্কাল্ট গোষ্ঠীর নেতৃত্বে অভিযোগ করা হয়, এতে শ্বেতরক্ষীদের প্রতি এমনভাবে সহানুভূতি দেখানো হয়েছে যাতে লালরক্ষীরা হেয় প্রতিপন্ন হয়েছে—এই নাটক বিপ্লব-বিরোধী এবং প্রলেতারিও সংস্কৃতি থেকে বিচ্যুত। এই অভিযোগ থেকেই দাবি ওঠে, তীব্র আন্দোলন হয়—অবিলম্বে এই নাট্যকারের বিচার চাই এবং নাটকের প্রদর্শন বন্ধ চাই।

এই নাটকের শেষে একটি আত্মসমর্পণের দৃশ্য দেখানো হয়েছে। সোভিয়েত-বিরোধী টার্বিন জনগণের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে শেষ পর্যন্ত জনগণের ইচ্ছায় আত্মসমর্পণ করল—এই ঘটনার সমালোচনা করে আন্দোলন-কারীরা বলেছেন, আত্মসমর্পণের দৃশ্যটি এমনভাবে দেখানো হয়েছে যাতে টার্বিনের প্রতি ঘৃণা না জেগে সহানুভূতিরই উদ্রেক হয়েছে, যা শ্বেতরক্ষী বাহিনীর প্রতি সমর্থনের ইঙ্গিতবাহী ঘটনা।

স্তালিন নাটকের অভিনয় সাময়িকভাবে স্থগিত রাখেন এবং কেউ বলেন এগারো বার, কেউ বলেন পনেরো বার ঐ নাটকের অভিনয় দেখেন। বলা-বাহুল্য স্তালিন যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েই এই বিতর্কে অংশ নেন। তিনি বিল বেলোৎসেরভস্কির পত্রের জবাবে বলেন—'টার্বিনদের দিনগুলি খারাপ নাটক নয়। ক্ষতির চেয়ে এ নাটক ভালই করে বেশি। দর্শকদের মনে শেষ অনুভূতি এটাই—জনগণ ও তার প্রতিনিধি বলশেভিকরা দুর্ভেদ্য ও অপরাজেয়, যাদের কাছে টার্বিন ও শ্বেতরক্ষীদের অস্ত্র সংবরণ করতে হয়েছে। 'টার-বিনের দিনগুলি' হল দিগ্বীজয়ী ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ, যদিও এর নাট্যকার এই বহিঃপ্রকাশ সম্পর্কে আদৌ সচেতন ছিলেন না। কিন্তু তা দেখা আমাদের কাজ নয়।...অবশ্য সমালোচনা করা এবং অ-প্রলেতারিও সাহিত্য বলে নিষিদ্ধ করার দাবি তোলা খুবই সহজ। কিন্তু যা সহজ সেটাই সঠিক বা শ্রেষ্ঠ হতে পারে না। আসলে এটা নিষিদ্ধ করার ব্যাপার নয়। নাট্য-মঞ্চ থেকে স্তরে স্তরে পুরাতন ও নতুন অ-সর্বহারা সাহিত্য প্রতিযোগিতার মাধ্যমে হঠাতে হবে এবং সেইসঙ্গে খাঁটি আকর্ষণীয় শিল্পমণ্ডিত সোভিয়েত নাটক সৃষ্টি ও অভিনয় করে ঐ সব যায়গা দখল করতে হবে।"

উল্লেখযোগ্য যে, এই ঐতিহাসিক নাট্য-বিতর্কে অংশ নিয়ে এবং আলোচ্য মূল্যায়ন রেখে স্তালিন আবার ঐ নাটকের অভিনয়ে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

উপরে উল্লেখিত ঘটনা ও স্তালিনের পত্র থেকে নাট্য বা শিল্পবিচারের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য বেরিয়ে এসেছে। প্রথমত, সচেতনভাবে শিল্পী বা লেখক লেনিন-কথিত 'পার্টিজানশিপ'-এর অঙ্গীভূত না হলেও সমাজ বাস্তবতার প্রতি নিষ্ঠা ও শিল্পীর সততা থাকলে তাঁর সৃষ্টি প্রগতি বা জনগণের 'পার্টিজান' হতে পারে। ব্যক্তিগতভাবে তাঁর মতামত যা-ই হোক না কেন, সেটা দেখার দরকার নেই এবং রচনার খুঁটিনাটি ভুল নিয়ে মাথা ঘামানোর চেয়ে দর্শক বা পাঠকমনে প্রধান ছাপটা কি সেটাই বড় কথা। দ্বিতীয়ত, প্রগতির বা জনগণের 'পার্টিজান' হবার অন্যতম শর্ত হল, রচনাকে আকর্ষণীয় শিল্পসম্মত হতে হবে।

পুনশ্চ ঃ

বালজাক ও টলস্টয়ের যুগে সাম্রাজ্যবাদী প্রচার-মাধ্যমগুলি আজকের মত স্বভাবতই এত শক্তিশালী ও বহুবিস্তৃত ছিল না। ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়াশীল মতাদর্শের গণ-প্রভাব তত উদ্বেগের কারণ ছিল না।

কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তির কল্যাণে সংবাদপত্র, রেডিও-টি ভি, চলচ্চিত্র ইত্যাদির মাধ্যমে বড় বড় লেখক-দার্শনিক ও বিজ্ঞানীদের ব্যক্তিগত মতবাদ সারা বিশ্বজনগণের মধ্যে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে রলাঁ-রবীন্দ্রনাথ-আইনস্টাইন কি বললেন সেটাও যেমন মানুষকে উদ্দীপিত করেছে, জাপানী কবি নোগুচি, জার্মান দার্শনিক গোয়েবেলস এবং ইতালিও বুদ্ধিজীবি মুসোলিনী কি বলছেন, সেটাও তেমনই মানুষকে যুদ্ধ ও ফ্যাসিবাদী সংস্কৃতির সপক্ষে টেনেছে।

সম্প্রতি আমাদের দেশে বিশিষ্ট লেখক-বুদ্ধিজীবীরা কে কতটা রক্ষণশীলতার পক্ষে ও জনগণের প্রগতির পক্ষে ব্যক্তিগত মতবাদ ব্যক্ত করলেন তার প্রভাব—আজকের উন্নত ও স্পর্শকাতর প্রচার-মাধ্যমের যুগে, অধিকতর রাজনৈতিক সচেতনতার স্তরে যথেষ্ট কাজ করে বৈকি!

পুনর্মূল্যায়নে সতীনাথ ভাদুড়ির রাজনৈতিক উপন্যাস

রাজনৈতিক উপন্যাস কাকে বলবো ?

উপন্যাস তার জন্মসূত্রেই মূলত রাজনৈতিক। সামন্ততন্ত্রের ধর্ম-দর্শন ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রথা-সংস্কার, ধ্যান-ধারণা, জীবন ও জগৎ সম্পর্কে যে মায়া বা কুয়াশা সৃষ্টি করে রেখেছিল, ১৬-শ ও ১৭শ শতাব্দির বুর্জোয়া বিপ্লবের আঘাতে, সর্বোপরি ১৮শ শতাব্দির শিল্প-প্রযুক্তি ও ধনতন্ত্রের বিকাশে মানুষ তার জীবন ও জগতকে বাস্তব রূপে ফিরে পেয়েছিল। ব্যক্তি ও বাস্তব জগতের অধিকারবোধই বুর্জোয়া বিপ্লবের মহত্তর অবদান এবং উপন্যাস এই ধনতান্ত্রিক বিপ্লবের শ্রেষ্ঠ শিল্পরূপে।

সামন্ততান্ত্রিক সমাজের শ্রেণী-বিরোধ নানামুখী ধর্মীয় দর্শন ও আচার-প্রথার আবরণে আড়াল করে রাখা হয়েছিল, ব্যক্তি-আমি বলে কিছু ছিল না। মায়াময় জগতেরই একটা সমর্পিত অংশ ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু ধনতন্ত্র শ্রেণী-বিরোধ ও শ্রেণীশোষণ তীব্রতর করার সঙ্গে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির সামাজিকী-করণের সঙ্গে ব্যক্তিত্ব ও বাস্তব জগৎ স্পষ্টতর ও সক্রিয় হয়েছে। বাস্তব জগতের বা সমাজের গতিশীলতা বা পরিবর্তনশীলতা ব্যক্তির মধ্যে বিষয়ীভূত অনুষঙ্গ দিয়ে তাকে বিশিষ্ট স্থান-কালের মধ্যে সজীব করে তুললো।

কাজেই উপন্যাসে যে ব্যক্তি ও সমাজ বাস্তবতার সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন অভিজ্ঞতা, গতিশীলতা ও দ্বান্দ্বিকতার প্রতিফলন ঘটে তা শ্রেণীবিভক্ত ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থারই ফল ও চলাচল। ক্রীস্টোফার কডওয়েল বলেছেন—

"The novel can only evolve in a society where men's experience do differ so markedly among themselves as to make the objective approach necessary, and this difference of experience is itself the result of rapid change in society, of an increased realisation of life as process, as dialectic."

এই কারণেই বলেছি, উপন্যাসের চরিত্রটাই হচ্ছে রাজনৈতিক।

মানুষ যখন যৌথ আদিম স্তরে প্রকৃতির নানামুখী ঘটনার সামনে বিমূঢ় ও বিভ্রান্ত, তখন সে বড়জোর ওডেসিউস ('ওডেসি' মহাকাব্যে) হয়েছে—একটা প্রাকৃতিক কাল্পনিক জগতে অংশ রূপে তাড়িত হয়েছে। কিন্তু যেদিন থেকে সে প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে, প্রকৃতিকে জয় করার আনন্দে নিজেকে আবিষ্কার

করলো, আত্মসচেতন হতে সুরু করলো, তখনই উপন্যাসের আদিরূপ 'রোবিনসন ক্রুসো' সৃষ্টি হয়েছিল।

উপন্যাসের জগৎ বাস্তব বলার অর্থ এই নয় যে, তা ফোটোগ্রাফিক। পরিবর্তনশীল ও বৈচিত্র্যময় সমাজে সর্বদাই যে দ্বন্দ্ব চলছে, তার প্রক্রিয়ায় ব্যক্তি-মানুষ কিভাবে ভাঙছে, বদলাচ্ছে, পিছিয়ে যাচ্ছে অথবা স্থিতাবস্থায় নিজেকে এলিয়ে দিচ্ছে, এইসব ঘটনাই সজীব ছবি ও দলিল হয়ে ওঠে উপন্যাসে। শ্রেণীবিভক্ত অবিরাম ভাঙাগড়ার আবর্তে চলমান সমাজবাস্তবতায় ব্যক্তি-মানুষের যে আচরণ ফুটে ওঠে তার মধ্যে কোন-না-কোন শ্রেণীধারার রাজনৈতিক উপাদান থেকে যাবেই। এই অর্থেই উপন্যাস মানেই রাজনৈতিক জীবনশিল্প।

বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস

আমাদের দেশের ব্রিটিশ উপনিবেশতন্ত্রের মিশ্র-অর্থনীতি—চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, রেল টেলিগ্রাফ ও পাশ্চাত্যশিক্ষা—এরই মধ্যে রোপিত হয়েছে সামাজিক দ্বন্দ্ব। একদিকে রামমোহন-বিদ্যাসাগর-ডিরোজিয়ানদের বেকনীয় যুক্তিবাদের ধারা, অপরদিকে বর্ণহিন্দু মধ্যস্বত্বভোগীদের শ্রেণী-স্বার্থের উপযোগী হিন্দুমেলা ও বঙ্কিমচন্দ্রীয় হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদী রোমান্স বা সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদের ধারা আমাদের জাতীয় বা রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণায় এনেছিল সংশয় ও বিরোধ। অবশ্য শেষোক্ত ধারাই শ্রেণী-প্রাধান্যের কারণে বেশি তীব্র ও ব্যাপক হয়েছিল। এই রকম সাম্প্রদায়িক দেশপ্রেমের জাগরণে ব্রিটিশ শাসকের আপত্তি ছিল না। কারণ তা ছিল সাম্রাজ্যবাদী শাসনে ও শোষণে বিক্ষুব্ধ প্রজাদের রাজনৈতিক পরিস্রুতি প্রক্রিয়া। তাছাড়া এই রকম 'নির্দোষ' রাজনীতিতে তাদেরই সুবিধা। এতে মুসলমান সম্প্রদায়ের বিচ্ছিন্নতা আরও বেড়েছে। সিপাহী ও নীল বিদ্রোহের আতঙ্ক কাটানোয় হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের এই রকম রাজনৈতিক ভাবধারাই কাজ করেছে। সুতরাং 'নীলদর্পণ' রোখো, আর 'আনন্দমঠ-দেবীচৌধুরাণী-সীতারাম'-কে জাতীয়তা-বাদী বা রাজনৈতিক বেদ বানাও। অবশ্য সরাসরি ব্রিটিশ-স্বার্থ রক্ষার লক্ষ্যে এগুলি রচিত না হলেও, সহযোগী মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণীর জমি ও সম্পত্তির স্বার্থ রক্ষার লক্ষ্যটা প্রচ্ছন্ন থাকেনি।

বঙ্কিমচন্দ্রের এই শ্রেণীস্বার্থবাহিত জাতীয়তাবাদী ভাবধারার যথার্থ

উত্তরসাধক হলেন তারাশঙ্কর, শরৎচন্দ্র স্ববিরোধী এবং রবীন্দ্রনাথ বুর্জোয়া উদারনৈতিক ও যুক্তিবাদী ভাবাদর্শের টানে 'গোরা'তে তামিজ মিঞা পর্যন্ত ছুঁয়েও 'চার-অধ্যায়'-এর বেড়া ভাঙ্গতে পারেননি।

প্রসঙ্গত বলে রাখি, তথাকথিত এ্যাকাডেমিক সাহিত্য-সমালোচকরা হয়ত বলবেন, এ তো সামাজিক উপন্যাস-এর কথা! বঙ্কিমের মুসলিম-ভারত ও হিন্দু রাজা-রাজড়াদের কাহিনী তো এই সব উপন্যাসে আসেনি! ঠিকই, মধ্যযুগীয় রোমান্টিক পোষাক ছেড়ে পরবর্তী বাংলা উপন্যাসের পটভূমি, প্লট ও চরিত্রের মূল উপাদান সেই একই—বর্ণহিন্দু মধ্যস্বত্বভোগীদের মার্জিত শ্রেণী-স্বার্থের প্রাধান্য এবং যেখানেই শ্রেণী-সংঘাতের সম্ভাবনা, সেখানেই এড়িয়ে যাওয়া বা থেমে যাওয়া।

রাজনীতি তো এরই নাম—সমাজের অর্থ-ব্যবস্থাপুষ্ট শ্রেণীগত অবস্থানের ব্যবহারিক ও মানসিক টানাপোড়েনের প্রতিফলন। এই অর্থে যে-কোন সমাজ-সচেতন বস্তুনিষ্ঠ সাহিত্যই রাজনৈতিক।

তবে বিশেষ অর্থে আমরা নিশ্চই রাজনৈতিক নাটক, কবিতা বা গল্প-উপন্যাস তাদেরই বলবো যেগুলিতে শাসনক্ষমতার অবস্থান ও তার সঙ্গে সামাজিক শ্রেণীগুলির সম্পর্ক ও সংঘাত এবং শ্রেণীগুলির মধ্যেও পারস্পরিক সম্পর্ক স্পষ্টত ফুটে ওঠে। শাসক যদি বিদেশী হয়, তবে এক ধরণের স্বদেশপ্রেম বা জাতীয়তাবাদ, যা নিজেদের শ্রেণী স্বার্থের মুখ চেয়েই প্রকাশিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। এ ক্ষেত্রে নেতৃত্বের প্রশ্নটাও থাকে। চাষী তোরাপের বীরত্বটা জমিদার নবীনমাধবের ততক্ষণই সহনীয় যতক্ষণ তা ব্রিটিশ নীলকর-দের বিরুদ্ধে উদ্গীরিত হয়। কিন্তু এই ঘটনার পঞ্চাশ বছর পরেও 'ধূমকেতু'র নজরুল যখন সরাসরি কৃষক আন্দোলনের পক্ষে 'লাঙল'-এ রূপান্তরিত হলেন, তখন শরৎচন্দ্রের সব্যসাচী মধ্যবিত্ত অহমিকার খাঁচা থেকে শশিকবিকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য এবং হেয় করেন। অর্থাৎ 'পল্লীসমাজ'-এ আকবররা যতক্ষণ পর্যন্ত রমেশদের ভক্ত ও অনুগত থাকে, ততক্ষণই তারা 'মানুষ', আর 'চৌরীচৌরা'র (১৯২২) সত্যাগ্রহ যখন জমিদারদেরও 'খাজনা-বন্ধ' আন্দোলনে আত্মপ্রকাশ করে, তখনই মধ্যস্বত্বভোগী ধনী নেতৃত্বের দেশপ্রেমের সীমাবদ্ধতা ও ফাঁকিটা ধরা পড়ে যায়—'ছোটলোকগুলো' মাথায় ওঠে, এমনকি সত্যাগ্রহও বন্ধ হয়ে যায়।

এই পটভূমিকাতেই সতীনাথ ভাদুড়ির 'জাগরী', 'ঢোঁড়াই-চরিত' এবং

'চিত্রগুপ্তের ফাইল' উপন্যাসের বিচার করতে হবে। অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে, এরই মধ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী ও পুঁজিবাদী সংকট ও অত্যাচার তীব্রতর হয়েছে, দেশে দেশে জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম প্রত্যক্ষ ও ব্যাপক হয়েছে, সর্বোপরি ১৯১৭ সালে শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রণী পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত বিপ্লবের ফলে সোভিয়েত রাশিয়ায় দুনিয়ার প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে এবং আমাদের দেশেও কমিউনিষ্ট পার্টি ও কৃষকদের বিপ্লবী সংগঠন শোষিত জনগণের মধ্যে কাজ করতে নেমেছে।

বাংলা সাহিত্যে কথাশিল্পী সতীনাথ ভাদুড়ী যতটা 'বিতর্কিত', ততটা পঠিত নয়। যতটা 'বিস্ময়কর' ততটা জনপ্রিয় নয়। এর কারণঃ একটি স্বাধীন দেশে আজ পর্যন্ত জনগণের শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশ যতটা হবার কথা, ততটা হয়নি, লেখকরা যতটা বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্ততার পরিমার্জনায় ঝকঝকে ততটা গণমুখী সংস্কৃতি-চেতনায় উন্নত নয়। এই রকম প্রত্যাশিত ঘটনা যে হয়নি, তারও কারণ নিহিত রয়েছে আমাদের স্বাধীনতার ফাঁকি ও আর্থ-সামাজিক বিকাশের অসম্পূর্ণতা ও অপুষ্টির মধ্যে।

কিন্তু এটাই শেষ কথা নয়। রাজনৈতিক পরিবেশ বা সমাজের মধ্যেকার দ্বন্দ্বে ব্যক্তিমানসে যে সব মোচড় লাগে, তার দরুণ সৎ স্পর্শকাতর ও সমাজসচেতন লেখক-শিল্পীদের দৃষ্টিভঙ্গির পর্দাও একটা-একটা সরতে থাকে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ধাক্কায় বিরাট একটা পরিবর্তন এলো রবীন্দ্র চেতনায়, নজরুল এথিজম থেকে বলশেভিজম-এ রূপান্তরিত হলেন (যদিও শেষ জীবনে 'মানসিক বিপর্যয়' এসে তাঁর সৃষ্টির পথকেও কুয়াশাচ্ছন্ন করে দেয়), শরৎচন্দ্র কংগ্রেসী গান্ধীবাদের পথে নেমেও তার সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করেছেন এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ফ্রয়েড' থেকে মার্ক্স-এ উত্তরণ তো উত্তরকালের সৃষ্টিগুলিকে ইতিহাস ও সমাজবিকাশের বাস্তব সত্যকেই ফুটিয়ে তুলেছে।

জাগরী :

সতীনাথ ভাদুড়ীর সাহিত্য-জীবন তাঁর প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক জীবনের ফল। তাঁর 'জাগরী' (১৯৪৫) কংগ্রেস কর্মী হিসাবে ব্রিটিশ কারাগারে বসে লেখা। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মতাদর্শে জারিত অস্তিত্ববাদী জয়েসীয় বা প্রুস্তীয় ভঙ্গিতে লেখা এই উপন্যাসে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ক্রোধ জাগানোর চেয়ে

মতাদর্শ ও মানবিকতার দ্বন্দ্ব এবং আত্ম-সমীক্ষণ-জাত ব্যক্তিগত উপাদানগুলিই প্রাধান্য পেয়েছে। এতে কংগ্রেসী বিলুর প্রতি কমিউনিস্ট নীলুর 'বিশ্বাস-ঘাতকতা'কেই বড় করে দেখানো হয়েছে।

এরই গভীরে সতীনাথের মানসলোকে কাজ করেছে পচনশীল পুঁজিবাদের তথাকথিত বাস্তববাদী বা প্রকৃতিবাদী (কল্লোল যুগের) সাহিত্যাদর্শ এবং গান্ধীবাদী রাজনীতির সীমাবদ্ধতা। তিরিশের দশকে 'পুতুল নাচের ইতিকথা' ইত্যাদি গল্প-উপন্যাস লেখার পর ১৯৪২ সালে মার্কসবাদে দীক্ষিত হবার পর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন "মার্কসবাদই যখন মানবতাকে প্রকৃত অগ্রগতির সঠিক পথ বাতলাতে পারে, অতীত কি ছিল, বর্তমান কি হয়েছে এবং কিভাবে কোন্ ভবিষ্যৎ আসবে জানিয়ে দিতে পারে তখন মার্কসবাদ সম্পর্কে অজ্ঞ থেকে সাহিত্য করতে গেলে এলেমেলো উল্টোপাল্টা অনেক কিছু তো ঘটবেই।" [সাহিত্য করার আগে]

একই সময়ে সতীনাথ বলছেন—'একটা বিশেষ রীতি যা গরিব লোকেদের নিয়ে লেখা বইয়ে সবচেয়ে বেশি প্রচলিত (বামপন্থী) সাহিত্যে—সেটা সাহিত্যের পক্ষে একটু স্থূল মনে হয়েছিল আমার।' আমার ধারণা, ইএ কারণেই 'জাগরী' স্বাধীনতা আন্দোলনের বাতাবরণে লেখা 'উপন্যাস' হয়েও বেশি পরিমাণে পারিবারিক ও সূক্ষ্ম ব্যক্তি-সর্বস্ব অস্তিত্বকণার আবর্তে ঘুরপাক খেয়ে 'এলোমেলো উল্টোপাল্টা' হয়েছে।

প্রসঙ্গত লেখকের নৈর্ব্যক্তিকতা ও বাস্তববোধের প্রশ্নটি বিচার করতে হয়। গোড়াতেই বলে রাখি, যে কোন যুগে যে কোন সৎ, নিষ্ঠাবান ও ইতিহাস-চেতনাসম্পন্ন লেখকের সৃজনশীল কাজে নৈর্ব্যক্তিকতা বা প্রচারহীনতার ব্যাপারটাই অবাস্তব। রাজনীতি বা ঐতিহাসিক বাস্তবতার প্রশ্নে আসার আগে ব্যক্তিগত চরিত্রগুলির গঠন সম্পর্কে সতীনাথের পছন্দের দিকটা একটু বুঝে নেওয়া দরকার। বিলু গোড়া থেকেই সহনশীল, শান্ত ও মিষ্ট স্বভাবের, সবারই প্রিয়, হিংসা বা রক্তে তার গা শিউরে ওঠে। অথচ বিশ্বাসে অটল। অপরপক্ষে নীলু একগুঁয়ে, কাটখোট্টা, আত্মবিশ্বাসের বালাই নেই, ভয়ে শঙ্কিত, আবার নিজের সুবিধা সম্পর্কে সচেতন। বোঝাই যায়, কংগ্রেসী বিলুর সঙ্গে কমিউনিস্ট নীলুর, লেখকের সাপেক্ষতার মাত্রাটা কোন্ দিকে ভারী।

বিয়াল্লিশের আগষ্ট আন্দোলনের ঘটনা থেকে 'জাগরী'র আত্মকথনসর্বস্ব চরিত্রগুলির আত্মপ্রকাশ হয়েছে।

এর আগে দেশে গান্ধিজীর নেতৃত্বে অহিংস সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুধু ব্যর্থই হয়নি, চৌরীচৌরার ঘটনার পর চিত্তরঞ্জন-সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে স্বরাজ্য দল গড়েছেন, শরৎচন্দ্র কংগ্রেস ছেড়েছেন, ১৯৩০-এর আইন-অমান্য আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা রাজনীতি-সচেতন সৎ স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের কাছে ধরা পড়েছে, মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় মুজফ্‌ফর আহমদ প্রমুখ কমিউনিস্ট দেশপ্রেমিকরা আসামীর কাঠগোড়ায় দাঁড়িয়ে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী রাজনীতির জয় ঘোষণা করেছেন এবং পূর্ণ স্বাধীনতার ডাক দিয়েছেন এবং সর্বোপরি ইতালি, জার্মানী ও স্পেনে বিশ্ব-ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে গোর্কি রলাঁ বারবুস-আইনষ্টাইন রবীন্দ্রনাথ প্রেমচন্দ মুল্‌করাজ আনন্দ প্রমুখ লেখক বুদ্ধিজীবী জনগণের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের সপক্ষে ঐক্য ও সংগ্রামের সংকল্প ঘোষণা করেছেন।

১৯৪২ সালে ফ্যাসিষ্ট জার্মানী যখন সোভিয়েত সমাজতন্ত্র ধ্বংসের আগ্রাসী অভিযান চালায়, তখনই সেই বিশ্ব-ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে শ্রমজীবী জনগণের স্বাধিকার রক্ষার ঐতিহাসিক সংগ্রামের পর্বে (জনযুদ্ধের পর্বে) কংগ্রেস মিত্রশক্তি ব্রিটিশের বিরুদ্ধে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের ডাক দিল। অর্থাৎ শ্রমিক শ্রেণী সমাজতন্ত্র বা কমিউনিষ্টদের বিপ্লবী সংগ্রামের বিজয় ও প্রসার হলে পাছে জাতীয়তাবাদী ধনীকশ্রেণীর কংগ্রেস দলের স্বরাজপ্রাপ্তি কেঁচিয়ে যায়, তাই একই সাথে পরোক্ষে ফ্যাসিবাদের পক্ষে এবং প্রত্যক্ষে কমিউ-নিষ্টদের জনযুদ্ধ ধ্বংস করতে গান্ধিজী-নেহেরুর দল 'ভারত ছাড়ো' হাঁক ছাড়লো। একই বছরে কমিউনিষ্ট লেখক ও শ্রমিকনেতা সোমেন চন্দ্রকে ঢাকার রাজপথে খুন করা হল [অথচ জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস কর্মী বিলু রক্ত ও হিংসা সইতে পারে না]। সতীনাথের অজানা নয়, ১৯৪৫ সালেই নির্ভয়ে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সোভিয়েতের লাল ফৌজের বিজয়-মুহূর্তে দাঁড়িয়েই কমিউনিস্ট কবি সুকান্ত ব্রিটিশ শাসকের প্রতি সগৌরবে উচ্চারণ করেছেন।

'দিগ্বিজয়ী দুঃশাসন
অনেক নিয়েছ রক্ত
অনেক দিয়েছ অত্যাচার
এইবার তোমার বিচার···'

এরই নাম ঐতিহাসিক বা রাজনৈতিক মূল্যবোধ। এই মূল্যবোধে দুর্বলতা ও সংকট ছিল বলেই বিলুর প্রতি পক্ষপাত এবং নীলুর প্রতি অবহেলা জাগরীতে প্রচ্ছন্ন থাকেনি। তাহলে প্রচার বা ব্যক্তিগত ঝোঁকটা

কোন্ দিকে এটা ধরতে অসুবিধা হওয়ার কারণ আছে কি ? সতীনাথের পক্ষে এটাই স্বাভাবিক ছিল।

আর বামপন্থী বা কমিউনিস্ট মতাদর্শের প্রতি তাঁর অনীহার কথা তো নিজেই প্রকাশ করেছেন। আমরা কিন্তু কখনোই বলি না সাহিত্য প্রচার নয়। যেখানেই প্রকাশ, সেখানেই প্রচার, প্রকাশনারই প্রচার। এস্কাইলাস, ফাউস্ট, ম্যাকবেথ, মুক্তধারা, গোরা—সবই প্রচার। জীবনসত্যের, দর্শন-সংস্কৃতি ভাবনার প্রচার, লেখকের মধ্যে সমকালের ঘনীভূত ঐতিহাসিক ও সামাজিক মূল্যবোধের প্রচার· সমাজবিকাশের নানা ভাঁজ বা বাঁকগুলি ধরিয়ে দেবার প্রচার। ভাববাদ ও গান্ধীবাদ হলে প্রচার নয়, আর বস্তুবাদ ও মার্কসবাদ হলেই প্রচার হবে—এ কেমন যুক্তি ? ধরা যাক, ১৯৪২ সালের মার্চে লেখা সোমেন চন্দের 'দাঙ্গা' গল্পের কথা। হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা হচ্ছে। ব্রিটিশ-বিরোধী 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন চলছে এবং কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক শক্তির সমাবেশ ঘটিয়ে ফ্যাসিস্ট-বিরোধী জনযুদ্ধের পর্ব চলছে। ভাই অজয় হিন্দু সোস্যালিস্ট, দাদা অশোক কমিউনিস্ট। তাই অজয় দাঙ্গা-বিরোধী আবেদনের ইস্তাহারগুলি পোড়াচ্ছে। অশোক বাধা দিচ্ছে ঃ

ঃ 'এ সব কী করছিস ?

ঃ কি আবার করব ! মড়া পোড়াচ্ছি।

ঃ অজু, চোখ যখন অন্ধ হয়নি, একটু পড়াশোনা কর। তারপর পলিটিক্স করিস।

ঃ রাখো, তোমার কম্যুনিজম। ওসব আমরা জানি।

ঃ কি জানিস, বল।

ঃ সব জানি, তোমরা দেশের শত্রু।'

ঃ তোরা হলি ফ্যাসিস্ট এজেন্ট। বড়লোকের দালাল।'

এতে কি প্রচার নেই ? অজয় এবং অশোক দুজনেই নিজের-নিজের মতাদর্শের প্রচার করছে। আবার এরই মধ্যে কোন চরিত্র যদি 'অরণ্যের দিন-রাত্রি' হন্যে হয়ে বাস্তবজীবন থেকে পালিয়ে গিয়ে অলৌকিক 'চির বসন্তের দেশে' 'নীলকন্ঠ পাখির খোঁজে' মার্কিনী হিপির মত 'দিক্‌ভ্রান্ত' হয়, তবে সেটাও একটা প্রচার হবে· ভাববাদী উদ্ভটতত্ত্ব বা ফ্রয়েডীয় মনোবিকলনের প্রচার হবে।

উপন্যাস-বর্ণিত কাহিনী সুরু হয়েছে গান্ধীবাদী কংগ্রেস কর্মী বিল্লুর

ফাঁসির মুহূর্তে। কমিউনিস্ট ভাই নীলু ধরিয়ে দিয়েছে। এরা এবং তাদের মা-বাবা কে কি ভাবছে ঃ

বিলু ঃ 'নীলু এ তুই কী করলি। একটা লোহার হোরাইজেণ্টাল বার-এ আমার মৃতদেহ ঝুলিতেছে···'

বাবা ঃ 'ভগবান! মহাত্মাজী! বিলুর মাকে আঘাত সহ্য করিবার শক্তি দাও, নীলুর মনে বল দাও, বিলুর আত্মাকে শান্তি দাও—

'রঘুপতি রাঘব রাজারাম, পতিতপাবন সীতারাম।'

মা ঃ 'একটা গুবরে পোকা উড়ছে। শব্দ হচ্ছে ভোঁ-ও···। ঠক্ করে মাটিতে পড়ে গেল। আবার উড়ছে, আবার কিসে ঠোকর খেয়ে পড়ে গেল। এখনও ওঠেনি—এখনও না···মা, তুমি তো জাগ্রতা দেবী! আর আমি গান্ধীজিকে তোমার চাইতে বড় মনে করব না।'

নীলু ঃ 'দাদা শেষ মুহূর্তে কাহার কথা ভাবিবে—মা'র, জ্যাঠাইমার, না আমার? আমার কথা ভাবিবে কেন? নিশ্চয়ই ভাবিবে। চিন্তা ভরা থাকিবে গ্লানিতে বিষাদে, আমার উপর অভিমানে।···আমার সম্মুখে বেদনা-জর্জর সমাজের অগণিত কাজ পড়িয়া আছে। সমাজের যুগ যুগ সঞ্চিত অশ্রু মুছানোর ভার যাহার উপর ন্যস্ত, তাহার কি সংকীর্ণ গৃহ কোণের দু-চার বিন্দু তপ্ত অশ্রুর কথা মনে পড়িলে চলে?'

এ উপন্যাস একটু খুঁটিয়ে বিচার করলেই ধরা পড়ে লেখকের রাজনৈতিক আনুগত্যের বা পক্ষপাতিত্বের ঘোর কোনদিকে। লেখক এখানে বিষয়-নির্ভর নৈর্ব্যক্তিক বাস্তবতার পক্ষেও নেই, আবার দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের সামাজিক বাস্তবতার শিল্পী থাকার প্রশ্নও ওঠে না। যা প্রতিফলিত, এক কথায় তাকে বলা চলে ভাববাদী দৃষ্টিকোণে আত্মগত বা মন-সমীক্ষণের চিন্তাস্রোত। সমালোচকদের একাংশ 'জাগরী'র এই রীতিকেই গৌরবান্বিত করে আত্মতৃপ্তি প্রকাশ করেছেন। এমনকি একেই আদর্শ রাজনৈতিক উপন্যাসের দৃষ্টান্ত বলে সার্টিফিকেট দিয়েছেন। এই কারণেই, অর্থাৎ রাজনৈতিক বা বহির্মুখী ঘটনাপ্রবাহের ঊর্ধে আত্মনিরীক্ষার আবর্ত সৃষ্টির মুন্সিয়ানার কারণে তাঁরা রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' ও তারাশঙ্করের 'ধাত্রীদেবতা'কে খানিকটা মেনে নিলেও, শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী', নজরুলের 'কুহেলিকা' বা 'মৃত্যু-ক্ষুধা', সুবোধ ঘোষের 'তিলাঞ্জলী', মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্তর-তিরিশে রচিত কথাশিল্পকে সফল রাজনৈতিক উপন্যাস বলে চিহ্নিত করতে নারাজ। আসলে এইসব সাহিত্য-সমালোচকদের মনোভাবে 'শিল্পের জন্য শিল্প'

মতবাদের জট আচ্ছন্ন করে আছে। লক্ষ্য করা যায়, এঁরা সতীনাথের শিল্পী-মানসের উত্তরণ প্রয়াসকে গুরুত্ব না দিয়ে, মাঝের 'ঢোঁড়াই-চরিত মানস', চিত্রগুপ্তের ফাইল' ও 'গণ-নায়ক' ডিঙিয়ে একেবারে পঞ্চাশের দশকে রাজনৈতিক ক্ষমতা-হস্তান্তর-এর প্রকৃতি-পরিচয়ে হতাশাগ্রস্ত বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিসত্তার বুদ্‌বুদে ভরা 'সংকট' ও 'দিক্‌ভ্রান্ত'তে চলে যান এবং সতীনাথ ভাদুড়ীর সাহিত্য মূল্যায়নে আংশিক সত্যই ব্যক্ত করেন! বুর্জোয়ারা শ্রমজীবী মানুষকে ততটুকুই শিক্ষা-সংস্কৃতি দিতে চায় যতটা তাদের শ্রেণী-শোষণের পক্ষে দরকারী। তারা মধ্যবিত্তদের দ্বিধা-দুর্বলতার দিকটাকেই প্রচার করে, সংগ্রামী মানসিকতা ও উত্তরণের দিকটাকে বর্জন করে বা মুছে দিতে চায়। তাই তারাশঙ্কর তাদের অত প্রিয়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ফ্রয়েডীয় বাস্তবতা' নিয়ে ঢলে পড়েন এবং সতীনাথের আত্ম-নিরীক্ষামূলক 'জাগরী' এবং গণ-জীবন-রাজনীতির ক্ষেত্র থেকে মুখ ফিরিয়ে কুলায় প্রত্যাবর্তনকামী প্রবণতায় জারিত 'সংকট-দিক্‌ভ্রান্ত-অচীনপুর' নিয়ে মশগুল থাকে। কিন্তু মানিকের উত্তরকালের বিপ্লবী জীবনদর্শনের গল্প-উপন্যাস, এমনকি সতীনাথের 'ঢোঁড়াই-চরিত মানস' নিয়ে আদৌ উচ্চবাচ্য করে না। বড়জোর ঢোঁড়াইকে আদিম মানবজীবনের 'অস্তিত্ববাদী চৈতন্য প্রবাহ'-এর প্রতীক চরিত্র বলে 'গবেষণামূলক' ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করে।

ঢোঁড়াই-চরিত মানস ঃ

সতীনাথ ভাদুড়ী ১৯৪২ সালে ভাগলপুর সেণ্ট্রাল জেলে 'জাগরী' লেখেন। ১৯৪৫ সালে ফ্যাসিষ্ট হিটলারের পরাজয়, সোভিয়েত সমাজ-তান্ত্রিক শক্তিরও দেশে কমিউনিস্ট আন্দোলনের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি এবং সর্বোপরি কংগ্রেস দলের সাম্প্রদায়িক ও ধনিক শ্রেণীর সঙ্গে আপোষকামী রূপের নগ্ন প্রকাশ ও ক্ষমতা হস্তান্তরের বিশ্বাসঘাতী চরিত্র সতীনাথের মত সৎ ও আদর্শনিষ্ঠ সমাজ-মনস্ক শিল্পীকে ১৯৪৮ সালে কংগ্রেস ছাড়তে বাধ্য করে। অতঃপর তিনি মাস তিন-চার ফাঁকা থেকে জয়প্রকাশের কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট পার্টিতে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগ দিয়ে বোঝেন, এখানে তাঁর থাকা চলবে না। কারণ, সতীনাথের ভক্ত হিন্দী সাহিত্যিক ফণীশ্বর রেণু তাঁর 'ভাদুড়ীজি' বইয়ে বলেছেন—"জেলার (পূর্ণিয়া জেলার) সেরা জমিদার ছেলেরা পার্টিতে ঢুকেছিল। ওরা চাইত না পার্টিতে এমন কোন ব্যক্তি আসুক যিনি কিষাণ-মজদুরদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা সুরু করবে।" স্বভাবতই সতীনাথ

কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগ না দিয়ে (বামপন্থী পার্টির গঠন এ আন্দোলন সম্পর্কে তাঁর বরাবরই অনীহা ছিল) সাহিত্যের মাধ্যমে লোকজীবনসম্ভব সমাজ-বাস্তবতায় 'রামচরিত-মানস'-এর (তুলসীদাস) আঙ্গিকে 'ঢোঁড়াই-চরিত'-এ তাঁর সৎ ও পরিশীলিত মধ্যবিত্ত-মানসের তৃপ্তি পেতে চাইলেন।

সতীনাথের মধ্যবিত্ত শ্রেণী-মানস (নিশ্চই উনিশ শতকী মধ্যসত্ত্বভোগীদের শ্রেণী-স্বার্থ নয়) এবং ভাববাদী ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদী জীবনদর্শনের সঙ্গে মিশেছিল দরদী ও সৎ শিল্পীসত্তা যার টানে তিনি কংগ্রেসী রাজনীতি ও কংগ্রেস সোশ্যালিষ্ট রাজনীতির খোলস ভাঙতে ভাঙতে বেরিয়ে এসেছিলেন পূর্নিয়ার তাৎমা-ধাঙড়দের (গান্ধীরই হরিজন আন্দোলনের প্রভাবে) পাড়ায়। ব্যক্তিজীবনের ব্যবহারিক দিকে গান্ধীবাদী কংগ্রেসী রাজনীতি বা কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট পার্টি ছাড়ার সঙ্গেই যে মানসিক জগত থেকে ভাববাদী দর্শন, স্পিনোজা—সার্ত্রে—কাম্যু—অ্যামিস-এর অস্তিত্ব-সন্ধানী অন্তর্মুখী প্রবণতা-গুলি কেটে যায় তা নয়: তা ছাড়া সতীনাথ সেগুলি কাটাতে চেয়েছিলেন বলেও নজির নেই। তাহলে তিনি 'জাগরী'র ব্যক্তিগত আত্মনিরীক্ষা ও মধ্য-বিত্ত পরিবারের সম্পর্ক-সমীক্ষার ক্ষেত্র থেকে বাংলা বিহারের প্রত্যন্ত অঞ্চলের আদিবাসীদের বাস্তব জীবনের দিকে মুখ ফেরালেন কেন? কারণ তাঁর সাহিত্যিক-মানসে ভাববাদ ও পুঁজিবাদ-পূর্ব ভারতীয় লোকসমাজের ঐতিহ্য সম্পর্কে একটা স্বাভাবিক আকর্ষণের টানাপোড়েন ছিল (তুলসীদাসী রামায়ণের জনপ্রিয়তা এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্য চরিতামৃতে'র সমাজ) এবং সর্বোপরি ১৯৪৭ সালে ক্ষমতা হস্তান্তরের মধ্যে যে 'স্বাধীনতার ফাঁকি' এবং তথাকথিত শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের মধ্যে (পুঁজিপতি-জমিদার শ্রেণীর প্রশ্ন না ধরলেও) যে বিচারবোধহীন শিশুসুলভ আবেগ-প্রবণতা তাঁর শিল্পী-সত্তাকে আহত করেছিল, তাই-ই তাকে তাৎমা-ধাঙড়দের লোকজীবন-পরিক্রমায় উৎসাহিত করেছে। হয়ত বা তাদের জীবনের মধ্যে মানসিক আশ্রয় নিয়ে বাঁচতে চেয়েছিলেন।' মানসিক আশ্রয়ের কথাটা সচেতনভাবেই বললাম। তা না হলে সমকালের বাস্তব জীবন-পরিক্রমায় 'রামায়ণ'-এর আঙ্গিক আনলেন কেন? নাকি তখনও গান্ধীবাদী জীবনদর্শনের আলোয় হরিজন-শুদ্ধির বাসনা কাজ করেছিল? নইলে ঢোঁড়াই-কে 'পতিতপাবন' রাম-চরিতে নিষিক্ত করার উদ্যোগ নিলেন কেন? আসলে সতীনাথ যে শিল্পী হিসাবে বাস্তববাদী এবং ব্যক্তি হিসেবে ভাববাদী দার্শনিক প্রবণতায় আচ্ছন্ন ছিলেন, তারই প্রতিফলনে 'ঢোঁড়াইচরিত মানস' উপন্যাসের সৃষ্টি। ডায়েরীতেও তিনি এক যায়গায়

বলছেন—'ইচ্ছা ছিল আমার জ্ঞানে গ্রামের নিরক্ষর লোকের মন কেমনভাবে বদলাতে দেখেছি, কেমনভাবে তারা ভুলভ্রান্তির মধ্য দিয়ে নিজেদের অধিকার বুঝে নিচ্ছে, তাই নিয়ে একখান উপন্যাস লিখব।' অন্যত্র বলেছেন—'আমার কাজ ছিল শুধু পুরোন মহাকাব্যের ফ্রেমে ঢোঁড়াইরামকে বাঁধানো'। এই দুটোর কোনটাই পুরোপুরি হয়নি, লেখক নিজেও স্বীকার করেছেন—শেষ পর্যন্ত ঢোঁড়াইয়ের চরিত্র যা দাঁড়ালো তাতে আমি মোটেই তৃপ্তি পাইনি।' আমাদের মনে হয়, লেখক নিজেও এই তৃপ্তি না পাওয়ার কারণ ধরতে পারেননি। আসলে, শ্রেণীবিভক্ত ধনতান্ত্রিক সমাজের সংকটে আবর্তিত শিল্পীসত্তা যদি বিষয়ী (subject)-কে বিষয় (objejt) থেকে বিচ্ছিন্ন রেখেছেন, এবং বিষয়কে বিষয়ী থেকে আলাদা করতেও পারেননি; এ অবস্থায় যেটার দরকার ছিল, তাতেও তিনি অসমর্থ, তা হল মুনসী প্রেমচন্দের মত, মানিক বন্দোপাধ্যায়ের মত মার্কসবাদী বিপ্লবী মানসিকতায় নিজের দর্শন ও শিল্পভাবনাকে ভেঙে ও ঢেলে নতুন করে সাজানোর উত্তরণ।

সতীনাথ উত্তরপ্রদেশের সমকালের সাহিত্যিক প্রেমচন্দের মতই বুঝেছিলেন 'কংগ্রেস জনতার প্রতি সহানুভূতিশীল নয়।' প্রেমচন্দ প্রথম জীবনে গান্ধী-বাদী আদর্শে বিশ্বাসী থেকেই প্রথম পর্বের রচনায় রেনেসাঁ-চেতনা বা ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের মানবতা ফুটিয়েছেন, পরের স্তরে এসে অর্থাৎ গান্ধীবাদের সঙ্গে দ্বন্দ্বের স্তরে জনজীবনের (প্রধানত কৃষকদের) বাস্তব দুর্দশার ও মহাজনী শোষণের বাস্তব ছবি বা ক্রিটিক্যাল বাস্তবতা সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে তুলে ধরলেন, এবং শেষপর্বের 'গোদান' ও 'কর্মভূমি'তে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার দিকে বাঁক নিয়েছেন এবং বলশেভিকবাদ ও সমাজতন্ত্রের প্রতি তাঁর আকর্ষণ অনুভবের কারণেই তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে সমাজ-বাস্তবতার বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ভাঁজ ও গতিশীলতা ধরা সম্ভব হয়েছিল।

সতীনাথ যেমন অস্তিত্ববাদী জীবনবোধের দিকটাকে প্রাধান্য দিয়ে সমাজ বাস্তবতার দ্বন্দ্বের মধ্যে কিছুটা ছটফট করেও শেষ পর্যন্ত কুলায় প্রত্যাবর্তন করলেন, মানিক বন্দোপাধ্যায়ের ঠিক তেমনটি হয়নি, যদিও তাঁর সাহিত্যজীবনও সুরু হয়েছিল ফ্রয়েডীয় বুর্জোয়া-বাস্তবতার অন্তর্মুখী জটিলতার রহস্যকে সার করে। বুর্জোয়া ধনতন্ত্রসৃষ্ট সামাজিক ক্লেদ, গ্লানি, অস্তিত্বের সংকট ও মানবতার অসম্মান—এই সব কিছুর পচা পানাডোবা থেকে মুক্তির পথ মার্কস-বাদী মতাদর্শে ব্যক্তি ও সমাজের দ্বন্দ্বগুলিকে বোঝা এবং কমিউনিষ্ট

আন্দোলনের বাঁকে বাঁকে গণচেতনার বিকাশধারায় নিজের এবং সমাজের ইতিবাচক পরিবর্তনগুলিকে উপলব্ধি করা, শিল্প-সাহিত্যের প্রকৃত সৌন্দর্য ও জনকল্যাণী ভূমিকা বা সাহিতত্ব এখানেই—এই দৃষ্টিভঙ্গির উত্তরণে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মহান কথাশিল্পী। প্লেটো-আরিষ্টলের যুগে দাস-প্রথাকে প্রাকৃতিক বা ঐশ্বরিক ঘটনা বলে দর্শনায়িত করা হয়েছিল, আধুনিক বুর্জোয়া ধনতন্ত্রও মানুষকে (মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী থেকে শ্রমিক-কৃষক সবাইকে) 'ক্রীতদাস' বানিয়ে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সাফাই রচনায় তৎপর। লেনিন এ সম্পর্কে বলেছেন (সংকলিত রচনাবলী, মস্কো, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৫৩)—

"A slave who is not aware of his slavery and exists in a condition of mute obedience is just a slave, A slave who has reconciled himself to his position and finds his slavish existence enjoyable is a to-day and a hanger-on. But a slave who is unaware of his position and has arisen against it is a revolutionary."

প্রথম দিকের 'জাগরী' এবং শেষ দিকের 'সংকট', 'দিকভ্রান্ত', ও 'অচীন-পুরের' উপন্যাসের মাঝে 'ঢোঁড়াই চরিত মানস'-এর তাৎমা-ঢোঁড়াই চরিত্রে আদিম সামাজিক মনস্তত্ত্বের স্বতঃস্ফূর্ততার ঝোঁক থাকলেও, সে সামগ্রিকভাবে সামন্তবাদী ও পুঁজিবাদী সমাজ-পরিস্থিতির দ্বন্দ্ব এবং তার বীভৎসা থেকে বেরিয়ে আসার ঐতিহাসিক বাস্তবতার প্রতিনিধি টাইপ-চরিত্র হবার দাবী রাখে। এই বিচারে ঢোঁড়াই প্রেমচন্দের 'হোরী' (গোদান) এবং লুসুনের আ-কিউ (আ-কিউ-এর সত্যি গল্প)-এর প্রায় সমগোত্রীয় চরিত্র।

একটা ভয়ংকর করুণ অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার গর্ভ থেকে ঢোঁড়াইয়ের যে জীবনযাত্রার সুরু হয়েছে, তা সমগ্র তাৎমাটুলির গরিব অন্ত্যজ শ্রেণীর জনগণেরই বাস্তবসত্য। তার সদ্যবিধবা মা শুধু একটু খাওয়ার ব্যবস্থার জন্যেই গোঁসাইথানে শিশু-ঢোঁড়াইকে ফেলে রেখে বাবুলাল চাপরাসিকে 'চুমৌনা' করল। সে বৌকাবাওয়ার আশ্রয়ে বড় হল এবং জানল বুধনি-বাবুলালের জীবনে তার যায়গা নেই—এই মিশ্র-অনুভূতি থেকেই ভিক্ষে করতে ঠিকমত পারল না। তার স্বভাব অন্যান্য তাৎমাদের তুলনায় অনেকটা মুক্ত বলে চারপাশের আর্থ-সামাজিক চাপে যখন তারা থেঁতলে যাচ্ছে তখন ঢোঁড়াই তাদের নেতৃত্ব দিতে পারে। সতীনাথ 'ছকবাঁধা বামপন্থী' কাহিনীর মত ঢোঁড়াই-কে রামচরিত্র করেননি, যদিও রামায়ণের

লোক-সংস্কারের ধার ঘেঁষে ঢোঁড়াই-কে 'রামায়ণজী' করেছেন। ঢোঁড়াই দোষে ও দুর্বলতায় স্বজাতি-সম্ভূত। তবে ঢোঁড়াই কেবল নিজের জাতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বিসকন্ধায় গিয়ে কোয়েরি চাষিদের সঙ্গে সাঁওতালটুলির মুনিশ্‌জনদের সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তোলে। ঢোঁড়াইয়ের যোগাযোগে ও উৎসাহে সব জাতের বেড়া ভেঙে যখন তাৎমাটুলি, বিসকান্দা, জিরানিয়া, পিথো সাঁওতাল, তিলফুমাঝি, মাস্টর সায়েব জোট বেঁধে মহাৎমাজীকে চিঠিতে জানাল—সরকার, হাকিম, জমিদার, পুলিশ, সার্কিল ম্যানিজর গিধর কোয়েরি ও বাবুসাহেবরা তাদের বিরুদ্ধে, তখন রাজনৈতিক উপন্যাসের শ্রেণী-সংঘাতের রেশটাই তো বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। তাছাড়া আরও একটা তথ্য এবং রাজনৈতিক বাস্তবতা বা সত্য এই উপন্যাসের বিশ্লেষণে বেরিয়ে আসে।

ক্রীপ্‌স মিশন ব্যর্থ হবার পর ১৯৪২ সালে ব্রিটিশ সরকারকে হুমকি দেবার জন্যই, অহিংস আন্দোলনের প্রস্তুতির অভাব সত্ত্বেও, স্বাধীনতা আন্দোলনের আর একটা ঢেউ তোলার ডাক দেওয়া হয়েছিল—এ কথা নেহেরুও তাঁর Discovery of India-তে স্বীকার করেছেন। তবু 'আগষ্ট আন্দোলন' যে এত দুর্বার ও জনপ্রিয় হল, তার পটভূমিকায় রয়েছে সাধারণ মেহনতি মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অভ্যুত্থানের অগ্নিগর্ভ আবেগ, যার পরিচয় ও প্রতিফলন রয়েছে এই উপন্যাসে এবং যা কথাশিল্পে প্রথম ও অকৃত্রিম। তাছাড়া জনগণের বিদ্রোহীসত্তার শরিক না হবার কারণে, উঁচু সারির নেতাদের দ্বিধা ও দুর্বলতা সম্পর্কে সতীনাথের মনে যে ক্ষোভ জমা হয়েছিল, বলা যায় এ উপন্যাসে তারই বাস্তব ছবি—ঢোঁড়াইয়ের আজাদসস্তায় যোগ দেওয়ার মধ্যে।

এ উপন্যাসের রাজনৈতিক বাস্তবতার আরও একটা বৈশিষ্ট্য নজর এড়ায় না। এ দেশের গ্রাম-সমাজে গণতান্ত্রিক বিপ্লব (কৃষকের হাতে জমি যাওয়া ও ব্যাপক শিল্পায়নের মাধ্যমে) সম্পূর্ণ না হবার কারণে আদিবাসী লোকসমাজে যুগসঞ্চিত ধর্মীয় ট্রাডিশন শিকড়সঞ্চারী। এই কারণেই সতীনাথ 'রামচরিত মানস'-এর কাঠামোয় ঢোঁড়াই-কাহিনীকে বাঁধতে চেয়েছেন এবং এই অর্থে সঠিকভাবেই বলেছেন, দেশের জনজীবনে 'গভীর ধর্মপ্রবণতা' রয়েছে। তবু তিনি লক্ষ্য করেছেন, এক-উচ্চবর্ণের চাপিয়ে দেওয়া প্রথা আদিবাসী তাৎমাদের মধ্যেও চালু রয়েছে—ওরা পৈতা নিতে চায়। অর্থাৎ শাসকশ্রেণীর ধর্ম-সংস্কৃতি শোষিত শ্রমজীবী শ্রেণীর মধ্যেও চালান করা হয়। দুই—তাৎমা ধাঙড়-জিরানিয়া ও সাঁওতালরা ধর্মীয় ভাষাতেই শোষণ-অত্যাচারের কথা

বলে। বলাবাহুল্য, এটা কোন উচ্চবর্ণীয় ধর্মীয় ভণ্ডামি নয়, লোকধর্মের সমাজ-বাস্তবতা। প্রশ্ন হতে পারে, এই উপন্যাসে ৪২-এর ব্যর্থতা দেখিয়ে সতীনাথ তো গণ-আন্দোলনকেও সঠিক ঐতিহাসিক নিরিখে দেখতে ব্যর্থ হয়েছেন, তাহলে এটা রাজনৈতিক উপন্যাস হল কি করে? এর জবাবে বলা দরকার, এক—শিবনাথ, দেবু পণ্ডিত ও করালী (তারাশঙ্কর) এবং শশী-ডাক্তার ও কুবের (মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়)-এর ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও বিদ্রোহের তুলনায় ঢোঁড়াই অনেক বেশী সামাজিক ও রাজনৈতিক শ্রেণী-সংঘাতে আন্দোলিত এবং অগ্রসরমান। ব্যক্তি-সম্পর্কের মোহে (রামিয়ার কথা ভেবে) সে তাৎমাটুলিতে একবার ফিরেছিল, কিন্তু থাকেনি। 'পাক্কি'-তে এবং গরুর গাড়ি চালিয়ে মুক্ত মেজাজে সে পুরোন সামন্ততান্ত্রিক খড়ির গণ্ডি ভেঙে বেরিয়ে এসেছে বৃহত্তর জনতার মাঝে। দুই—ঢোঁড়াইয়ের এই বিবর্তন ৪২-এর সাময়িক উত্তেজনার চেয়েও গভীর ও ব্যাপক। তাছাড়া এটা দৈনন্দিনতার সাংবাদিকসুলভ বাস্তবতা নয়। এরই নন্দনতত্ত্বের নাম সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা, যার রেশ রয়েছে এই উপন্যাসে এবং তার পূর্ণ স্ফুটন যে নেই তার কারণ সমকালের গণ-আন্দোলনের অপূর্ণতা ও সীমাবদ্ধতার মধ্যেই নিহিত। সতীনাথ নিজেই বলেছেন—'উত্তর ঢোঁড়াই-চরিত' লেখার ইচ্ছে রইল। বাস্তবিক এই উপন্যাস পড়ে স্বতই মনে হয়, ঢোঁড়াই-এর কাহিনী যেন এখানেই শেষ নয়।

চিত্রগুপ্তের ফাইল:

রাজনৈতিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সতীনাথের মনে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল তা ভরে যেতে পারত যদি ঢোঁড়াই-এর তৃতীয় চরণ বা উত্তর ঢোঁড়াই লেখার জন্য তাৎমা-সাঁওতালদের লোকসমাজ ও তাদের জীবন-সংগ্রামের বাস্তবতার আরও গভীরে তাঁর শিল্পী-মানসকে যুক্ত রাখতে পারতেন, অথবা কংগ্রেস ছাড়ার ফাঁক ভরাতে বামপন্থী মার্কবাদী মতাদর্শের রাজনীতির দিকে নিজেকে পরিশুদ্ধ এবং উজ্জ্বলতর করতে পারতেন। কিন্তু সতীনাথের জীবনে এর কোনটাই হয়নি। ১৯৪৯ সালে লণ্ডন-প্যারিস-জার্মানি পাড়ি দেন এবং পরের বছরই 'জাগরী'র জন্য রবীন্দ্র-পুরস্কার পেলেন। এরপর তার জীবনে রাজনীতি ও গণজীবন বিচ্ছিন্নতার যে সাহিত্য-পর্ব সুরু হয়েছে তাতে ক্রমশই কথাশিল্পের বস্তুনিষ্ঠ ঘটনাশ্রয়ী চরিত্রের বিকাশ অনুপস্থিত হয়েছে এবং অভিজ্ঞতা বা তাঁর ক্ষেত্রে চেতনা ও স্মৃতির তরঙ্গ প্রাধান্য পেয়েছে। এই

আত্মগত অন্তর্মুখীনতার সূচনা হয়েছিল 'জাগরী'তে এবং মাঝের ঢোঁড়াই-চরিতে প্রবণতা বাস্তব-পরিবেশ ও ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহের দাবিতে বেশ কিছুটা সরে গেলেও 'চিত্রগুপ্তের ফাইল' উপন্যাসে আবার সেটা ভর করেছে।

এই উপন্যাসে লেখক এক ধরণের নিয়তিবাদে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছেন। ঢোঁড়াই-কে রামায়ণের মোড়কে রেখেও আঙ্গিকের প্রভাব থেকে লোকসমাজ ও তাদের সংস্কৃতির বাস্তবতাকে যথাসম্ভব রক্ষা করেছেন, চরিত্রের বস্তুনিষ্ঠ সংঘাত ও বিবর্তনকে নিষ্ঠিত শিল্পায়নে মূর্ত করতে চেষ্টা করেছেন. কিন্তু চিত্রগুপ্তের রূপকল্পে ছকা এবং নিয়তিবাদের দর্শনে আচ্ছন্ন রাখা শ্রমিক-মালিক-সম্পর্ক-সংঘাত এবং ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী শিউচন্দ্রিকা এ অভিমন্যু চরিত্র চূড়ান্ত বিচারে রাজনৈতিক উপন্যাস হতে পারেনি। শ্রেণী সম্পর্কে সচেতনতা ও শ্রেণী-সংঘাত সম্পর্কে শোষক-শোষিতের প্রতি বৈজ্ঞানিক মনোভাব স্পষ্ট না হলে, সবচেয়ে বড় কথা শ্রমজীবী মানুষের বিপ্লবী মতাদর্শ সম্পর্কে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি অর্জিত না হলে কেবলমাত্র এইসব ঘটনা ও উপাদানের সমাবেশেই রাজনৈতিক সাহিত্য হয় না। 'জাগরী'তে যেমন ব্যক্তিগত চৈতন্যতরঙ্গ রাজনৈতিক ইতিহাসের বাস্তবতা ও বিবর্তনের উপর আধিপত্য করেছে, এই উপন্যাসে তেমনি লেখকের নৈরাশ্যপীড়িত ভাবনায় ভর করা নিয়তিবাদ ও ব্যক্তিগত প্রেম-ভালবাসা শ্রেণী-সংগ্রামের রাজনীতি ও তার পটভূমিকায় বিবর্তনকামী সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার উপরে স্থান পেয়েছে।

শ্রমিক নেতা শিউচন্দ্রিকা ভাবছে : "চিতার আলোতে মনে হচ্ছে যে একটা ফাইলের পাতার পর পাতা খুলে যাচ্ছে। চোখের সামনে ফুটে উঠছে এক-একটি দলিল। জীবনের ছক কি আগে থেকে কাটা থাকে সকলেরই? চিত্রগুপ্তের মহাফেজখানায় কি বাঁচবার দাবির ফাইল রাখা থাকে সকলেরই?" এই যে নিয়তির লীলা, এই বিশ্বাস কি সতীনাথের? নাকি শিউচন্দ্রিকার? আসলে সতীনাথের মানসভূমির খুবই কাছে রয়েছে কংগ্রেস সোশালিস্ট নিয়ন্ত্রিত ট্রেড ইউনিয়ন নেতা শিউচন্দ্রিকা। তবু প্রশ্ন জাগে, আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষিত সতীনাথ এইভাবে নিয়তিবাদের সংস্কারে দুর্বল থাকলেন কিভাবে? পরবর্তী 'সংকট' উপন্যাসেও এই সুর ধ্বনিত। অথচ বাস্তব ঘটনার পরিবর্তনে বিশ্বাস থেকেই তিনি রাজনীতি করতে নেমেছিলেন, দেশের স্বাধীনতার ডাকই তাঁকে প্রত্যক্ষ জাতীয় আন্দোলনে হাতছানি দিয়েছিল। শেষে কংগ্রেসী রাজনীতির ধনিক-ঘেঁষা ও আপোষকামী চরিত্রে

তাঁর মোহভঙ্গ হল। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। এরপর আর শ্রমজীবী জনগণের বিপ্লবী রাজনীতির দিকে পা বাড়াতে না পেরে মধ্যবিত্ততার নৈরাশ্যে মনন ও অনুভূতির জাল বুনে বাকী সাহিত্য-জীবনকে নিযুক্ত রাখলেন।

তবু 'চিত্রগুপ্তের ফাইল' উপন্যাস এবং 'আণ্টাবাংলা' প্রভৃতি কয়েকটি গল্পে সতীনাথ শ্রমিক ও কৃষক জীবনের শ্রেণী-সংঘাতের সম্ভাবনাময় কিছু উপাদান রেখেছেন এবং তার উপস্থাপনাতেও রাজনৈতিক উপন্যাসের চরিত্র অনেকটা ফুটেছে। কিন্তু সতীনাথের শিল্পীসত্তার সমস্যা হল—object-এর ক্ষেত্রে তিনি বস্তুবাদী পর্যবেক্ষক, এমনকি কখনো-কখনো দক্ষ কারিগর, কিন্তু subject-এর ক্ষেত্রে তিনি মূলত ভাববাদী, যার প্রক্ষেপনে শ্রমিক ও কৃষক চরিত্রে বাস্তবতায় অন্তর্মুখী মধ্যবিত্ততায় ভাবাবেগ এবং ঘটনা ও প্লটের মধ্যে আত্মগত উপাদানের প্রাধান্য। 'চিত্রগুপ্তের ফাইল' বাংলা সাহিত্যে গোর্কির 'মা' হতে পারত (সতীনাথ 'মা' পড়েননি ভাবাও যায় না), যদি শ্রমিক আন্দোলনের নিষ্ঠ কর্মী শিউচন্দ্রিকার মধ্যে নিজের শূন্যতা বা ফাঁকিটাকে নিক্ষেপ না করতেন, শিউচন্দ্রিকা যদি সংগ্রামী চরিত্র হিসাবে ব্যর্থতার মধ্যেও একটা মহত্ব অর্জন করত, যদি ব্যক্তিগত প্রেম-ভালবাসায় নিমগ্ন অভিমনু্য-মীনাকুমারীর ব্যক্তিগত ট্রাজিডির চেয়ে বলীরামপুর জুট মিল-'এর শ্রেণী সংঘাতের রাজনীতি গৌরবান্বিত হত। এই রাজনৈতিক বা সংগ্রামী গৌরবকে যে লাল সূর্য ওঠা বা লাল পতাকা হাতে বিজয়-মিছিল দেখিয়েই বোঝাতে হবে, নন্দনতত্ত্বে এমন কোন মাথার দিব্যি নেই।

'জাগরী'তে যেমন কমিউনিস্ট নীলুর চেয়ে কংগ্রেসী বিলুর প্রতি এবং তাঁর আত্মগত সমস্যা ও যন্ত্রণার প্রতি লেখক বেশী সহানুভূতি দেখালেন, এই উপন্যাসেও তেমনি দীর্ঘদিনের একনিষ্ঠ ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী শিউ-চন্দ্রিকার চেয়ে রাজনীতি বা সংগ্রামী সংগঠন থেকে বিচ্যুত (ব্যক্তিগত প্রেমের কারণে) অভিমনু্যর প্রতি ফোকাস পয়েণ্ট যেন বেশী। তাছাড়া লেখক শিউ-চন্দ্রিকা চরিত্রকে ম্লান ও অপ্রধান করার জন্যই (উজ্জ্বল ও প্রধান হবার সম্ভাবনা সত্ত্বেও) বন্ধু অভিমনু্যকে হারানোতে বা রাজনীতি বা শ্রমিক আন্দোলন নষ্ট হবার কারণে—কোন ক্ষেত্রেই শিউচন্দ্রিকার কোন দ্বন্দ্ব নেই। এই দ্বন্দ্ব না থাকলে উত্তরণের মহত্ব ফুটবে কিসে?

এই উপন্যাসের কাঠামো রাজনৈতিক বা শ্রমিক-মালিক সংঘাতের পটভূমি থেকেও যে প্রকৃত অর্থে বাস্তবসত্য থেকে সরে গেল, তার মূল কারণ লেখকের মানসিক গঠনে ভাববাদের আধিপত্য এবং সেই কারণেই বামপন্থী মার্কসবাদী

রাজনীতির প্রতি অবজ্ঞা ও অনীহা। 'ভাবুকের দৃষ্টি' ও 'কবির মন' সম্পন্ন অভিমন্যু সম্পর্কে উচ্চ ধারণা জাগানোর জন্য এক যায়গায় লেখক বর্ণনা দিচ্ছেন—'অভিমন্যুকে মজুরেরা যত আপন বলে ভাবতে পারে, শিউচন্দ্রিকার বেলায় তা পারে না। শিউচন্দ্রিকা মজুরদের অন্তরের থেকে ভালবাসে, তাদের জন্য প্রাণ দিতে পারে, কিন্তু একটা মজুরের সঙ্গে গলা-জড়াজড়ি করে নিছক মনের আনন্দে রাস্তা দিয়ে গান গেয়ে যাক তো! সে পারে অভিমন্যু।' অথচ এই অভিমন্যুর উপর যখন শ্রমিক আন্দোলনের চাল-চলন নির্ভরশীল, তখন সে তার ব্যক্তিগত প্রেমের দাম দিল শ্রমিকদের রুটি-রুজির সংগ্রাম ও শ্রেণী-সম্মানের বিনিময়ে। শুধু তাই নয়, অভিমন্যুর মৃত্যুকে ট্রাজিক হিরোর গৌরবে মণ্ডিত করলেন লেখক। অর্থাৎ যেখানে বিচ্যুতি ধিক্কৃত হবার কথা, সেখানে তা পাঠকের সহানুভূতি আকর্ষণের দিকে নিয়ে গেলেন এবং এটা করার জন্যই আর এক পরীক্ষিত শ্রমিকনেতাকে ম্লান ও যান্ত্রিক করে আঁকলেন।

এই বিশ্লেষণ থেকে এটা মনে করার কারণ নেই যে, সতীনাথের জীবন ও সাহিত্যের মধ্যে সততা ও নিষ্ঠার অভাব ছিল। তিনি যে মানিক বন্দো-পাধ্যায়ের মত আর এগোতে পারেননি, সেটা তাঁর নির্দোষ অক্ষমতা; স্থূল প্রবণতা নয়। সৎ ও নিস্ঠাবান শিল্পদৃষ্টি ছিল বলেই তিনি বলেছেন: 'শিরনিয়া গ্রামে আজাদী পেয়েছে কেবল অযোধিয়া চৌধুরী। সরকারের মাথায় এখন রাজ্যের ঝঞ্ঝাটের বোঝা। পড়ে-পাওয়া আজাদীর নানা ফ্যাকড়া।' সতীনাথের সততা ও প্রতিবাদী-মানসের পরিচয় স্বাধীনতার ফাঁকি বুঝে ১৯৪৮ সালে কংগ্রেস ত্যাগ। যে কংগ্রেস 'সংগ্রামী' দল থেকে শাসকদল হল, যে সময়ে দলে দলে কংগ্রেসের চারপাশে এসে ভন্-ভন্ করছে সেই সময়ে সতীনাথ কংগ্রেস ছাড়লেন। কারণ তিনি বুঝেছিলেন—এ আজাদী কেবল ঐ অযোধিয়া চৌধুরীদের, ধনী জমিদার-ব্যবসায়ীদের। অবশ্য বুর্জোয়া মানবতার সীমাবদ্ধতার কারণে তিনি এই আজাদীকে ওদের 'ফাঁসির আগে মিষ্টি খাওয়াব'-এর সঙ্গে তুলনা করেছেন। এটা ভুল হলেও, তিনি তো চেয়েছিলেন রক্তচোষাদের ফাঁসি হোক!

লোকসঙ্গীত ও গণসঙ্গীত

॥ এক ॥

শ্রমের আর্তনাদ থেকে সঙ্গীতের উৎপত্তি। এই আর্তনাদ হল যন্ত্রণা, বিজয়, শারীরিক শক্তি সঞ্চয়ের জন্য শ্বাসক্রিয়া সবই। মানুষ তার আদিম স্তরে শ্রম করেছে প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামী সম্পর্কে, তাকে দখল করে নিজেদের বাঁচার প্রয়োজনে সচেতনভাবে তাকে ব্যবহার করার জন্যই তার উৎপাদনশীল শ্রম। এই কাজ একা হয় না। তাই শ্রমের মধ্য দিয়ে সে যেমন প্রকৃতির সম্পর্কে এসেছে, তেমনি তার প্রতিবেশী মানুষের সহযোগিতার সম্পর্কেও এসেছে।

এবার যা দাঁড়াল তা হল, সঙ্গীতের আদি উৎসে শ্রম-প্রক্রিয়া এবং মানুষের যৌথ সহযোগিতার ছন্দ কাজ করেছে। আরও একটি কথা। শ্রম-প্রক্রিয়া আগে, ভাষা এসেছে তারই ফলশ্রুতিতে। কাজেই সঙ্গীতে ভাষা এসেছে উন্নততর স্তরে। গোড়াতে ছিল শরীর সঞ্চালনজনিত শ্বাস-প্রশ্বাসের ছন্দ, আঙ্গিক অভিনয় বা নৃত্য, অর্থাৎ নৃত্য অভিনয় ও আর্তনাদ বা সুর মিলেই হয়েছে সঙ্গীত। ভারতীয় মার্গ সঙ্গীতে যে 'স্বর' বা 'নাদব্রহ্ম', তার উৎস সন্ধানে এই শ্রমের আর্তনাদেই যেতে হবে।

জর্জ টমসন তাঁর 'হিউম্যান এসেন্স' গ্রন্থে বলছেন—

"It is essentially nothing more than a reflex action of the vocal organs accompanying the other bodilily movements, but charged with the conscious purpose of synchronising the action."

ইংরেজ কোম্পানী আমলের সুরুতে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময়ে গ্রামীন অর্থনীতির নিদারুণ দুর্দশায় পীড়িত মাঝির কণ্ঠে যখন করুণ আর্তি ফোটে—'মনমাঝি তোর বৈঠা নেরে, আমি আর বাইতে পারলাম না', তখন গানে ব্যর্থ শ্রমের যন্ত্রণা, ক্ষুধার্ত শরীরের জ্বালা, সামন্ততান্ত্রিক মহাজনী ও বণিকী শোষণের পটভূমি, কণ্ঠের ভাষা, হাতিয়ার বা বৈঠা, নদী-প্রকৃতি ও সামাজিক মহাজনী সম্পর্ক—এ সবই কাজ করেছে। অথচ সঙ্গীতের যে উৎসের কথা বললাম, তখন ভাষাও ছিল না, হাতিয়ারও (কিছু প্রস্তরখণ্ড ছাড়া) ছিল না। ছিল শুধু তার শরীর, প্রকৃতি ও অন্য মানুষের শারীরিক সহযোগিতার সম্পর্ক। এই নিয়েই মানবসঙ্গীতের জন্ম।

'লোক' বলতে কি বুঝবো ?

লোকসংস্কৃতির একটা অঙ্গ লোকসঙ্গীত। কাজেই এই সংস্কৃতি ও সঙ্গীতের 'লোক' কারা ? ইংরাজী 'ফোক' অর্থেই আমরা 'লোক' বুঝি। 'ফোক' শব্দের আভিধানিক অর্থ 'একাধিক' বা 'সমষ্টি'। এ ছাড়া কেউ বলেন 'গ্রামের অধিবাসী', কেউ বলেন 'অনুন্নত সমাজের মানুষ'। এর মধ্যে বর্বর, দাস, সামন্ত ও ধনতান্ত্রিক সমাজের অনুন্নত মানুষও 'লোক'। এই রকম 'গোটা জাতি', 'একটা জাতির অনুন্নত নিচুতলার সাধারণ মানুষ', 'নিরক্ষর অজ্ঞ মানুষ' ইত্যাদি ২১টি সংজ্ঞা আমাদের হাতে রয়েছে।

এবার দেখা যাক, 'লোক' বলতে যদি প্রাক্-ধনতন্ত্রী সামন্ততান্ত্রিক গ্রামীন সমাজের সাধারণ মানুষকে ধরি, তবে জমিদার-মহাজন শ্রেণীর দ্বারা শোষিত শ্রেণীকেই লোক-সমাজ বলতে হয়। কিন্তু সামন্ত-শোষণের মধ্যে অপেক্ষাকৃত উন্নত মার্জিত ব্রাহ্মণ বর্ণের মানুষও পড়ে। তাদের সংস্কৃতিও কি লোক-সংস্কৃতি হবে ? প্রাক্-ধনতন্ত্রী গ্রামীণ সমাজে হিন্দুদের মধ্যে বর্ণভেদ রয়েছে, মুসলমান ও তাদের ধর্মীয় উঁচু-নিচু ভেদ রয়েছে, বৌদ্ধ, খৃস্চান, সাঁওতাল, কোল ইত্যাদি নানা সম্প্রদায় বর্ণ ও জাতি-উপজাতির নিজস্ব লোকধর্মসম্ভূত সংস্কৃতির সুপ্রাচীন ঐতিহ্য রয়েছে। কাজেই নির্দিষ্টভাবে 'লোক' বলতে 'অনুন্নত' ও 'নিরক্ষর অজ্ঞ' মানুষ ধরলে অনেক ক্ষেত্রেই হোঁচট খেতে হবে। 'লোক' বলতে আজও গ্রামে 'জন' বা মুনিশ-মাহিন্দার বোঝায়, অর্থাৎ শ্রমজীবী গরিব শ্রেণী। কেবল এদের সঙ্গীতই যদি লোকসঙ্গীত হয়, তবে মুকুন্দরামের, রামেশ্বর ভট্টাচার্যের, লালনের কিংবা রামপ্রসাদের গান কি লোকসঙ্গীতের পর্যায়ে পড়ে না ? তবে কেরলের রাম-লীলা, বাংলার রাম-পাঁচালিকে কি বলবো ? এইজন্যই প্রখ্যাত মার্কসবাদী নন্দনতাত্ত্বিক ই. এম. এস নাম্বুদিরিপাদ তাঁর 'অন পিপল্‌স কালচার' প্রবন্ধে লোকসংস্কৃতিকে শাসক ও শোষিত শ্রেণীর মিশ্র-সংস্কৃতি বা 'এ্যাবাভ ক্লাশেস' বলেছেন। এতে বস্তুবাদ ও ভাববাদের সাঙ্গীকরণ হয়েছে। রামায়ণ-মহাভারতের যে রূপ আমরা পাই তা হিন্দু উচ্চবর্ণের মধ্যেই প্রচলিত। এই কাব্য অ-হিন্দু জনসমাজে, নিম্নবর্ণের বা আদিবাসী অনুন্নত জনসমাজে আদৌ গৃহীত হয়নি। এই কথা মুকুন্দরাম, রামপ্রসাদ সম্পর্কেও খাটে। অথচ এগুলি লোকসাহিত্য বলেই কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য সূচীতে রয়েছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত (১৯৭৫) জ্যোতির্ময় ঘোষ সম্পাদিত "বাংলার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য" সংকলন গ্রন্থের

লোক-সংস্কৃতি বিষয়ক প্রবন্ধে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পূর্ণ ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে (স্বভাবতই স্ববিরোধী ও খণ্ডিত) লোকজীবন ও তার সংস্কৃতির সংজ্ঞা আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে, ১. সাধারণ মানুষের সাধনা শ্রেষ্ঠ সাধনা নয়, অর্থাৎ লোক-সংস্কৃতি মানবজীবনের সর্বনিম্ন সাধনার রূপায়ণ এবং সংস্কৃতি সর্বোচ্চ সাধনা, যা ব্যক্তি-প্রতিভার দান। ২. লোক-সংস্কৃতি জন্মগত ও স্বতঃস্ফূর্ত। ৩. লোক-সংস্কৃতি গ্রামীণ সংস্কৃতি এবং সংস্কৃতি ব্যক্তি-সাধনাসাপেক্ষ ও নগরকেন্দ্রীক। ৪. 'উচ্চতর' সংস্কৃতির কোন বিকাশ-প্রক্রিয়া নেই। ৫. লোক-সংস্কৃতি সংহত সমাজ-মানস প্রসূত ও বিবর্তনশীল।

বোঝা যায়, এই ধরণের বিশ্ববিদ্যালয়ী পণ্ডিতদের 'সংস্কৃতি' সম্পর্কিত আলোচনা কত অসম্পূর্ণ ও লঘু।

॥ দুই ॥

সংস্কৃতি সমাজের বস্তুগত উৎপাদনের উপরিথাক। মানুষ বাঁচার জন্য উৎপাদন করেছে এবং এই উৎপাদনশীল শ্রমের প্রয়োজনেই সামাজিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। এই শ্রম, বস্তুপ্রকৃতি ও সামাজিক সম্পর্ক থেকেই যে জীবন রীতি, মনন ও অনুভবের নব নব উন্মেষ ও বিকাশ-প্রক্রিয়া তাই-ই মানুষের সংস্কৃতি। এই আদিম মানবসমাজের স্তর পেরিয়ে শ্রমবিভাগ ও শ্রেণীভেদের কারণে কায়িক ও মানসিক শ্রম আলাদা হলে লোকায়ত দর্শনে রইল বস্তুবাদ, আর শাসক-শ্রেণীর জীবন দর্শনের দিকে গেল অধ্যাত্মবাদ বা ভাববাদ। প্রশ্ন হল প্রাক-ধনতন্ত্রী লোক-সমাজ কি তার বিশুদ্ধ লোকায়ত ঐতিহ্য রাখতে পেরেছে? আবার 'অফিসিয়াল' উচ্চ শ্রেণীর দর্শন কি বিশুদ্ধ ভাববাদে বা অধ্যাত্মবাদে 'অস্পৃশ্য' থেকে জন-সংযোগ করতে পেরেছে? আদৌ তা নয়। লোক-সমাজ বলতে তো আদিম সাম্যবাদী সমাজের উপাদান, দাস-সমাজের আচার-প্রথা ও সামন্ততান্ত্রিক সমাজের মিশ্র সাংস্কৃতিক উপাদানকেই বুঝবো। আদিতে লোকায়ত দর্শন-সংস্কৃতি ও সংস্কৃতি অভিন্ন ছিল। বস্তুগত উৎপাদনের উপায়, পদ্ধতি ও সম্পর্ক পরিবর্তনের সঙ্গে শ্রেণী-সমাজের স্থিতাবস্থা রক্ষার স্বার্থেই অ-লোকায়ত সংস্কৃতি ও তার মূল্যবোধ গোটা সমাজ-মানসকে আচ্ছন্ন করেছে। প্রাক্-ধনতন্ত্রী লোক-সমাজে এই ভাববাদী আচ্ছন্নতা অনেকটা ঘনীভূত ও অনড়

থাকার কারণ সামন্ততান্ত্রিক শোষণ আজকের মত নগ্ন, তীব্র ও স্পষ্ট নয়। ধর্মীয় ভাববাদের বাষ্প, বর্ণাশ্রমের ছক এবং উৎপাদনের সঙ্গে কৃষক-প্রজার অনেকটা বস্তুগত সম্পর্ক এবং গ্রাম সমাজের স্বনির্ভরতা—এই সবই প্রাক্-ধনতন্ত্রী সমাজের শ্রেণী-সংগ্রামকে স্পষ্ট ও সচেতন হতে দেয়নি। স্মরণ রাখা দরকার, আদি গ্রীক দর্শনের প্রবক্তা ডেমোক্রিটাস, এপিকিউরাস ও হেরাক্লিটাসের অধিকতর বস্তুবাদী ঐতিহ্যকে প্লেটো-আরিস্টটল ও পরবর্তী কালের ভাববাদী খ্রীষ্টিয় ধর্ম-দর্শনের ঘনীভূত বাষ্পের নিচে কবর দেওয়া হয়েছে সমগ্র মধ্যযুগ জুড়ে।

সিডনি ফিঙ্কেলস্টাইন তাঁর 'হাউ মিউজিক এক্সপ্রেসেস আইডিয়াজ' গ্রন্থে বলছেন—

"Throughout the middle ages folk music was called an arm of satan who in turn was pictured as enticing people to perdition with a fiddle in his hands".

এই 'শয়তান' তার অপূর্ব সুরসম্পদ নিয়ে কেবলই যে আচার-প্রথার মানবিকীকরণে মোচড় দিয়েছিল তা নয়, রাজনীতি ও শ্রেণী-সংগ্রামকেও উশ্‌কে দিয়েছিল। 'জার্মানীর কৃষক যুদ্ধ' রচনায় ফ্রেডেরিখ এঙ্গেলস এমন ইঙ্গিত দিয়েছেন।

আমাদের দেশেও বুদ্ধঘোষ চার্বাক প্রমুখ লোকায়ত বা বস্তুবাদী দার্শনিকদের লোকপ্রিয় ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে আক্রমণ সংগঠিত করে শাসকশ্রেণীর মদতে পুষ্ট আর্য-হিন্দু অধ্যাত্মবাদীরা ভারতীয় সংস্কৃতির 'ঐতিহ্য' সৃষ্টি করেছে। প্রখ্যাত লোক-বিজ্ঞানী দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'লোকায়ত দর্শন'-এর প্রথম খণ্ডে বলেছেন—"লোকায়ত বলতে শুধু যে জনসাধারণের মধ্যে পরিব্যাপ্ত তাই নয়। এই মতে দেহাতিরিক্ত আত্মা ও পরলোকের কথা কল্পনামাত্র। পুরুষার্থ বলতে শুধু অর্থ ও কাম, অর্থাৎ বস্তুবাদী মত।" বুদ্ধ ঘোষের মতে, যে দর্শনের ভিত্তি বা আয়তন ইহলোক বা লোক তারই নাম লোকায়ত। 'ষড়দর্শন-সমুচ্চয়'তে বলা হয়েছে যা বা যেটুকু ইন্দ্রিয়াত্মক তাই লোকায়ত, অর্থাৎ যা কিছু পার্থিব বা পদার্থসমূহ তাকেই এই দর্শনের ভিত্তি ও উপাদান হিসাবে ধরতে হবে। কাজেই লোক-সংস্কৃতি ও লোক সঙ্গীতের উৎসকেন্দ্রে রয়েছে এই লোকায়ত বা বস্তুবাদী দর্শন।

জার্মানীর প্রগতিশীল সঙ্গীতস্রষ্টা হান্স আইস্লার তাঁর 'এ রেবেল ইন মিউজিক, গ্রন্থে বলেছেন—

"Folk songs arises under primitive economic conditions, especially in agrarian economics. Modern capitalism is unsuitable ground for the growth of Folk Song."

সত্যিই তো! যে মাঝি হাল-বৈঠা নিয়ে পদ্মায় পাড়ি দিয়ে ভাটিয়ালীর উদাত্ত টানা সুরে গান গাইত, সে এখন মোটর লঞ্চ চালায়। ইঞ্জিনের অতি দ্রুত ছন্দে ও ধোঁয়ার কুণ্ডলিতে ভাটিয়ালীর সুরের আকাশ কালো পাথরের মত জমাট বেঁধে গেছে। কালিদাসের রঘুবংশ কিংবা ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল যেমন ছিল তেমনই আছে; কিন্তু সেই-সেই যুগের সমাজও আর নেই, লোক-গণের রূপও অবিকল থাকেনি। তাছাড়া ছাপাখানা হওয়ার পর শ্রুতি ও স্মৃতিনির্ভর লোকসঙ্গীতের বহতা গুণও প্রায় শুকিয়ে গেছে।

লোকসঙ্গীতকে যাঁরা সরল ও সোজা কথায় গ্রামীন সমাজের সৃষ্টি বলেন, তাঁদের সঙ্গে আমরা পুরোপুরি একমত নই। কারণ আমরা মনে করি, গ্রামীন সমাজেও উচ্চ অভিজাত, বিত্তশালী পণ্ডিতদের অংশ রয়েছে। তারা অ-লোকায়ত অধ্যাত্মবাদী ও ইতিহাসবিমুখ, মার্জিত পুঁথি-সাহিত্য বা লিখিত সাহিত্য বানিয়ে রাজা-বাদশাহদের সভায় পেশ করে বাহবা কুড়িয়েছে।

এইসব সাহিত্য যৌথ সমাজের নিজস্ব ও স্বতঃস্ফূর্ত সৃষ্টিও নয়, নিরক্ষর শ্রমজীবী মানুষের লোকধর্ম-কেন্দ্রীক সহজিয়া সৃষ্টিও নয়।

॥ তিন ॥

লোক-সংস্কৃতির সঙ্গে লোকধর্মের সম্পর্ক অচ্ছেদ্য, যদিও লোক-সাহিত্য, লোকচিত্র ও লোকসঙ্গীতের মধ্যে বস্তুবাদী সমাজভাবনার অজস্র উপাদান লেগে থাকে।

প্রাক-শ্রেণী সমাজে আদিম মানুষ যখন বৃষ্টি চেয়েছে, রোদ্দুর চেয়েছে তখন অরুণ-বরুণ নৃত্য করেছে। যখন সে শিকার করতে যাবে, তখন নিজেরা শিকার ও শিকারী হয়ে ভয়ংকর শিকারের সঙ্গে লড়াই ও বিজয়ের যৌথ সঙ্গীত ও মূকাভিনয় করেছে। আদিম ইন্দ্রজালের অন্যতম একটি হল 'উর্বরতার যাদু' বা 'ফার্টিলিটি ম্যাজিক'। যে স্তরে পুরুষ শিকারও ছাড়েনি, নারীরা কৃষিকাজ সুরু করেছিল তখনকার শিকার নৃত্যে, উর্বরতার মূকাভিনয়ে লোকায়ত ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানও মিশে গিয়েছিল। মূল শিকার ও কৃষিকর্মের বাস্তব প্রক্রিয়া থেকে বা শ্রম-প্রক্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ঠিক-ঠিক শারীরিক সঞ্চালন ও মানসিক উত্তেজনার যৌথ মূকাভিনয় বা নৃত্য-

সঙ্গীতের মধ্যে আত্মগত (প্রেরণা-উদ্দীপক) ও বস্তুগত বা প্রয়োগগত দক্ষতা বা গুণের উন্নয়ন ঘটত। জর্জ টমসন বলছেন—

"Finally, as the technique of production improves, the mimetic dance loses its connection with labour and becomes a recreative activity which serves a vehicle for rehersing the tribal traditions. This gives us the choral ode, in which we may reeognise the initial stage in the development of epic and balled poetry."

আদিম ইন্দ্রজাল বা ম্যাজিক রীতির নেতিবাচক দিক থেকেই লোকধর্ম-পুরাণের উৎপত্তি। ম্যাক্সিম গোর্কি ১৯৩১ সালে 'রিপ্লাই টু এ্যান ইন্টেলেকচুয়াল' প্রবন্ধে বলেছেন—"...শ্রমজীবী জনগণ প্রকৃতির মঙ্গল-অমঙ্গলের শক্তিগুলির ব্যাখ্যা খুঁজতে গিয়ে মানুষের গুণসম্পন্ন অথচ মানুষের চেয়ে ক্ষমতাবান একজনের রূপে এইসব বাহ্যিক ঘটনার প্রতিরূপ গড়েছে। এইসব দেবতাদের উপর নিজেদের দোষগুণও আরোপ করেছে। অলিম্পিয়ান বা গ্রীসের দেবতারা আধিক্য আরোপিত মানবরূপে ভালকান, থর হ'ল কামার যাকে যে-কোন গ্রামে দেখা যায়। ঐ সব দেবতারা অনেক বেশি শক্তিশালী, তত দক্ষ না হলেও।...আদিতে শ্রমজীবী মানুষ যে ধর্মের এইসব প্রতীক সৃষ্টি করেছে তা সরল শিল্পরূপে। এর মধ্যে রহস্যময়তার কোন ধোঁয়া থাকে না। আসলে তারা খুবই বাস্তব এবং বাস্তবের সঙ্গে ঐ সব দেবতা বা ধর্মীয় প্রতীকের খুবই মিল রয়েছে। তারা তাদের স্রষ্টাদের প্রতিদিনের মেহনত ও কাজকর্মের প্রভাব প্রকাশ ও প্রতিফলিত করে। বস্তুত এই ধর্মীয় পুরাণাশ্রিত লোকায়ত শিল্পসৃষ্টির উদ্দেশ্য তাদের কাজে উদ্যোগ সঞ্চার করা। বাস্তব জগৎ তাদের উৎপাদনশক্তির বা শ্রমশক্তির সৃষ্টি, আদৌ দেবতাদের নয়—এই চেতনা তাদের নিজস্ব কাব্য-সঙ্গীতের মধ্যেও পরিলক্ষিত হয়। জনগণ আদিম দেবদেবতার পুজারী অর্থাৎ প্যাগান। খ্রীষ্ট ধর্ম রাষ্ট্রীয় ধর্ম হওয়ার দেড় হাজার বছর পরেও কৃষকরা দেবতাদের সেই পুরোন দেবতাদের মতই দেখে থাকে।"

এই বস্তুবাদী লৌকিক ধর্মের সঙ্গেই লোকচিত্র ও লোকসঙ্গীত মিশে থাকে। কিন্তু দেশ-বিদেশের রাষ্ট্রীয় ভাববাদী ধর্ম-দর্শনের আক্রমণে যেমন লোকধর্মের বস্তুগত উপাদান কমে গেছে, পরবর্তীকালে বিশেষ করে ধনতান্ত্রিক সমাজের অভ্যুদয়ে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির মাধ্যমে উন্নততর উৎপাদন-

পদ্ধতি, ও সম্পর্ক ভাববাদী ধর্মীয় বিচ্ছিন্নতা ও বিশুদ্ধতাও ক্রমেই তছনছ হয়ে গেছে।

তবে আমাদের দেশের গ্রামীন সমাজে যে আজও কিছু লৌকিক দেবতা টিম্-টিম্ করছে তার কারণ আমাদের দেশে আজও সামন্ততন্ত্র পুরোপুরি উচ্ছেদ হয়নি, অনুন্নত আদিবাসী সমাজে আজও মধ্যযুগীয় অনুন্নত প্রথায় কৃষিকাজ হয়। তাই আমাদের দেশে হান্‌স আইস্লারের পর্যবেক্ষণ পুরো-পুরি সত্য আজও নয়। অর্থাৎ আজও আমাদের পুরোন লোকসঙ্গীত একে-বারে মুছে যায়নি, যদিও তাতে লোকধর্মীয় উপাদানের চেয়ে বাস্তব জগতের বেশ কিছু পরিবর্তন, রাজনীতির হাওয়া, সমাজ-সচেতনতা বেশি লাগছে—লোকসঙ্গীত রূপান্তরিত হচ্ছে। লোকসঙ্গীতের 'সংরক্ষণ' বা পুনরুজ্জীবনবাদী'দের কাছে এই ঘটনা অস্বস্তিকর হলেও সময়ের হাত খণ্ডাবে কে!

এখানে একটা প্রশ্নের আলোচনা সেরে নেওয়া যাক। লোকসঙ্গীত যদি শ্রমজীবী এবং প্রধানত শোষিত লোক-সমাজের সৃষ্টিই হয়, তবে তার মধ্যে বিদ্রোহ, শ্রেণী-সংগ্রাম নেই কেন বা কম কেন?

১. অতীতের দাস ও কৃষক বিদ্রোহ ছিল প্রধানত ধর্মবিদ্রোহ।

২. শাসকশ্রেণীর অধ্যাত্মবাদী ও আচার-প্রথার ধর্মীয় বেড়াজালে, বর্ণাশ্রমের আঁটসাঁটো বাঁধনে মানবচৈতন্যকে আচ্ছন্ন করে রাখা হয়েছিল।

৩. বস্তুবাদী লোকায়ত ধর্মের সংস্পর্শে বাস্তব জীবনের দুঃখ-দুর্দশা ও গণতান্ত্রিক উপাদান বহু লোক-সাহিত্য-সঙ্গীতে প্রকাশ পেয়েছে।

৪, রাজনৈতিক লোকগাথা ও সঙ্গীত রচিত হয়েছে। কিন্তু জনপ্রিয়তার তাগিদে ধর্মীয় কু-সংস্কারগুলিকেও অনেকক্ষেত্রে চিত্রকল্প হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে।

৫. প্রাচীন লোকসঙ্গীতে যত দুঃখ-দুর্দশার কথা রয়েছে, তত স্পষ্ট প্রতিবাদ নেই।

৬. সামন্ততান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় উৎপাদনের উপায় ও পদ্ধতি থেকে কৃষক ততটা বিচ্ছিন্ন থাকে না, যতটা ধনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শ্রমিক নিজে শরীর ও তার শ্রমকে পণ্য করতে বাধ্য হয়। সামন্ত-শোষণ অনেকটা পরোক্ষ, অস্পষ্ট ও ধীরগতির; কিন্তু ধনতান্ত্রিক শোষণ প্রত্যক্ষ, নগ্ন, ও তীব্র।

কাজেই আজ যারা লোকসঙ্গীতের 'বিশুদ্ধতা' রক্ষায় আকুল এবং তার পুনরুজ্জীবনে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন তাঁদেকে বলবো 'দি বয়েজ ম্যাজিক হর্ণ'

সম্পর্কে হেরম্যান স্কুয়েটারের কাছে ফ্রেডেরিখ এঙ্গেলসের পত্রটি পড়তে, ম্যাকসিম গোর্কির কাছে লেনিনের বিখ্যাত পত্রটি পড়তে।

এই দুই জনের বক্তব্যের সারাংশ হল ঃ

ক. অতীতের শ্রেণী-সংগ্রামে ঐ সব ধর্মকেন্দ্রিক লোকসঙ্গীতগুলি যে সমাজে কিছুটা কাজে লেগেছিল, আজ তাকে যথাযথ ব্যবহার করতে গেলে উল্টো ফল দেবে। খ. বহিঃপ্রকৃতি ও শ্রেণীসমাজ এই দুই জোয়ালে পশুর মত বদ্ধ মানুষ অসহায়তা থেকে বাঁচার তাড়নায় যে ঈশ্বরের সৃষ্টি করেছিল তাতে ক্রমে সে আরও বেশি জড়িয়ে পড়েছিল। তবু ইতিহাসে এমন একদিন ছিল যখন ধর্মের আবরণেই গণতন্ত্রের সংগ্রাম চলেছিল। কিন্তু সেই সমাজ-পরিস্থিতি আজ আর নেই। কাজেই আজকের যুগে ধর্ম বা ঈশ্বরের সপক্ষে কোন রকম ওকালতি মানেই প্রতিক্রিয়ার সপক্ষে বলা।

উল্লেখযোগ্য যে, আমার আলোচনায় ইতিপূর্বে ঈশ্বরের বা ধর্মের উৎপত্তি বিষয়ে গোর্কির যে বক্তব্য উদ্ধৃত করেছি, তা আদিম ইন্দ্রজাল যুগের ঈশ্বর বা ধর্ম। কিন্তু শ্রেণী-সমাজের বিবর্তনের সঙ্গে সমাজে উৎপাদনের উপায়, পদ্ধতি ও সম্পর্কের বিবর্তনের সঙ্গে ধর্মবোধেরও বিবর্তন হয়েছে এবং স্বভাবতই শাসকশ্রেণীর সাংস্কৃতিক আধিপত্যের শিকড়-সঞ্চারী বিষবাষ্পে ধর্ম ও ঈশ্বর মেহনতি মানুষের থেকে অনেক দূরে, অনেক জটিল রহস্যাবরণে অস্পষ্ট অথচ অনতিক্রম্য নিয়তির মত গেঁথে গেছে। এই দৃষ্টিকোণেই লোকসঙ্গীতের ধর্মীয় ভাবাবেগ, ঈশ্বর বা বাউলতত্ত্বের 'মনের মানুষ'কে বুঝতে হবে। নিঃসন্দেহে ধর্ম এই স্তরে আফিমের কাজ করেছে।

অতীতের আদিম সমাজে বহিঃশক্তির কাছে অসহায় মানুষ নিরাপত্তার অভাব থেকে ঈশ্বর সৃষ্টি করেছিল। আজ অবক্ষয়ী ধনতন্ত্রের সমাজে, বিজ্ঞান-প্রযুক্তির বিপুল অগ্রগতির মধ্যেও (একচেটিয়া পুঁজির পণ্য হবার কারণে) ব্যক্তি মানুষ বিচ্ছিন্ন, খণ্ডিত, সংশয়-অনিশ্চয়তায় বিষণ্ণ। এই ফাঁক ভরাতে সে হয় 'শনি', 'জ্যোতিষী' বা সাঁই-ভগবান'-এর আশ্রয় নিচ্ছে, নয়ত নিজের বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিসত্তার বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ ক'রে শেষপর্যন্ত অবক্ষয়ী ধনতন্ত্রের বা সাম্রাজ্যবাদী, ফ্যাসীবাদী সংস্কৃতির ইন্দ্রজালের মায়ায় উদ্ভট কল্পরাজ্যে আশ্রয় নিয়ে ভাবতে চাইছে 'আমি এই সমাজকে অস্বীকার করলাম।'

॥ চার ॥

লোক-সংস্কৃতি ও তার নৃত্য, নাট্য ও সঙ্গীত বিষয়ে এক দৃষ্টি আকর্ষণী বক্তব্য বলতে চাই : লোক-সংস্কৃতি নির্দিষ্টভাবে কোন বিশেষ শ্রেণীর নয়। এর মধ্যে শাসক শ্রেণীর ধর্মীয় ভাববাদের প্রাধান্যও যেমন রয়েছে, তেমনই শোষিত শ্রমজীবী শ্রেণীর বাস্তব জীবনমুখীনতার উপাদানও রয়েছে। আজ ধনতন্ত্র ও তার বিজ্ঞান-প্রযুক্তির দ্রুত বহিরঙ্গ পরিবর্তনের তরঙ্গে ঐ লোক-সংস্কৃতির পুরোন মিশ্র ধারায় মোচড় লেগেছে। আমরা জানি, লোক-নাট্য ও লোকসঙ্গীত জনপ্রিয় গণ-মাধ্যম ; এই মাধ্যমের ব্যবহার করে মানুষের কাছে উভয় শ্রেণীই পেঁছিতে চাইছে। জাতীয়তাবাদ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন ঔপনিবেশিক ও সাম্রাজ্যবাদী শোষণ-অত্যাচারের বিরুদ্ধে যেমন লোকসঙ্গীতকে জনগণের মুক্তি-সংগ্রামের জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করছে, তেমনই শাসক-শ্রেণীও 'মাস-কালচার'-এর প্রয়োজনে লোকসঙ্গীতকে স্থূল, লঘু, যৌন-সর্বস্ব উত্তেজনাব উপাদানে বিকৃত করতে মেতে উঠেছে। এই মাতনে শোষিত বঞ্চিত যুব-সমাজ, এমনকি শ্রমিকশ্রেণীর একাংশ আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে।

এই লোকায়ত জনপ্রিয় শিল্প-আঙ্গিক আজ তার অতীতের ধর্মীয় মায়াজাল ছিঁড়ে যখন জনগণের আশা-আকাঙখাকে রূপ দিতে নেমে পড়েছে, তখন আতঙ্কিত শাসকগোষ্ঠীও ছেড়ে কথা কইছে না। অতীতে যে-লোক-সঙ্গীত ছিল ভদ্র উচ্চশ্রেণীর কাছে 'অচ্ছ্যুৎ', আজ তাকেই বারবণিতার মত ব্যবহার করছে।

অপরপক্ষে গ্রামের কৃষক তার ভাদু, টুসু, গম্ভীরা গানে জমি হারানোর জন্য শিব বা কৃষ্ণের কাছে নাকে কাঁদছে না। জমির দখলের জন্য, ফসলের অধিকারের জন্য যে লড়াই করছে তার কথাই তাদের গানে বলছে। জমির পরিবেশে পুঁজি, মহাজনী ঋণ, পাম্প, রাসায়নিক সার, পাকা সড়ক, ইস্পাতের সেতু, বিদ্যুৎ এই সবই তার লোকসঙ্গীতের বিষয়বস্তু হচ্ছে। আবার জমি হারিয়ে শহরাঞ্চলে এসে শ্রমিক হওয়া মানুষও তাদের নিজস্ব সঙ্গীতের ঐতিহ্য ভুলে যাচ্ছে না। তাই কৃষক-শ্রমিকশ্রেণীর কাছে সঙ্গীত ও নাট্যের এই লোকায়ত আঙ্গিক আজও জনপ্রিয়। এই জনপ্রিয় শিল্প-আঙ্গিকেই শ্রমিক-শ্রেণীর সংগ্রাম ও বিজয়ের উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে হবে। তারা রক্ষা করবে লোকসঙ্গীতের রাজনৈতিক ঐতিহ্য, ধর্মনিরপেক্ষতার ঐতিহ্য এবং সমাজবদ্ধতার ঐতিহ্য।

আমরা 'প্রাচীন' ও 'মৃত' বলে যারা ফেলে দিতে চায়, তাদের দলেও যেমন

থাকতে পারি না, তেমনি সাম্রাজ্যবাদীরা 'বিকৃত' করছে, সস্তা পণ্য করছে বলে ধর্মীয় বা কু-সংস্কারের 'বিশুদ্ধতা' রক্ষার উকিলদের পক্ষেও থাকতে পারি না। আমরা গ্রহণ-বর্জনের মধ্য দিয়ে অতীতকে রূপান্তরিত করতে চাই এবং শিল্পের লোক-আঙ্গিকের গণমুখী বিবর্তন প্রক্রিয়াকে সমর্থন করি।

॥ পাঁচ ॥

এবার আমরা গণসঙ্গীতের দোরগোড়ায় এসে গেছি। এই নতুন সঙ্গীতের দুটো দিক রয়েছে। শ্রমজীবী জনগণের একাংশ গ্রামে জমির লড়াই করছে, অপরাংশ জমি হারিয়ে শহরাঞ্চলের কল-কারখানায় এসে প্রত্যক্ষভাবে ধনতন্ত্রের জোয়ালে বাঁধা পড়েছে এবং সংগ্রামী ঐক্যের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সৃষ্টি করছে। এদের স্মৃতি ও স্নায়ুতন্ত্রের মধ্যে রয়েছে লোকসঙ্গীতের পুরোন রেশ, আর প্রত্যক্ষভাবে মেশিনের সজোর দ্রুত ছন্দের অনুষঙ্গে এসে পড়ছে ফৌজী লয়ের গতি। এই শ্রমিক কি আর পদ্মার উদাস ভাটিয়ালীতে তার শ্রমশক্তির প্রেরণা পেতে পারে? হান্‌স আইস্লার সঠিকভাবেই বলছেন—

"The tempo and rythm of their work is dictated by their machines and not by the workers themselves."

কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে শিল্পবিপ্লব ইউরোপেই তার সামন্ত-তান্ত্রিক অতীতকে প্রায় মুছে দিয়েছে, আমাদের মত আধা-সামন্তবাদী পুঁজি-বাদী দেশে ঐ গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পূর্ণ হয়নি। কাজেই আমাদের মূল প্রশ্ন আমূল ভূমি-সংস্কারের সংগ্রাম। আমাদের জাতীয় অর্থনীতির প্রধানতম শত্রু জমিদারী প্রথা। তাই আমাদের সংগ্রামের মূল কর্মসূচী ঃ

বিনা খেসারতে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করে, বিনামূল্যে ভূমিহীন ক্ষেত-মজুর ও গরিব কৃষকদের মধ্যে ভূমি বণ্টন। আজ জনগণের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, এই কাজ সম্পন্ন করলে পর তবেই খাদ্য সংকটের সুরাহা হবে, শিল্পের বিকাশ সম্ভব হবে, দেশের মধ্যেই পুঁজি গড়ে উঠবে এবং সেই পুঁজি দেশের কল-কারখানায় উৎপাদন বৃদ্ধির সহায়ক হবে; কারণ কৃষকের ক্রয়-ক্ষমতা বাড়লেই পণ্যের আভ্যন্তরিণ চাহিদা বা বাজার বাড়বে এবং কল-কারখানায় কাজের ক্ষেত্র ও সুযোগ বাড়বে। এরই নাম জনগণের গণতান্ত্রিক বিপ্লব। এটাই আজ গণ-সংস্কৃতি ও গণসঙ্গীতের আদর্শগত ও বিষয়গত উপজীব্য। রাজনৈতিক মতাদর্শ ও বিষয়বস্তু ঠিক হয়ে গেলে আঙ্গিককে অবশ্যই ঐতিহ্যবাহী ও জনপ্রিয় হতে হবে। এই লোক-আঙ্গিকের ঐতিহ্যে কৃষকজীবনের স্মারক

কবিয়াল রমেশ শীল যখন গান—'ব্রিটিশের সেই গড়া যন্ত্র শয়তানেরই চরখাতে / বাইরে যার গোলাপ গন্ধ নরককুণ্ড খিড়কীতে / শুধু চালকগুলো বদল হলে ইঞ্জিনের কি আসে যায়' তখন কি বলবো এতে লোকসঙ্গীতের 'পুনরুজ্জীবন' হলো না বলে মহাভারত অশুদ্ধ হলো? নাকি বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকসাহিত্য-বিশারদ তথাকথিত পণ্ডিতদের মত 'এতে লৌকিক ইতরতা নেই', 'এইভাবে গতায়ুকে আয়ুদান করা যায় না', 'এ সব রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত গানের বিকৃতি' ইত্যাদি প্রলাপ বকবো?

আসলে এখান থেকেই লোকসঙ্গীত গণসঙ্গীতে রূপান্তরিত হচ্ছে। এরই নাম ঐতিহ্যের বিবর্তন। একদিন গম্ভীরা গানে ভগবান শিবের বন্দনার ছলে রাজার বন্দনা হয়েছে। পরে বা একই সময়ে লোকসঙ্গীতের আর এক ধারায় শিবকে সামনে রেখে গরিব শ্রমজীবী মানুষের কবি সামাজিক ও ব্যবহারিক জীবনের দুঃখবেদনার কথা বলেছেন। অতঃপর জাতীয় আন্দোলনের পর্বে স্বাধীনতার বাসনা প্রকাশ করেছেন গম্ভীরার গায়েনরা। এখন ঐ শিবের সঙ্গে বামপন্থী আন্দোলন, বর্গা আন্দোলনের কথা বলছে। আজ গ্রামে গ্রামে সচেতন সংগ্রামী কৃষকদের কণ্ঠে ফিরছে ভাদু-টুসুর এই গণমুখী সংগ্রামী ধারার গান। এই ধারার এক স্তরে যদি ভাদু-টুসুকে সঙ্গে নিয়ে গান গেয়ে গ্রামের চাষি-মজুররা সেচের ক্যানেল, ব্যারেজ, বিজলি বাতি দেখতে এবং দেখে পুলকিত হতে যায়, তবে লোকসঙ্গীতের 'জাত' গেল বলে যে সব 'বিশিষ্ট' সঙ্গীতশিল্পী এবং এককালের 'সাড়া-জাগানো গণনাট্য শিল্পী' রব তোলেন, তাঁরা ভুলে যান বিজ্ঞান-প্রযুক্তির বিকাশে ও বহিরঙ্গ পরিবর্তনেই লোকজীবনে চেতনার পরিবর্তন আসে এবং ক্রমে তারাই ঐ ব্যারেজ ও ক্যানেল রক্ষার সঙ্গে জমি, ফলন ও বর্গার গণ-আন্দোলনে সামিল হয়ে কণ্ঠে গণসঙ্গীতের উত্তরণ ঘটিয়ে থাকেন। এইসব হাজারী ম্যাস-সিঙ্গার 'ভোট বৈতরণী পারাপারের খেয়ামাঝির গান'কে কটাক্ষ করেন (দ্রষ্টব্য: লোকসঙ্গীত সমীক্ষা: বাংলা ও আসাম—হেমাঙ্গ বিশ্বাস), সহজেই একলাফে বিপ্লবের মগডালে বসে 'টামাক' খেতে চান। অর্থাৎ তাঁরা জনগণের গণতান্ত্রিক চেতনার স্তরকে বাদ দিয়েই সমাজতন্ত্রের সংস্কৃতি পেতে চান। অথচ এনারাই লোকসঙ্গীতের 'মরমীয়া' তাগিদের মাধুর্যে পেয়ে আত্মহারা এবং 'বাহিরের তাগিদ'-এ বা বিপ্লবী পরিবর্তনের তাগিদে অসহিষ্ণু। আসলে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য এবং বিপ্লবী তাত্ত্বিক হেমাঙ্গ বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত একই বিন্দুতে মিশেছেন।

গণসঙ্গীতের 'গণ' কারা? এ যুগ রাজনৈতিক সচেতনতার যুগ। আজ জনসাধারণ বা 'পাবলিক'-এর সঙ্গে জনগণ বা 'পিপল'-এর অর্থবোধে গুণগত বা চেতনার মাত্রার তফাৎ সর্বজনস্বীকৃত। জন বা সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষ যখন গণ-তে পরিণত হয় বা রাজনীতি-চেতনার প্রক্রিয়ায় রূপান্তরিত হয় তখন হয় জনগণ।

স্বভাবতই প্রশ্ন আসে, এই রাজনীতি কোন্ রাজনীতি? এই রাজনীতি হল শোষিত শ্রেণীর বিপ্লবী রাজনীতি, শ্রেণী-সংগ্রামের সচেতন রাজনীতি। আজকে 'গণ' হল সেই শোষিত ও সংগ্রামী শ্রমজীবী মানুষ যাঁরা উৎপাদন ব্যবস্থাকে বিপ্লবের মধ্য দিয়ে পরিবর্তন করতে সক্ষম এবং পরিবর্তিত উৎপাদন ব্যবস্থার উপর নতুন বা সমাজতান্ত্রিক কাঠামো নির্মাণে যোগ্য। এই যে গণ-গণতান্ত্রিক সংগ্রামের বিকাশধারায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে উত্তরণের সাংস্কৃতিক হাতিয়ার, তারই অন্যতম হল গণসঙ্গীত। উল্লেখযোগ্য যে, সংগঠনের আগে 'গণ' উপসর্গ দিলে যে অর্থ হয়, সঙ্গীতের আগে তা দিলে অর্থ আরও নির্দিষ্ট ও গভীর হয়। গণ-সংগঠনের মধ্যে নানা শ্রেণী-মানসিকতা কাজ করতে পারে, যদিও ক্রমবর্ধমান শ্রেণী-সংগ্রামের প্রভাবে ঐ সব গণ-সংগঠনেও বিবর্তন ঘটছে। কিন্তু গণসঙ্গীত হল শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী পার্টির রণসঙ্গীত।

এই 'গণ' শব্দটি খুবই প্রাচীন। রামায়ণ-মহাভারতেও এর উল্লেখ রয়েছে। ঐ দুই মহাকাব্যে পার্বত্য বা অরণ্যবাসী উপজাতীয় গোষ্ঠীদের অঞ্চল বোঝাতে 'গণ' ব্যবহার হয়েছে (সম্ভবত যা থেকে পরগণা)। কাত্যায়নের শাস্ত্রগ্রন্থে 'সমূহ' অর্থে, পানিনির গ্রন্থে 'সংঘ' অর্থে এই শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায়।

ম্যাকডোনেল্ড 'গণ' বলতে 'কমিউনিটি' ও 'কর্পোরেশন' উল্লেখ করেছেন। মনিয়ার উইলিয়মস্ ও দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় 'গণ' শব্দের প্রাচীন অর্থ 'ট্রাইব্যাল অর্গানাইজেসন' দেখিয়েছেন।

দেখা যাচ্ছে এই শেষেরটিতে, প্রাক্-শ্রেণীবিভক্ত সমাজের যৌথ উৎপাদন ও যৌথ বণ্টন-এর সামগ্রিক সামাজিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে 'গণ' শব্দের ঐতিহ্য রয়েছে। এই সূত্রে শ্রেণী-সমাজের বিবর্তনশীলতার ধারা পর্যালোচনা করে প্রবীণ লোকসংস্কৃতি বিশেষজ্ঞ শ্রীরামশঙ্কর চৌধুরী সঠিকভাবেই বলেছেন—'সমূহ' অর্থে নয়, আজ যৌথ উৎপাদন ও বন্টনের সামাজিক উত্তরণে রাজনীতি সচেতন ও সংগ্রামী গণশ্রেণী বা সর্বহারা শ্রেণীর সঙ্গীত প্রকৃত অর্থে

গণসঙ্গীত। প্রখ্যাত গণনাট্য শিল্পী ও প্রবীণ মার্কসবাদী তাত্ত্বিক শ্রীহীরেণ ভট্টাচার্য এই বিষয়টিকে আরও ব্যাখ্যা করে বলেছেন—"সামন্তবাদী সমাজের 'লোকে'রা নৈতিক, ধর্মীয় রাজনৈতিক ও সামাজিক সবকিছুর অন্তরালে নিজ শ্রেণীস্বার্থ আবিষ্কার করতে শেখেনি, কিন্তু আজকের নগ্ন শোষণ ও তীব্র শ্রেণী-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে শোষিত সর্বহারা শ্রেণী প্রতিদিন, প্রতি ক্ষেত্রে এই শ্রেণীস্বার্থ আবিষ্কার করতে শিখেছে এবং শিখছে। এখানেই সেদিনের সমূহের ও লোকের সঙ্গে আজকের গণের পার্থক্য" (গণনাট্য পত্রিকা, মে-জুলাই ১৯৮০)। আজ এই গণশ্রেণীর গানই উন্নত স্তরে উন্নীত লোকসঙ্গীত।

স্বভাবতই গণসঙ্গীত বিষয়বস্তু, ভাবাদর্শ ও শিল্পমূল্যে আজ সঙ্গীত ধারার সবচেয়ে উন্নত ও উজ্জ্বল। কিন্তু লক্ষ্য করি, বেশ কয়েকজন নামী গণসঙ্গীত শিল্পী যদি দূরদর্শনে কিংবা অভিজাত হলের আসরে সিনেমা বা রেকর্ড কোম্পানীর নামী-দামী 'স্টার' শিল্পীদের সঙ্গে গাওয়ার আমন্ত্রণ পান, তাহলে তাঁরা এবং সেই সঙ্গে তাঁদের অনুরাগীরাও 'জাতে' ওঠার আনন্দে ডগমগ হন। এটা আমাদের অনেক বামপন্থী প্রগতিশীল কবিদের ক্ষেত্রেও নজরে পড়ে। অথচ দেশী-বিদেশী সুরের ককটেল মিকশ্চারে বা বিকৃত লোকসঙ্গীতের কথা ও সুরে সস্তা উত্তেজনা সৃষ্টিকারী সিনেমার গান যেখানে অধঃপাতিত, সেই গানের সারিতে দাঁড়িয়ে একজন প্রকৃত গণসঙ্গীতশিল্পী কেন যে গৌরববোধ করেন বুঝি না। এইজন্য গণশিল্পীকেও শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী মতাদর্শ শুধু তত্ত্বগত উপলব্ধিতে আনলেই হয় না, আচরণীয় ব্যক্তিত্বেও প্রক্রিয়ায়িত করতে হয়, গণনাট্য আন্দোলনে অংশীদার হতে হয়। একজন লেখক ব্যক্তি হিসাবে অনেকটা আড়ালে থাকলেও একজন বা একদল গণশিল্পী হাজার-হাজার মানুষের সামনে তাঁদের সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্ব নিয়েই তাঁদের সৃষ্টি পরিবেশন করেন।

কণ্ঠে থাকবে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী সঙ্গীত আর কৃষক পল্লীতে বা শ্রমিক কলোনিতে গান গাইবার সময়ে নিজের মনোভাবে ও আচরণে প্রতি পদে উদ্যোক্তাদের 'অপরাধী' বা 'ছোট' করে দেওয়ার স্মার্টনেস্ দেখানো মধ্যবিত্ত-সুলভ অপরাধ বলে মনে করি।

॥ ছয় ॥

প্রশ্ন হল, কোন্ আঙ্গিকে গণসঙ্গীত হবে? কেন? আমাদের গণ সঙ্গীতের প্রধান উপজীব্য বা কেন্দ্রবিন্দুটা তো ঠিক হয়ে গেছে—মৌলিক

ভূমি সংস্কারের সংগ্রাম। তাহলে কেন সস্তা জনপ্রিয় সিনেমার গানকে প্যারোডি করবো ? অথবা পাশ্চাত্য কায়দায় সিম্ফনি ইত্যাদির ব্যবহার করে চমক্ সৃষ্টি করবো ? একদিন সলিল চৌধুরী প্রায় এই রীতিতে পাশ্চাত্য সুরের আঙ্গিকে অনেক গণসঙ্গীত সৃষ্টি করে নাগরিক মনকে জয় করেছিলেন। আমার ধারণা, সেই কান-বদলটা ছিল মূলত তথাকথিত একঘেয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীতে ক্লান্ত ও গলা কাঁপিয়ে টানা সুরে নেকিয়ে গাওয়া তখনকার আধুনিক বাংলা গানের একঘেয়েমি কাটানোর ব্যাপার। গ্রাম-গ্রামান্তরে গণ-চেতনা সৃষ্টির সহায়ক ততটা ছিল না। তা যদি হোত তাহলে ধনিক শ্রেণীর ব্যবসায়ী সংস্থা চট্ করে ঐ সব গান কিনে নিত না। কই, গুরুদাস পাল, রমেশ শীল কিংবা নিবারণ পণ্ডিতের মত প্রকৃত গণশিল্পীর গানগুলির প্রতি তো ওদের নজর পড়েনি ! সঠিকভাবেই পড়েনি। কারণ স্বদেশী আন্দোলনের যুগে মুকুন্দদাসের লোকনাট্যের ধারা যে ভাবে গ্রামে-গঞ্জে জনপ্রিয় হয়েছিল তারই উত্তর সাধনায় ঐ সব গণশিল্পী গণ-আন্দোলনের হাতিয়ার সৃষ্টি করেছেন, কেবলমাত্র শহরের মধ্যবিত্ত রোমাণ্টিক রুচির স্বাদবদল করার দিকে তাঁদের নজর ছিল না। সলিল চৌধুরীর গান নিঃসন্দেহে প্রতিভার সৃষ্টি, কিন্তু প্রকৃত গণসঙ্গীত সৃষ্টি হয় গণ-আন্দোলনে, জনগণের নিজস্ব ভাষায় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের রূপান্তরে। গোর্কি ব্যক্তি-প্রতিভার ভূমিকা স্বীকার করেও বলেছেন—

"Art is within the powers of the individual, but only the community is capable of tune creation",

এই অর্থে দীনবন্ধু মিত্রের 'লীলাবতী' তার নিজস্ব সৃষ্টি, কিন্তু 'নীল-দর্পণ' তাঁর কারিগরিত্বে সংগ্রামী নীল কৃষকদের সৃষ্টি।

গণসঙ্গীতে পাশ্চাত্য সুরের আঙ্গিক সম্পর্কে মনে রাখা দরকার, জাজ, পপ ইত্যাদি মূলত পাশ্চাত্য লোকসঙ্গীত হলেও সেগুলি আমরা পাই পুঁজিবাদী দুনিয়ার প্রচার-মাধ্যমে বিকৃত ও খণ্ডিত ভাবে। তাছাড়া পল রবসনের বা পিট সিগারের গানের খোপে আমাদের বিপ্লবী কথা বসালেই কি আমাদের সংস্কৃতির রূপান্তর হল ? তাঁরা তো তাঁদের লোকসঙ্গীত ও জাতীয় সুর-কাঠামোর ঐতিহ্যের উপর দাঁড়িয়ে গান রচনা করেছেন ! আমাদের সঙ্গীতের জাতীয় ঐতিহ্যের কি এতই দৈন্য দশা ?

আমার ধারণা, গণসঙ্গীতে সলিল চৌধুরীর অবদান থাকলেও, তাঁর গানের কাঠামো কোন ধারা হতে পারে না। আবার বিশিষ্ট সঙ্গীত সমালোচক

নারায়ণ চৌধুরী যে বলেন—'স্বদেশী কোরাস গানের ধারা', এটাও ঠিক বিজ্ঞানসম্মত হল না। স্বদেশী বিষয় বা বাণীতে পাশ্চাত্য চার্চ সুর, লোকসঙ্গীত ও রাগসঙ্গীতের ব্যবহার করে যে সব রাজনৈতিক গান হয়েছিল, সেই পদ্ধতিতে গুরুদাস পাল, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, বিনয় রায় প্রমুখ গণনাট্য শিল্পীরা নিশ্চই স্বদেশী গানের পুনরুজ্জীবন ঘটাননি, গণ-আন্দোলনের গান করেছেন, যা কোরাস-এ গাওয়া হয়েছে। কাজেই 'স্বদেশী'টা ভাব বা বিষয়ের ব্যাপার, ওটা কোন সঙ্গীতরীতি নয়।

সম্প্রতি একটা সুস্থ বিতর্ক উঠেছে। গণসঙ্গীতে রাগরূপের ব্যবহার উপযোগী কিনা। আমার ধারণা, এতেও আমাদের জাতীয় ঐতিহ্য রয়েছে এবং প্রগতিমূলক পরিবর্তনের স্বার্থে 'বিশুদ্ধতা' ভাঙার কাঙ্খিত জনপ্রিয় ধারা রয়েছে। আমাদের লোকনাট্যে বা যাত্রাপালায় ও লোকসঙ্গীতে ভারতীয় রাগসঙ্গীতের ধারা বিবর্তিত হয়েছে। লোকশিল্পীরা ঐ ধারা বহন করেই (সংরক্ষণ নয়) একদিন গ্রাম-গঞ্জের আসর মাত্ করেছেন, ভক্তি, প্রেম, বীর ও রুদ্র রসের প্লাবন এনেছেন সঙ্গীতে। আমাদের ভাটিয়ালীর মধ্যে খাম্বাজ, পিলু অথবা ঝিঁঝিট সুরের কোন্‌টা প্রধান, এই নিয়ে সঙ্গীত-বিশেষজ্ঞদের মধ্যে যদি মতপার্থক্য থাকে তাতে লোকশিল্পী ও লোকসমাজের কিছু যায় আসে না। আসলে ঐ ধরণের সঙ্গীতে রাগরূপ অটুট থাকেনি এবং থাকেনি বলেই স্রষ্টা ও ভোক্তার মধ্যে চলাচল অবাধ হয়েছে, সঙ্গীতের বহুতা গুণ ফুটেছে। এই প্রসঙ্গে প্রাগুক্ত সঙ্গীত-সমালোচক তাঁর 'রাগ-সঙ্গীত ও লোকসঙ্গীত' এবং 'সঙ্গীত-পরিক্রমা', (৩য় সংস্করণ) গ্রন্থে সঠিক বিশ্লেষণেই দেখিয়েছেন—রাগসঙ্গীতের ধারা সার্থকভাবেই অনেক লোক-সঙ্গীতে পরিবাহিত হয়েছে। অবশ্য নারায়ণবাবু লোকসঙ্গীতে কথা অপ্রধান ও 'সুরের লীলা'ই শ্রোতাকে বেশি মুগ্ধ করে বলে যে মন্তব্য করেছেন তার সঙ্গে আমি একমত হতে পারি না। লোকসঙ্গীত যৌথ সৃষ্টি। কায়িক শ্রমের প্রেরণা পেতে অথবা তার সাময়িক বিরতিতে বা যতি-বিন্যাসে সাময়িকভাবে লোক-শ্রম-সঙ্গীতের সৃষ্টি। এতে পরশ্রমজীবীদের মত দরবারী সুরের কারিকুরি বা রাগ-রূপের বিস্তার দেখিয়ে রাজা-জমিদারের তকমা-তঙ্কা পাবার সুযোগ কোথায়? লোকশিল্পীও শ্রমজীবী, অথবা শ্রমজীবীরাই লোকশিল্পী। তারা সহজ সরল সুরে নিজেদের মনের কথা, বাস্তব জীবনের দুঃখ-অভিমানের কথা বলতেই গান গেয়েছে। বাউল গানে মাধুর্য বা 'সুরের লীলা' আছে ঠিকই, কিন্তু তা হল একটি বিশেষ ধর্ম-সম্প্রদায়ের জটিল

সাধন পদ্ধতির নাম। তাছাড়া কষ্টকল্পিত সাংকেতিক শব্দে ও উপমায় গান হিসাবে তা সর্বজনীন লোকসঙ্গীত কিনা, এই নিয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে। এ ছাড়া ভাদু, টুসু, সারি, জারি, করম, ঝুমুর, রাইবেশে, সামতালি, মাঁচ়, গরবা, আলকাপ ইত্যাদি লোকসঙ্গীতের চূড়ান্ত বিচারে দেখা যাবে এইসব গানে শ্রমসঙ্গীত ও রাগসঙ্গীতের (চার-পাঁচটি শুদ্ধ স্বরের) সমীকরণ বা বিবর্তন প্রক্রিয়া ঘটেছে। এ সব গানে সুরের লীলা-মাধুর্য নয়, বরং বলা যায় শ্রমের কথা ও ছন্দই বেশি ফুটেছে।

সঙ্গীতের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে, শ্রম, উৎপাদন পদ্ধতি ও সমাজ বিকাশের ধারা পথে এটাই সত্য যে লোকসঙ্গীত থেকেই রাগসঙ্গীতের সৃষ্টি হয়েছে, আবার রাগসঙ্গীতও লোকসঙ্গীতকে প্রভাবিত করেছে। এই জটিল ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ধারা এমনই পরোক্ষ ও সূক্ষ্ম যে সহজে আলাদা করে বোঝা যায় না।

এই ঐতিহ্যের বিকাশ ঘটিয়ে সার্থক গণসঙ্গীত করতে পারি। সামন্তবাদী সমাজে সৃষ্ট আঙ্গিক কি আমাদের জাতীয় আঙ্গিক নয়? আমরা তো আর ঐ সমাজভিত্তির বক্তব্য বা ভাবাদর্শ গ্রহণ করছি না! আমাদের বর্তমান বিপ্লবী সঙ্গীতে ফৌজী ছন্দের প্রয়োজনে আমরা যেমন পাশ্চাত্য সুরের আঙ্গিক গ্রহণেও 'শভিনিস্ট' হবো না, তেমনি জাতীয় অতীতের সাঙ্গীতিক রূপকে ঢেলে-সাজানোর কাজেও রবীন্দ্রনাথ ও পল রোবসনের দৃষ্টিভঙ্গি ও সৃষ্টিপদ্ধতি থেকে শক্তি সংগ্রহ করবো। সবাই জানেন, রোবসন নিগ্রো লোকসঙ্গীত পাশ্চাত্য মার্গসঙ্গীত আত্মস্থ করে এবং ঢেলে সাজিয়ে নবসৃষ্টির প্লাবন এনেছেন। আর রবীন্দ্রনাথ? তাঁর নিজের কথাই স্মরণ করিয়ে দিই: "যে রাগ-রাগিনীর হস্তে ভাবটিকে সমর্পণ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল সে রাগ-রাগিনী আজ বিশ্বাসঘাতকতা পূর্বক ভাবটিকে হত্যা করিয়া স্বয়ং সিংহাসন দখল করিয়া বসিয়া আছেন। আজ গান শুনিয়েই সকলে দেখিতে চান জয়জয়ন্তী বেহাগ বা কানাড়া বহাল আছে কিনা; আচ্ছা মহাশয়, জয়জয়ন্তীর কাছে আমরা এমন কী ঋণে বদ্ধ যে তাহার নিকট অমনতর দাস্যবৃত্তি করিতে হইবে?" এই বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'গীতসূত্রসার' গ্রন্থে এবং শ্রীহেমাঙ্গ বিশ্বাস 'লোকসঙ্গীত সমীক্ষা' গ্রন্থে গভীরতর আলোকপাত করেছেন।

আমাদের বক্তব্য, লোকসঙ্গীতে যদি রাগরীতির রূপান্তর ঘটে থাকে, তবে গণসঙ্গীতেই বা কেন তার প্রক্রিয়া গ্রহণে 'সামন্তবাদী ঝোঁক'-এর অজুহাতে

দ্বিধা বা সংকীর্ণতা থাকবে? নাকি সনিষ্ঠ অনুশীলন সাপেক্ষ বলে অক্ষমতার অজুহাত!

অনেকে বলেন, গণসঙ্গীতে যে বীর রস, রুদ্র ভাব প্রয়োজন, তা সূক্ষ্ম কোমল সুরের গড়নে ফোটে না বলেই এবং মেশিনের ঘটাং-ঘ্যাচ্ ছন্দের পক্ষে, নাগরিক জীবনের গদ্যময় পরিবেশের পক্ষে ঐ সব রাগসঙ্গীত বেমানান বিবেচনায় সরিয়ে রাখা হয়। এ যুক্তি খাটে না। কারণ আমরা মুকুন্দ দাস ও নজরুল ইসলামের বীরত্বব্যঞ্জক সংগ্রামী গান পেয়েছি ভূপালি, দীপক, হাম্বির, খাম্বাজ ও মালকোষের অ-বিশুদ্ধ রাগরূপের কাঠামোতে। দেশাত্মবোধক যাত্রাপালার বিবেকের গান প্রায় সবই বাঁধা হয়েছে লোকসঙ্গীত ও রাগসঙ্গীত ভাঙা সুরের গড়নে।

আসলে 'হাজার বছর আগেকার শিকল-বাঁধা রাস্তার শাকরেদী' করেননি বলেই মুকুন্দ দাস ভৈরবীর চাল বদলে 'ভয় কি মরণে রাখিতে সন্তানে' ও 'হাসিতে খেলিতে আসিনি এ জগতে'র মত জনপ্রিয় রাজনৈতিক গান এবং নজরুল হাম্বির রাগ ভেঙে 'আজি রক্তনিশি ভোরে'র মত বীররসাত্মক সংগ্রামী গান গেয়ে হাজার-হাজার মানুষের চেতনায় ঝাঁকি দিতে পেরেছেন।

তবে লোকসঙ্গীতই হোক, রাগসঙ্গীতই হোক যে-কোন সুরের কাঠামোতে জনগণের বিপ্লবী বাণী বসালেই গণসঙ্গীত হয় না। তার জন্য প্রয়োজন স্রষ্টা ও শিল্পীদের বিপ্লবী প্রেরণার সজীব প্রাণশক্তি, যার সাফল্যের পরিমাপ হবে জনগণের বিপ্লবী সংগ্রামের প্রতিটি পদক্ষেপে, প্রতিটি বাঁকে।

পুনশ্চ

জার্মানীর বিপ্লবী সঙ্গীতশিল্পী হানস্ আইস্লার 'রেবেল ইন মিউজিক' গ্রন্থে বলেছেন—"লোকসঙ্গীত দুই রকমের—একটি খাঁটি ধারা যার জন্ম হয়েছে আদিম অর্থনৈতিক, বিশেষত কৃষি-অর্থনীতির ভিত্তিতে। আর একটি নকল ধারা তৈরী হচ্ছে বিকৃত রুচির নোংরা উপায়ে, লঘু ও স্থূল ভাবে জঘণ্য সংগীত ব্যবসায়ীদের হাতে। এরা খাঁটি লোকসঙ্গীত থেকে কিছু প্রকাশভঙ্গি, কিছু শব্দ বেছে নিয়ে মোটা দাগে বিকৃতভাবে পরিবেশন করছে। এইসব গান রুখতে হবে, কারণ জনগণের উপর এদের প্রভাব ক্ষতিকারক।"

সাম্রাজ্যবাদী ও লোভী শিল্প-ব্যবসায়ীদের হাতে নকল সঙ্গীতের সম্পর্কে আইস্লারের কথা পুরোপুরি সত্য। কিন্তু লোকসঙ্গীত আজকের বুর্জোয়া সমাজে আর হতে পারে না বলে তিনি যে মন্তব্য করেছেন, সেটা ইউরোপীয়

উন্নত ধনতান্ত্রিক সমাজে, গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন হওয়া সমাজে সত্য হলেও, আমাদের মত আধা সামন্ততান্ত্রিক বুর্জোয়া সমাজের ক্ষেত্রে ঐ বক্তব্য পুরোপুরি মেলে না। আমাদের দেশের কুটির শিল্পের পাশাপাশি, সামন্ততান্ত্রিক মধ্যযুগীয় কৃষি-উৎপাদনের সঙ্গে লোকসঙ্গীত সৃষ্টি হচ্ছে।

আইসলার বলেছেন, "শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক আন্দোলন যেখানে উন্নীত হয়েছে, নিশ্চই সঙ্গীত আন্দোলন সেখানে পৌঁছতে পারেনি।"

বক্তব্যটি খুবই মূল্যবান ও বিতর্কমূলক। আমার ধারণা, সমস্যাটি ফর্মের—একটি ব্যবহারিক, অপরটি মানসিক; একটি প্রত্যক্ষ, অপরটি পরোক্ষ হওয়ার কারণেই এটা ঘটেছে।

দেখা যায়, শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক সংগ্রাম ও নাট্য সংগ্রাম বা গণনাট্য প্রায় পাশাপাশি চলছে। কারণ নাট্যশিল্প বেশি মূর্ত ও দৃশ্য। কিন্তু সঙ্গীত তা নয়। তবে এই সমস্যার সমাধান রয়েছে যে প্রক্রিয়ায় সেটি হল, গণসঙ্গীত শিল্পীরা মেহনতি মানুষের কাছ থেকে গ্রহণ করবেন রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও সংগ্রামী মানসিকতা। আর শ্রমিকশ্রেণী ঐ শিল্পীদের কাছ থেকে পাবেন ঐতিহ্যবাহী সঙ্গীতের পরিচয়, তার পাবেন সমকালের সঙ্গীত পদ্ধতি। এই যোগাযোগ যত সত্য ও সজীব হবে গণসঙ্গীতের রাজনৈতিক ভূমিকার দুর্বলতাও তত কেটে যাবে; এবং সমগ্র সঙ্গীত আন্দোলনের জটিল অবস্থাটাও অতিক্রম করা যাবে বলে আমার বিশ্বাস।

আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী কথা: আজ শ্রমিকশ্রেণীর বুদ্ধিজীবীদের দায়িত্ব লোকসঙ্গীত সংকলন ও সম্পাদনার ক্ষেত্রে বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের ছাড়িয়ে যাওয়া; অর্থাৎ রাজনৈতিক লোকসঙ্গীতের সংগ্রহ বাড়ানোয় বেশি জোর দেওয়া, যাতে আমাদের গণনাট্য সংঘ এখনও তেমন এগোতে পারেননি, যদিও নেতৃত্বটা তাঁদেরই।

লোকশিল্প সম্পর্কে আর্নেস্ট ফিশারের বক্তব্যও বিবেচ্য। তাঁর মতে—

"Folk songs may have been, in many cases, the result of a retrogressive development—fragments of heroic epics, religious poems or troubadour lyrics converted into popular form."

এ কথা বলেই অবশ্য তিনি মহাকাব্যের উৎস হিসাবে পুরাণ ও লোককথার সেই সামাজিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের উল্লেখ করেছেন যেখানে আজকের অর্থে কোন শাসকশ্রেণী ও তার প্রতিবাদী শক্তি রূপে 'জনগণ' ছিল না। ফিশার বলছেন, লোক সঙ্গীতের কোন নির্দিষ্ট আঙ্গিকের মডেল নেই। যুগে যুগে সামাজিক উপাদানের মিশ্রণ-প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমৃদ্ধও হয়েছে, আবার সস্তা ও

চটুলও হয়েছে। জনগণ তা আত্মস্থ করেছে তার ভাল-মন্দ সব নিয়েই। কাজেই সাধারণত পণ্ডিতদের মনে লোকশিল্প সম্পর্কে যে রোমাণ্টিক অনুরাগ থাকে তারই মাপকাঠিতে লোকসঙ্গীতের বিচার করলে ভুল হবে।

বহুবিচিত্র সামাজিক স্বার্থে ও সাংস্কৃতিক প্রবণতায় গড়া জনগণের মধ্যে আজও একটা সৃষ্টিশীল 'লোক আত্মা' সক্রিয়, এই রকম রোমাণ্টিক ধারণা বুর্জোয়া দুনিয়ার রক্ষাকবচ।

"The possibility of folk art now renewing itself by drawing upon the content and the means of expression of the peasantry and the wandering artisans has become extremly remote. The working class represents a new content and demands new means of exprcssion. New folk songs—'the Marseillaise', 'the Internationale', songs of the partisans in their struggle for freedom—have grown out of revolutionary movements"—*The necessity of Art*, pp. 63—67.

বাংলার ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ও বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ'

বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ'-এর শতবার্ষিকী উদ্‌যাপনকে কেন্দ্র করে সম্প্রতি কিছু বিতর্ক উঠেছে। আনন্দমঠের প্রকৃত সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক মূল্যায়নে আপত্তি থাকার কথা নয়। কিন্তু সাধারণ প্রথামত আমরা এই ধরণের শতবার্ষিকী উৎসবে ঐতিহ্যের প্রাচীনতাকেই উজ্জ্বলতর ও গৌরবান্বিত করি। তা ছাড়া বঙ্কিমের আনন্দমঠ উপন্যাসকে আজ দেশের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশে কতটা তুলে ধরবো, এই নিয়ে যে-কোন গণতান্ত্রিক মানুষ শুধু প্রশ্নই রাখতে পারেন তা নয়, আপত্তিও জানাতে পারেন। কারণ আনন্দমঠ মূলত হিন্দু সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদের উপন্যাস। এর সাহিত্য মূল্যের চেয়ে ঐ বিশেষ রাজনৈতিক ভাবাদর্শগত বক্তব্যটাই প্রধান।

অবশ্য আনন্দমঠকে কেন্দ্র করে সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্রের সামগ্রিক মূল্যায়ন হ'লে জাতীয় সংহতির ক্ষতি ততটা হবার কথা নয়, যতটা আনন্দমঠ উপন্যাসকে গৌরবান্বিত করলে হবার সম্ভাবনা থাকে; কারণ এই উপন্যাসে যতটা ব্রিটিশ-বিরোধিতা রয়েছে বলে অনেকে ব্যাখ্যা করেন, তার চেয়েও বেশি মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষমূলক হিন্দু জাত্যাভিমানের ঘোষণা রয়েছে।

বিগত কয়েক দশকে এ রাজ্যের মননশীল গবেষণায় জাতীয় সাহিত্য ও ইতিহাসের ক্ষেত্রে গণবিদ্রোহী ভারতের যে অতীত উদ্‌ভাসিত হয়েছে, তার পটভূমিকায় আনন্দমঠের স্থান নির্দেশের প্রয়াসে কয়েকটি তথ্য ও সূত্র আলোচনা করছি।

সাঁওতাল (১৮৫৫) ও নীলবিদ্রোহের (১৮৫৮-৬১) একশ' বছর আগে ১৭৬৫ সালে যখন কোম্পানীর দেওয়ানী লাভের বা অর্থনৈতিক ক্ষমতা দখলের ব্যবস্থাদি আইনী হল, তখন ঐ ঔপনিবেশিক শাসনের ভিত্তি গড়ার সূচনাপর্বেই বর্ধমান, নদীয়া, মালদহ, দিনাজপুর, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, রাজশাহী, বগুড়া, রংপুর, ঢাকা ও মৈমনসিং অঞ্চলে নিপীড়িত ও প্রতারিত নিঃস্ব কৃষক ও কারিগরদের জঙ্গী বিদ্রোহী মাদারী ফকির ও দশনামী সন্ন্যাসীরা ব্রিটিশ কোম্পানীরাজের বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী প্রতিরোধ সংগ্রাম করে।

এই গণ-বিদ্রোহ ১৭৬০ থেকে ১৮০৩ সাল পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। সরকারী নথিপত্র, দেশবিদেশের সংবাদ-সাময়িকী ও সমকালের লৌকিক ছড়া ও গাথাকাব্যের নজিরে এই বিদ্রোহের প্রকৃতি ও সংগঠনের যে ছবি পাওয়া গেছে তার সঠিক মূল্যায়নে এবং এই বিদ্রোহের একশ' বছর পরে লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের কল্পশৌর্য, সাম্প্রদায়িক ধর্মীয় দেশপ্রেম, হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদী প্রবণতা, রক্ষণশীল মুরারীভক্ত সন্তানদের ব্রিটিশ রাজভক্তি থেকে এই সিদ্ধান্তই সঙ্গত, আনন্দমঠ আদৌ ব্রিটিশ শাসনবিরোধী ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহের প্রকৃত ঐতিহাসিক বা রাজনৈতিক সাহিত্য নয়।

কেন এই সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব হচ্ছে? কারণ ব্রিটিশ কোম্পানীর ঔপনিবেশিক অর্থনীতির আক্রমণ, 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর', ব্রিটিশরাজের বিরুদ্ধে ফকির-সন্ন্যাসী সহ জমি ও কাজ থেকে উচ্ছেদ হওয়া লক্ষ লক্ষ চাষি-তাঁতিদের বিদ্রোহের ঘটনা, চরিত্র ও সংগঠনের সঙ্গে আনন্দমঠ-এর ঘটনা, ভাবাদর্শ ও চরিত্রগুলি ঐতিহাসিক পরিবেশের প্রতিনিধিত্ব-মূলক প্রতিফলন হতে পারেনি। আনন্দমঠ যতটা বঙ্কিম-সমকালের মধ্যস্বত্বভোগীদের সুবিধাবাদী সংকীর্ণ রাজনীতির (ধর্মীয় ভাববাদে সম্পৃক্ত), ততটা বিদ্রোহী বাংলার ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক সৃষ্টি নয়।

হান্টার সাহেব তাঁর 'দি এ্যানাল্স অব রুরাল বেঙ্গল'-এ বলেছেন—"১৭৬৯-৭০ সালে বাংলায় যে মন্বন্তর হয়েছিল তার বিভীষিকা কাটতে দুই জেনারেসন লেগেছিল···এই ঘটনাই পরবর্তী বছরের ব্রিটিশ ভারতকে ভয়ংকর ভাবে প্রভাবিত করেছিল।" তখনকার গ্রাম্য কবিয়ালের গানেও এই ছবি : 'একচেটে ব্যবসা দাম খরতর / ছিয়াত্তরের মন্বন্তর হল ভয়ংকর / পতি পত্নী পুত্র ছাড়ে পেটের লাগিয়ে / মরে লোক অনাহারে অখাদ্য খাইয়ে।'

১৭৭১ সালে বীরভূমের অফিসার হিগিন্স কোম্পানীর কাউন্সিলের কাছে এক চিঠিতে আবেদন করছেন—"যে হতভাগ্য কয়েকঘর প্রজা এখনও এই মরুভূমিতে গরু ও গৃহসামগ্রী বেচে কোনমতে বেঁচে রয়েছে তাদের খাজনা মকুব করলে মরসুমী চাষটা ভাল হতে পারে। তাতে ঐ খাজনার যে সামান্য ক্ষতি হবে তা পুষিয়ে যাবে।" বলাবাহুল্য ব্রিটিশ কোম্পানী দুর্ভিক্ষাক্রান্ত গরিবদের খাজনা মকুব করেনি।

১৭৩৫ সালে ইংলন্ডের বস্ত্রশিল্পীরা ঢাকার উন্নত বস্ত্রশিল্পের পাশে দাঁড়াতে না পেরে বাংলার তাঁত শিল্পীদের উৎপাদন বন্ধ করে দিতে এবং কেবলমাত্র ইংলন্ডের কাপড়কলের জন্য কাঁচামাল সরবরাহের ব্যবস্থার জন্য

জোর আন্দোলন সুরু করে। এরই জের হিসাবে এবং ইংলণ্ডের শিল্পবিপ্লব সফল করতে ১৭৫৮—৬২ সালের মধ্যে বহির্বাণিজ্যের সাথে যুক্ত বাংলার বস্ত্রশিল্পীদের উৎপাদন বন্ধের অপারেশন সম্পূর্ণ করে এ দেশকে আমদানীর দেশে ও কাঁচামালের বাজারে পরিণত করা হয়েছে। লক্ষ লক্ষ তাঁতশিল্পী বেকার হয়েছে, এ দেশের দুঃসহ খাজনায় শিল্পবিপ্লবের পুঁজি সৃষ্টি হয়েছে, জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে এবং দুর্ভিক্ষ হয়েছে।

১৭৮৭ সালে এই দুর্ভিক্ষের ছোবলে পূর্ববঙ্গের বাখরগঞ্জ জেলা ধ্বংস হয়েছে, ৬০ হাজার মানুষ শেষ হয়েছে। ১৭৯০ সালে ঐ জেলার কালেক্টর ডগলাস সাহেব রেভেনিউ বোর্ডকে লিখছে—'The most dreadful calamity ever remembered the oldest inhabitants of the district.' ১৭৬৫ সালে 'দেওয়ানী' পেয়ে বাংলা-বিহারের ভূমিরাজস্ব ১ কোটি ২৩ লক্ষ থেকে বাড়িয়ে ২ কোটি ২০ লক্ষ টাকা করে নিয়েছিল। সেইসঙ্গে পুরোন মুঘল শাসকদের ও জমিদারদের হটিয়ে নতুন দাদনী ব্যবসায়ী ও মধ্যস্বত্বভোগী বংশ সৃষ্টি করেছিল, যারা ছিল কোম্পানীর রাজস্ব আদায়ের কন্ট্রাক্টর।

এই দুর্ভিক্ষ, মৃত্যু ও ভয়ংকর দুর্দশার পাশাপাশি দিয়েছিল বিদ্রোহ। শের মুতাখ্খেরিণ ও দাবিস্তান সূত্রে জানা গেছে, ফকির-সন্ন্যাসীরা ১৮শ শতকের প্রথম দিকে মুঘল শাসকদের রক্ষিবাহিনীতে যোগ দিয়েছিল। এর জন্য তারা উত্তরবঙ্গ ও বিহারেয় উত্তরাঞ্চলে জমি পেয়েছিল। কোম্পানীর ধ্বংসাত্মক ভূমিনীতি ও রাজস্বনীতি যখন ঐ সব প্রাদেশিক মুঘল শাসকদের, পুরোন জমিদারদের উৎখাত করল তখন তাদের লেঠেল-বরকন্দাজরা হাজারে হাজারে বেকার হয়ে গেল, জমি থেকেও উচ্ছেদ হল। ওরাও বঞ্চনা, অত্যাচার ও দারিদ্রের শরিকানায় লক্ষ লক্ষ নির্যাতিত চাষি ও কর্মহীন দুর্দশাগ্রস্ত গ্রামীণ কারিগরদের কাছাকাছি এসে ক্ষোভে, রোষে ও যন্ত্রণায় ফেটে পড়ল, সংগঠন ও বিদ্রোহ করল, ব্রিটিশ কোম্পানী ও তার নয়া মিত্রশক্তি ধনী দিশি ব্যবসায়ী ও মধ্যস্বত্বভোগীদের বিরুদ্ধে। এরাই প্রচার করেছিল ফকির-সন্ন্যাসীরা 'যাযাবর', 'ডাকাত', 'অত্যাচারী নরপশু' ইত্যাদি। তখনকার নতুন শ্রেণী-অবস্থানে ও স্বার্থের সংঘাতে এটা ভাবাই ওদের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু কোম্পানীর সামরিক কর্তাব্যক্তি ও রাজস্ববিভাগের অফিসারদের বিভিন্ন রিপোর্ট ও গোপন তথ্যাদির নজিরে দেখা যায়, বিশেষ করে 'লঙ্স সিলেকসনস'-এ উদ্ধৃত কোম্পানীর 'সিক্রেট ডিপার্টমেণ্ট প্রসিডিংস' থেকে

১৭৬০, ৬১ ও ৬৩ সালের বর্ধমান, কৃষ্ণনগর, ঢাকা ও রাজশাহীর ইংরেজ কুঠি আক্রমণ-লুণ্ঠন এবং ১৭৬৭ সালে টমাস র‍্যামবোল্ডের পত্রে বর্ণিত পাটনা-কুঠির ঘটনায় ফকির-সন্ন্যাসীদের সামরিক অভিযান এ কথাই প্রমাণ করেছে, ঐ সব 'যাযাবর ডাকাত' বা হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে স্থানীয় নির্যাতীত কৃষক ও তাঁতিদের নিয়ে ইংরেজ সৈন্যদের বিরুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধে হাজারে হাজারে আত্মত্যাগ করেছে এবং ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে সুদূরপ্রসারী অবদান রেখেছে।

প্রচলিত পাঠ্য ইতিহাস গ্রন্থে ১৭৫৭ সালের পলাশীর ও ১৭৬৫ সালের বক্সার যুদ্ধকে ব্রিটিশ-বিরোধী স্বাধীনতা যুদ্ধের উজ্জ্বল নাম বলে খোদিত হয়েছে। কিন্তু ভাড়াটিয়া সৈন্যদের এই যুদ্ধের চেয়ে প্রাক-সিপাহী যুদ্ধ (১৮৫৭) এই দীর্ঘস্থায়ী ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহকে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদ বিরোধী মুক্তি-সংগ্রামের গৌরবময় অধ্যায় রূপে স্বীকৃতি দিতে ভারতের মুক্তি সংগ্রামের প্রকৃত ইতিহাস ঢেলে সাজানো দরকার।

১৭৬৪ সালের ১২ই মে হুগলির ফৌজদার বন্দেল খাঁ এক পত্রে ফোর্ট উইলিয়মের গভর্ণরকে জানাচ্ছেন—নবাব মীরকাশেম, অযোধ্যার নবাব ও পাটনার শাসক বেনীবাহাদুর ফকির-সন্ন্যাসীদের হিম্মতগিরির সাহায্য চেয়েছে। এই তথ্য যামিনীমোহন ঘোষ রচিত 'সন্ন্যাসী এ্যান্ড ফকির রেইডার্স অব বেঙ্গল' গ্রন্থে পাওয়া যায়।

প্রসঙ্গত আরও দু-একটি তথ্য খুবই তাৎপর্যবাহী। ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আগে সাবেকী জমিদাররা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করত, ন্যায়বিচারে উদ্যোগ নিত, অপরাধীর শাস্তি দিত, সকল ধর্মে উৎসাহ দিত, দানধ্যানের মর্যাদা দিত এবং শিল্প-সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করত। স্বভাবতই প্রজাদের সামাজিক জীবনের সঙ্গে যোগাযোগ অনেকটা ঘনিষ্ঠ ও নিয়মিত ছিল। এমনই একজন মুঘল বংশীয় ভূস্বামী বগুড়ার মহাস্থানগড়ের তেজস্বী নায়ক মজনু শাহ ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহে (১৭৭১-৮৭) বিরাট কৃষকবাহিনী পরিচালনা করতেন। খাঁ চৌধুরী আমানতুল্লা আহমদের 'কোচবিহারের ইতিহাস'-এ (সূত্র ঃ সুরজিৎ দাশগুপ্তের 'ভারত ও ইসলাম') উল্লিখিত হয়েছে, মজনু (পাগল) শাহ ছিল ছদ্মনাম। আসল নাম ছিল বাকের মহম্মদ কিংবা বাকের আলি। তখন উত্তর ভারত ছিল মুঘল নামে স্পর্শকাতর ও ঐক্যবদ্ধ। পাছে বাংলার এই বিদ্রোহী বীরের ঘটনা ঐ অঞ্চলেও দাবানল সৃষ্টি করে, এই আশঙ্কায় কোম্পানীর প্রশাসন মজনুর প্রকৃত পরিচয় গোপনই রেখেছিল।

কোম্পানীর বিভিন্ন সামরিক অফিসারের চিঠিপত্র থেকে প্রমাণিত সত্য যে, মজনুর সঙ্গে তথা ফকির-সন্ন্যাসীদের সাহায্যে অসংখ্য সাধারণ কৃষক নানাভাবে সক্রিয় হয়েছিল। মজনুর নেতৃত্বে বিদ্রোহীরা যে শুধু ইংরেজ কুঠি ও শস্যভাণ্ডার লুঠ করেছিল তা নয়, অনেক ধনীর সম্পত্তিও ছিনিয়ে নিয়েছিল। নির্যাতিত কৃষকদের প্রত্যক্ষ ও আঞ্চলিক শত্রু ধনী জমিদারদের গায়ে হাত না দিলে ঐ সব ফকির-সন্ন্যাসীরা কখনই জন-সমর্থন পেত না। ওরা সেই-সেই গ্রাম বা অঞ্চলে অভিযান করত, যে-যে অঞ্চলের ধনীরা ওদের অর্থ-সম্পদ দিয়ে সাহায্য করতে নারাজ হত। স্বভাবতই তাদের অভিযানের সময় সাধারণ প্রজারাও কিছু কিছু ক্ষতির মধ্যে পড়ত।

মজনু শাহ নাটোরের রাণী ভবানীর কাছেও সাহায্য চেয়ে পত্র লেখেন। কিন্তু রাণী তা অগ্রাহ্য করলে ফকির-বিদ্রোহীরা মজনুর নেতৃত্বে ঐ জমিদারী আক্রমণ করে। নাটোরের সাহেব পরিদর্শক রেভেনিউ কাউন্সিলকে এই সময়ে জানিয়েছে, বিদ্রোহীরা সাধারণ মানুষের উপর কোন অত্যাচার করেনি। কৃষকরা বিদ্রোহীদের খাবারের ব্যবস্থা দিয়েছে। তারা কোম্পানীকে কর না দিয়ে সেই টাকায় বিদ্রোহীদের সাহায্য করেছে। সমকালের লৌকিক গাথাতে বলা হয়েছে—'মহাজনের সিন্দুক কাড়ি টাকা লইল ঝাড়া / আগে লুটে বাড়ীঘর পাছে আড়াপাড়া।'

ইংরেজ কুঠি আক্রমণের ঘটনায় ওয়ারেণ হেস্টিংসকে লেখা পার্লিং সাহেবের পত্রে বলা হচ্ছে—

"the ryots gave no assistance but joined the Sannyasies with lathis and showed the Sannyasies those whom they saw had concealed themselves in long grass and jungle and if any of the sepoyes attempted to go into their villages they made a noise to bring the Sannyasies and they plundered the sepoy's firelocks,"

[উদ্ধৃতি সংকলন ঃ ডঃ রণজিৎ সমাদ্দারের 'বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে গণবিদ্রোহের প্রভাব']

উল্লেখযোগ্য যে, মজনু শাহের পর তাঁর সুযোগ্য শিষ্য মুশা শাহ মদর-বস্ক, বিহারের শোভন আলি এবং বাংলার চেরাগ আলি ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহের ঐতিহ্য বহন করেছেন ১৭৯৯ সাল পর্যন্ত। মজনুর সঙ্গে হিন্দু নেতা ভবানী পাঠক ও দেবী চৌধুরাণীর যোগাযোগ ঘটে ১৭৮৭ সালে, যখন তাঁরা এই বিদ্রোহের নেতৃত্বে এসেছিলেন।

প্রশ্ন হল, কেন ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর এই ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ স্তিমিত হয়েছিল ? এর জবাব ব্রিটিশ গভর্ণর-জেনারেল লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক (১৮২৮-৩৫) দিয়েছেন এই বলে—

"If security wanting against extensive tumult or revolution, I should say that permanent settlement, though a failure in many other respects, has this great advantage at least of having created a vast body of rich landed proprietors deeply interested in the continuation of the British Rule and having complete command over the mass of the people."

অর্থাৎ ১৭৬৫ সাল থেকে যে দেশীয় দাদনী ব্যবসায়ী ও মধ্যস্বত্ত্ব-ভোগী মিত্রশক্তি অসংগঠিত ও অস্থির অবস্থায় ছিল ১৭৯৩ সালের পর তাদের সঙ্গে এই নতুন সংগঠিত বিরাট জমিদার-বাহিনী গড়ে তোলা হল, যারা ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ-বিক্ষোভের 'দেশীয় নিরাপত্তা' হিসাবে কাজ করেছে। এমন সব শর্তে তাদের জমিদারী বাঁধা হয়েছিল, যাতে তারা শ্রেণীস্বার্থেই ব্রিটিশ শাসনের রক্ষায় ও প্রসারে সক্রিয় ভূমিকা নিতে পারে। ঘটেও ছিল তাই। মুঘল রাজত্বের জমিদাররা ভূমিরাজস্ব সংগ্রহ করে কমিশন পেত। এবার নির্দিষ্ট উচ্চহারের কোঠা পূরণের জন্য (যা ছিল 'বন্দোবস্ত' থাকার শর্ত) নির্মমভাবে কৃষকদের কাছ থেকে দুয়ে নেবার প্রতিযোগিতা সুরু হয়ে গেল, এতে যাঁরা পুরোন অভ্যাস ও মানসিকতায় 'করুণা' দেখাতেন, তাঁদের জমিদারী নিলামে কেনাবেচা হতে থাকল। একটা নতুন ধরণের দালাল ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায় শেষে এই ব্রিটিশ বন্দোবস্তের বাজার দখল করে নিল।

এ কথা ঠিক, ভারতীয়, বিশেষ করে বাংলার সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের উপর এক সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ'-এর প্রভাব পড়েছিল, যদিও উপন্যাসের 'সন্তান'রা ছিল বৈষ্ণব এবং সন্ত্রাসবাদীরা ছিল মাতৃউপাসক হিন্দু। অবশ্য প্রাচীন হিন্দু ভাবাদর্শে জারিত দেশপ্রেমের আবেগ উভয়তই মিল করেছিল। যাই হোক, এই ঘটনাই প্রমাণ করেনা যে 'আনন্দমঠ' ভারতীয় জাতীয়তাবাদী রাজনীতির মহান সাহিত্যিক মুখপত্র, জাতীয় সাহিত্যের ঐতিহাসিক দর্পণ।

এ কথাও তো ঠিক, ১৯২১—৩০ সালের মধ্যে সন্ত্রাসবাদী দলগুলির বহু বিপ্লবী সদস্যের আত্মসমীক্ষার ফল হিসাবে 'মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা'র সময়ে জেলের মধ্যেই অনেকে কমিউনিস্ট মতাদর্শে রূপান্তরিত হয়েছিলেন ;

অর্থাৎ 'আনন্দমঠ' থেকে 'পথের দাবী' হয়ে গোর্কি'র 'মা' পাঠের প্রভাবই শেষ পর্যন্ত বিপ্লবী চেতনার উত্তরণ ঘটিয়েছে।

যে সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র 'আনন্দমঠ' লেখেন তখনই 'লর্ড রিপণের উৎসবের জমা-খরচ' নিবন্ধে তিনি বলছেন—"আমরা এই উৎসবে লাভ করিয়াছি রাজ-ভক্তি। অনেকে বলিবেন রাজভক্তি ছিল বলিয়াই উৎসব করিয়াছি। তাহা ঠিক নহে। উৎসবেই আমাদের রাজভক্তি বাড়িয়াছে। এই রাজভক্তি জাতীয় উন্নতির কারণ।" আসলে এই উন্নতির সোপান নির্মাণের জন্যই বঙ্কিম আনন্দমঠ এর সন্তানদলের শত্রু হিসাবে বঙ্গদর্শন-এ প্রকাশিত রচনার 'ইংরাজ' কেটে গ্রন্থ প্রকাশের সময়ে 'যবন' করেন।

ঘটনা যে, বঙ্কিমের উপর মিলের উপযোগতত্ত্ব ও কঁতের প্রত্যক্ষবাদের প্রভাবের ফল হিসাবে 'আনন্দমঠ' (১৮৮২) প্রকাশের দুবছর আগে বেরিয়েছিল 'বঙ্গদেশীয় কৃষক' (১৮৭৯) ও 'সাম্য'-এর (১৮৮০) মত প্রবন্ধ। এই ধরণের বস্তুবাদী রচনা সম্পর্কে পরে বলছেন—"সাম্যটা সব ভুল। বিক্রি হয় বটে। কিন্তু আর ছাপাব না।" অতএব এবার চাই ব্রিটিশ-শাসনের পক্ষে সওয়ালের উপযোগী রক্ষণশীল হিন্দুর ধর্ম-সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবোধ, মুসলমান-বিদ্বেষী সংকীর্ণ মনোভাবের 'বিশুদ্ধ কথাশিল্প—'আনন্দমঠ-দেবী চৌধু-রাণী-সীতারাম'-এর মত জাতীয় সাহিত্য! একই সময়ে 'ধর্মতত্ত্ব' গ্রন্থে রাজনীতির সঙ্গে প্রজাভক্তির মিল ব্যাখ্যা করে উপদেশ দিয়েছেন—'লর্ড রিপণের সময়ে যেরূপ উৎসাহ ও উৎসবাদি হইয়াছে, সেইরূপ অন্যান্য সদুপায় দ্বারা রাজভক্তি অনুশীলিত করিবে।'

এইভাবে 'আনন্দমঠ' রচিত হল, দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' লেখার বারো বছর পর, অর্থাৎ মন্বন্তরের ও ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহের একশ' বছর পরে। বঙ্কিমভ্রাতা পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পত্র থেকে জানা যায়, ছোটবেলায় শোনা ঐ বিদ্রোহের স্মৃতি নির্ভর ক'রে যখন এই উপন্যাস লেখেন, তখন সারা দেশ ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ-গর্ভ। পাঞ্জাবের ভগৎ সিং ও মহারাষ্ট্রের বলবন্ত ফাদকের নেতৃত্বে সশস্ত্র কৃষক ও জঙ্গী যুববিদ্রোহ, দিকে দিকে ইলবার্ট বিলের বিরুদ্ধে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের জাতীয় মর্যাদা রক্ষার আন্দোলন, সম-কালের ইতালীয় মডেলে গুপ্ত সংঘের তৎপরতা, সুরেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র পাল ও সুন্দরীমোহন দাসের গোপন সংগঠনের কার্যকলাপ, শিবনাথ শাস্ত্রীর গৃহাঙ্গনে 'ব্রিটিশ দাসত্ব উচ্ছেদ'-এর অগ্নি-শপথ ইত্যাদি ঘটনায় তখন উত্তাল ভারত। এরই পাশাপাশি নয়া জমিদারদের উত্তরসাধক মধ্যস্বত্বভোগী ও

কুশীদজীবী প্রভাবশালী অংশের সনাতন হিন্দু ভারতের পুনরুজ্জীবনবাদী সাংস্কৃতিক আন্দোলন 'হিন্দুমেলা' ও 'আর্যসমাজ' জোর কদমে চলেছে। এরই সাহিত্যরূপ 'আনন্দমঠ'। এতে দেশপ্রেম রয়েছে, কিন্তু তা হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদী ও সাম্প্রদায়িক। কখন? যখন ১৮৫৩ সালে বোম্বাইয়ে প্রথম সুতাকল স্থাপিত হওয়ার পর শ্রমিকের সংখ্যা এবং ১৮৮০ সালে কলকারখানার সংখ্যা বিপুলভাবে বেড়ে যাওয়ার ফলে শ্রেণীবিরোধও বেড়েছে, যখন শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে গ্রামবাংলায় চব্বিশবার দুর্ভিক্ষ এবং প্রায় সেই অনুপাতে কৃষক বিদ্রোহের ঘটনা বেড়েছে; অর্থাৎ সারা দেশ যখন 'বিপ্লবী অভ্যুত্থানের দ্বারপ্রান্তে' এসেছে সেই সময়েই 'আনন্দমঠ'-এ সনাতন হিন্দু ভাবাদর্শের জয়ধ্বনি অনুরণিত হল এবং তারই স্বাভাবিক রাজনৈতিক অভিব্যক্তি রূপে তিন বছর পর জাতীয়তাবাদীদের আপোষকামী ও সুবিধাবাদী মঞ্চ 'জাতীয় কংগ্রেস'-এর (১৮৮৫) জন্ম হল।

অথচ আমরা লক্ষ্য করেছি, এই আনন্দমঠ-এর পাঁচ বছর আগে ১৮৭৭ সালে 'বঙ্গদর্শন'-এর পাতাতেই 'সমাজ পরিবর্তন কয় প্রকার' প্রবন্ধে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখেছেন—"হিন্দুসমাজ কতকেলে সমাজ যে তাহার ঠিকানা নাই। ইহার বনিয়াদ অতি সংকীর্ণ : মনুর সংহিতায় দেখিতে পাই ·ভারতের অর্ধেক মুসলমান হইয়াছে। ইংরাজরা সর্বশক্তিময়ী ডানা বিস্তার করিয়া সকলকে চাপা দিয়া রাখিয়াছে; হিন্দুর জাঁকটুকু ছাড়া আর কী বা আছে? এখনও কিনা আমরা হিন্দুসমাজকে ভারতসমাজের সঙ্গে এক করিয়া দেখি! কী ভুল! এমন হিন্দুসমাজের যত শীঘ্র সম্ভব বিলোপ হয়, ততোই ভাল।"

এবার দেখা যাক, বঙ্কিমের 'আনন্দমঠ'-এর জয়গানে মুখর আজকের তথাকথিত রবীন্দ্র-বিশেষজ্ঞ প্রমথনাথ বিশী মহাশয়ের বক্তব্য—"ভাব শিল্পীর, রূপ সকলের। দেশ একটি ভাব, দেশের মাতৃমূর্তি শিল্প, সে শিল্পে সকলের অধিকার। দেশ একটা এ্যাবস্ট্র্যাকসন বা নির্গুণ সত্তা হিসাবে মনীষীগণ ধারণা করতে পারে, কিন্তু যতক্ষণ তা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য শিল্পবস্তু না হয়ে ওঠে ততক্ষণ জনসাধারণের অতীত। দেশকে ধারণা করবার উদ্দেশ্যে বঙ্কিমচন্দ্র 'সপ্তকোটিকে' আহ্বান করেছেন—ত্বং হি দুর্গা।" সন্তানদলের অধিনায়ক মহাপুরুষ জেনারেল সত্যানন্দকে এই মাতৃমূর্তি হিমালয়ের শিখর থেকে দেখতে আহ্বান জানালেন তখনই যখন মুসলমান নবাবী রাজত্বের অবসান ঘটিয়েই ঐ দুর্গামাতার সন্তানেরা ইংরেজ বণিকদের হাতে রাজ্য শাসন দিয়ে 'লোকের শ্রীবৃদ্ধি' কামনা করেছে। মহাপুরুষ

সত্যানন্দের হাত ধরেছে, অর্থাৎ ঐ 'জ্ঞান আসিয়া ভক্তির হাত ধরেছে, ঐ ভক্তি ব্রিটিশ রাজভক্তি। বঙ্কিম 'ভারত কলঙ্ক ঃ ভারতবর্ষ পরাধীন কেন' প্রবন্ধে বলেছেন—"ইংরেজ ভারতবর্ষের পরমোপকারী। ইংরেজ আমাদের অনেক নতুন কথা শিখাইতেছে।" কি নতুন কথা? উপন্যাসের ৪র্থ খন্ড ৮ম পরিচ্ছেদে বলেছেন—"ইংরেজ রাজা না হইলে সনাতন হিন্দু ধর্মের পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা নাই।" লক্ষ্য করার মত, বঙ্কিম ইংরেজদের পাশ্চাত্য শিক্ষা চেয়েছেন। আবার হিন্দুর সনাতন ধর্মের পুনরুদ্ধারও চেয়েছেন এবং মুসলমান শাসন ও সংস্কৃতির উচ্ছেদ চেয়েছেন। এইখানেই তাঁর স্ববিরোধ ও শ্রেণী-সম্পর্কের দ্বন্দ্ব। বুর্জোয়া এনলাইট্‌নার হিসাবে পাশ্চাত্য শিক্ষা চাইছেন, আর হিন্দু মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণী স্বার্থে ধর্মীয় ঢাল-তলোয়ারও চাইছেন। তাছাড়া তিনি যে-পাশ্চাত্য দর্শনের ভক্ত তা ছিল পচনশীল বুর্জোয়া ব্যবস্থার বার্কলে-ম্যাকসমুলারের 'যুক্তিবাদ' যাতে বিজ্ঞানেরও আধ্যাত্মিকীকরণ ঘটে গেছে ; তা রামমোহন-বিদ্যাসাগর অনুসৃত বেকনীয় যুক্তিবাদ ছিল না।

আরও একটি কথা। অনেকে যে বলেন, রাজরোষজনিত কৌশলগত কারণে বঙ্কিম 'ইংরেজ' কেটে 'যবন' করেছেন, এই যুক্তি টেঁকে না। প্রশ্নটা শুধুই ঐ কাটাকুটির নয়। উপন্যাসের নানা ঘটনা ও সংলাপে ছড়িয়ে রয়েছে ব্রিটিশপ্রীতি ও মুসলমানবিদ্বেষ। যেমন, 'কাপ্তেন সাহেব, তোমায় মারিব না, ইংরেজ আমাদিগের শত্রু নহে। কেন তুমি মুসলমানের সহায় হইয়া আসিয়াছ?' (১ম খণ্ড, পৃ—৭৭১)। 'ভগবানের নিয়োগ ওয়ারেণ হেস্টিংস কলিকাতায় গভর্ণর জেনারেল' (এ পৃ—৭৭৯)। 'হরে মুরারে। উঠ। মুসলমানদের বুকে পিঠে চাপিয়া মার' (ঐ পৃ—৭৮৪)।

কেউ কেউ বলার চেষ্টা করেছেন, এ সব বঙ্কিমের নিজের কথা নয়, উপন্যাসের চরিত্রের। 'আনন্দমঠ' প্রকাশের দুবছর পর (১৮৯৪) সমকালের বিশিষ্ট সমালোচক চন্দ্রনাথ বসু রবীন্দ্রনাথকে এক পত্রে 'হিন্দুর জীবন ধর্মময়, সকল হিন্দুই এক ছাঁচে ঢালা' বলে সওয়াল করে মন্তব্য করেছেন—'আনন্দ মঠের কবি ও আনন্দমঠ উভয়কেই বঙ্গের সর্বোৎকৃষ্ট আইডিয়াল বলিয়া আমার মনে হয়।' উল্লেখযোগ্য যে, বঙ্কিম তাঁর হাতে লেখা এই উপন্যাসটি বন্ধু চন্দ্রনাথ বসুকে পড়ে শোনান।

বঙ্কিমের মানসগঠনে এই উগ্র হিন্দুত্বের বীজ বারো বছর আগেই অঙ্কুরিত হয়েছিল। ১৮৬৮-৯ সালে রচিত 'মৃণালিনী' উপন্যাসে মাধবাচার্য

ও মগধের হিন্দু রাজপুত্র হেমচন্দ্রের সংলাপে শুধু ব্রিটিশ রাজভক্তিই নয়, সেইসঙ্গে যবনদের প্রতি ঘৃণাও প্রকাশ পেয়েছে। এই মাধবাচার্যই পরবর্তী-কালের সন্তানদলের সত্যানন্দ হয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ যাঁকে 'যাদুকর' বলেছেন। মাধবাচার্য গণনা করে দেখেছেন—যবনরাজ্যের ধ্বংস সুরু হবে বঙ্গ থেকে। শুধু তাই নয়। যখন পশ্চিম দেশীয় বণিকগণ বঙ্গরাজ্যে অস্ত্রধারণ করবে, তখনই এই শুভ সূচনা হবে। রাজপুত্র হেমচন্দ্র যখন বললেন, আমি তো বণিক নয়, আমার দ্বারা কি হবে? গুরু জবাব দিয়েছেন—তুমিই সে বণিক। তুমি অস্ত্রধারণ করলেই যবন নিপাত হবে।

এবার আমার প্রশ্ন, আজ ১৯৮৩ সালের সূচনায় যাঁরা এই পশ্চিমবঙ্গে 'আনন্দমঠ'-এর শতবার্ষিকী উৎসব পালনে উৎসাহী, তাঁরা জাতির কোন্ ঐতিহ্যকে গৌরবান্বিত করতে চান? সংঘাতের না সংহতির? শিকল দেবীর, না শিকল ভাঙার?

সেকালের গ্রামসমাজ ও 'গোবিন্দ সামন্ত'

বাংলায় 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর'-এর আগে থেকেই গ্রামসমাজের স্বনির্ভর কৃষি-অর্থনীতি ভেঙে পড়েছে। খাদ্যশস্য, কুটিরশিল্প ও লোকশিক্ষার সমস্ত গ্রামীন ভিত্তি খতম হবার পর যে বণিকী পুঁজি থেকে শিল্প-পুঁজিবাদের অবাধ বিকাশ হবে তারও জো রাখেনি ব্রিটিশ কোম্পানীর রাজশক্তি। কারণ জমির চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের নয়া সামন্ততান্ত্রিক জোয়ালে বেঁধে এ দেশের কোটি কোটি টাকার খাজনায় ইংলণ্ডের শিল্পবিপ্লবের ইমারত গড়েছে ; ভারতীয় জনগণের সার্বিক পশ্চাৎপদতা জিইয়ে রেখে এখানকারই সস্তা শ্রমে, দাদনী-মহাজনী অর্থে ও ব্রিটিশ পণ্যের জন্য কাঁচামালের ও বিলাতি পণ্য বিক্রয়ের বাজার সৃষ্টি করে ঔপনিবেশিক শোষণের ঘর-সংসার গুছিয়ে নিল ব্রিটিশ শাসক ; অর্থাৎ গোটা দেশকে ধ্বংস ও আত্মিক অবক্ষয়ের আবর্জনায় ডুবিয়ে দিল। রজনীপাম দত্ত তাঁর 'ইণ্ডিয়া টুডে' গ্রন্থে বলেছেন—

"In this way, India was forcibly transformed, from being a country of combined agriculture and manufactures, into an agricultural colony of British manufacturing capitalism. It from this period of British rule, that originates the deadly over-pressure on agriculture in India, which is still blandly described in official literature as if it were a natural phenomenon of thc old Indian society,"

এই ঘটনার সাহিত্যচিত্র এই রকম : কলকাতার হিন্দু মুৎসুদ্দি ডাকু বাবুর হৌস থেকে সাহেবরা মাল কেনে এবং তারই কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে সাহেবের অফিস চলে। অর্থাৎ ডাকুবাবু সাহেবের চাকর নয়। কিন্তু সাহেবরা রাজশক্তি বলে এবং দেশের লোকের ক্রয়ক্ষমতা শূন্যের কোঠায় নেমে গেছে বলে ডাকুবাবু সাহেবের ভয়ে কাছাখোলা—'ডাকুবাবু যদিও সাহেবের চাকর নন, বাবুর টাকায় সাহেবের আপিস চলে তথাপি বাবু হাঁপাতে হাঁপাতে মাল তদারক করতে চললেন' (সচিত্র গুলজার নগর'—কেদারনাথ দত্ত), কারণ সাহেব অভিযোগ করেছে পাঁচ পার্সেন্ট সওদায় আট পার্সেন্ট খাদ বেরিয়েছে।

এই শহুরে মুৎসুদ্দি-মোসাহেবদের মত গ্রামেও বন্দোবস্তীয় পুষ্যি নায়েব গজাননের দেখা মিলেছে সেকালের চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জটাধারীর

রোজনামচা' নকশাচিত্রে। পুরোন বাদশাহী বাজেয়াপ্ত করার সময়ে যে শত্রুতা করেছিল নদীয়ার মোগলাই পুষ্যি সিংহবাবুরা, তার স্মৃতিচারণ করে সাহেব কোম্পানীর দালাল গজানন সাহেব দারোগাকে তাতিয়ে বলছে—

"দাঙ্গা করিয়া, লাঠি চালাইয়া, সড়কি মারিয়া সেই বাদশাহী জায়গীর গ্রাম সমস্ত বাজেয়াপ্তির সময় আমাদের কি না কষ্ট দিয়াছে ? ভুলে গেলেন, হে মহাশয় অল্পদিনে সব ভুলিলেন ! একটা পাক লাগান—দুটো মোচড় দিন—অমনি অমনি যাবে, ওরা যে এ সরকারের চিরশত্রু—চালান না করিলে আমরা মহাশয়কে ছাড়িব না।"

একাধারে নতুন জমিদার ও দাদনী ব্যবসায়ী আশুতোষবাবুর কাছে নীলকর সাহেব এসেছে পত্তনী নিতে, কুঠি খুলতে, রেশমের কারবারে সাহায্য নিতে। জমিদার খাতির ক'রে কিভাবে সব ব্যবস্থা ও আশ্বাস দিয়ে সাহেবকে সন্তুষ্ট করলেন তার ছবি ঃ

"উভয়ে নানা বিষয়ে কথা হইল ; পত্তনী লইবেন, নীলকুঠি খুলিবেন, রেশমের কারবার আরম্ভ হইবে। আশুতোষ বাবুর নিকট কেবল বিংশতি সহস্র মুদ্রা ঋণের প্রার্থনা রাখেন, তাহা দিতেও আশুতোষবাবু সম্মত হইলেন, বিষয়কার্য প্রায় শেষ হইল। আমি জানিলাম ইনিই বাবুমহাশয়ের পরমবন্ধু ইটুয়াল সাহেব।…কার্য্য শেষ করিয়া ২০ হাজার টাকার হুণ্ডি পকেটে ভরিয়া অগণিত ধন্যবাদ দিতে দিতে সাহেব বাহাদুর দাঁড়াইলেন ও হস্ত প্রসারিয়া বাবু মহাশয়ের করাবলম্বন করিয়া কহিলেন, 'নগরে গমন হইলে আবার সাক্ষাৎ হইবেক।' সঙ্গে সঙ্গে অশ্বারোহণ করিলেন চারি দিকে সেলামের ধুম পড়িয়া গেল।" শহর ও গ্রামের এই ছবি যথাক্রমে ১৮৭১ এবং ১৮৮৩ সালে রচিত কথাসাহিত্যে ফুটেছে। স্বভাবতই এই ছবি লেখকদ্বয়ের স্মৃতি ও অভিজ্ঞতার বাস্তব প্রতিফলন রূপেই এসেছে।

বলে নেওয়া ভাল, ব্রিটিশ শাসনের প্রতি সমর্থনের প্রশ্নে তখনকার নতুন জমিদার ও মধ্যবিত্তদের সকলের ভূমিকা এক ছিল না। রামমোহন-বিদ্যাসাগর-অক্ষয় দত্তদের সমর্থন ছিল পাশ্চাত্য যুক্তিবাদী শিক্ষার আকর্ষণে, আর এই আশুতোষবাবু, ডাকুবাবু ও গজাননদের সমর্থন ছিল যে সম্পূর্ণ বৈষয়িক স্বার্থে, এটাও বুঝে নেওয়া দরকার ; নইলে অতীত ঐতিহ্য সম্পর্কে একটা হতাশার রোগে ধরতে পারে।

বর্ধমানের সোনাপলাশী গ্রামের ইংরাজী শিক্ষিত মিশনারী রেভারেণ্ড লালবিহারী দে তাঁর 'গোবিন্দ সামন্ত' উপন্যাসের (১৮৭১) ভূমিকায় বলছেন

—এতে রাজা-মহারাজদের বিস্ময়কর কাহিনী নেই। রাজার দশটা মাথা, কুড়িটা হাত আর বানর সূর্য হাতে আকাশ দিয়ে উড়ে যাচ্ছে, এইরকম কল্প দৃশ্য পাবেন না। এতে প্রেমদৃশ্য. বাগাড়ম্বর, উপমা-অলংকারের পসরা সাজাতেও চাইনি। বড় চিন্তাশীলরা বড় বড় শব্দ চায়; কিন্তু আমরা সাধারণ মানুষ চাষ-আবাদের কথা বলি, বড় শব্দ দরকার হয় না। যে সব পাঠক 'হুগলির পাহাড় আর ২৪-পরগণার পর্বত' নিয়ে গুরুগম্ভীর কবিতা চান, তাঁরা আমার এই রচনা পড়ে হতাশ হবেন।

বর্ধমান শহর থেকে ৬ মাইল উত্তর-পূর্বে সাহাবাদ পরগণার একটি গ্রাম কাঞ্চনপুর। বেশি সদগোপ বা কৃষিজীবীর বাস। কেউ বলে, কৃষকদের অনেক শস্য (সোনার ফসল) ছিল, কেউ বলে সুবর্ণবণিকদের বাস ছিল। তাই নাম কাঞ্চনপুর।

এই গ্রামের কৃষক পরিবারে গোবিন্দ সামন্তর জন্ম। দাপটের জমিদার জয়চাঁদ রায়চৌধুরীর ধর্মপুত্তুরের বিবাহ। রায়ত প্রজাদের টাকায় ২ আনা অথবা ৪০ টাকা খাজনার ৫ টাকা 'মাথোট' দিতেই হবে। মহাজনের কাছে সুদের টাকা, জমিদারের খাজনা যতই বাকী থাকুক, ভিক্ষে করেও ঐ মাথোট দিতে হবে।

গাঁয়ের সব গরিব কৃষক-কারিগর 'পলিটিক্স এ্যাট দি সমিতি'তে (গ্রামের পঞ্চায়েত নয়) বসে বলল—জমিদারের ছেলের বিয়ে তো আমাদের কি? এটা লজ্জার যে গরিবরা এইভাবে পড়ে পড়ে মার খাবে।

গোবিন্দ মাথোট দিতে অস্বীকার করলে পেয়াদা হনুমান সিং ধরে নিয়ে গেল কাছারী। জমিদার অবাক—'আমার রাজ্যে এমন কেউ আছে যে মাথোট দিতে অস্বীকার করার সাহস পায়! তোর বাপ্ বদন সামন্তর মত বাধ্য প্রজার ছেলে হয়ে তুই এই বেয়াদপি করছিস?' দেওয়ান জানায় গোবিন্দ কয়েক বছর পাঠশালায় পড়েছে। জমিদার বোঝেন পণ্ডিত হয়েছে, চোখ খুলেছে। অতঃপর তিনি ওর পা ভেঙে দেবার নির্দেশ দিলে গোবিন্দ বলে—আমি দোব না বলিনি। আমি শুধু বলিছি, আমার দেবার ক্ষমতা নেই। আমার ঠাকুরদা আর বাবার শ্রাদ্ধ কম্মে অনেক ঋণ হয়েছে। যখন আবার ক্ষমতা হবে মাথোট দোব।

সমিতির জল্পনায় কেউ বলেছিল, জমিদারের লাঠি আছে, অর্থ-প্রতিপত্তি আছে। আমরা গরিবরা দাঁড়াবো কিসে! নন্দ বলেছিল, এক ঘুষিতে জমিদারের মোটা দেহ মাটিতে শুইয়ে দোব। গোবিন্দ সাবধান করেছিল,

চারিদিকে চর আছে। নন্দ—'আমি ভয় পাই না। একদিন ব্রাহ্মণরা পৈতে ছুঁয়ে শপথ নিয়েছিল। আজ আমাদের সবার হাড় শোষণে গুঁড়িয়ে গেছে। আজ আমরা সবাই ধর্মঘট করে বলতে পারি—দোব না মাথোট।'

বোকারাম বুদ্ধি ফলায়—জমিদার আমাদের নিয়তি। নিয়তির বিরুদ্ধে ওসব ধর্মঘট-ফর্মঘট করলে আমরা শেষ হয়ে যাব।

ওদের সভায় কোম্পানী বাহাদুর ও জমিদারকে নিয়েও কথা হয়। কেউ বলে, সদর জমা ঠিক থাকলেই জমিদারী; নইলে ক্রোক করবে। কেউ বলে, কোম্পানীর সাহেবরা দয়ালু। ওরা কি জমিদারদের এইভাবে অত্যাচার করতে দেবে! কেউ বলে, কিভাবে আদায় হচ্ছে তা ওরা দেখে না। আদায় জমা পড়লেই হল।

গোবিন্দর খুড়ো কালোমানিক মাঠে কাজ করছে। হনু সিং ডাক দেয়। জবাবে কালোমানিক বলে—'আমি ওঁর চাকর নই যে ডাকলেই যেতে হবে। আমি এখন জমিতে জল দিচ্ছি। এখন সময় নেই কাছারি যাবার।

হনুমন্ত—'চলো না তোমায় তো খেয়ে ফেলবে না।' কালো—'হ্যাঁ, খেয়ে হজম করতে পারবে না। কিন্তু আমি ও রকম অনেক জয়চাঁদ খেয়ে হজম করতে পারি। যাও, এ কথাটা প্রভুকে গিয়ে বলো।'

কালোমানিক জমিদারকে খুন করবে সংকল্প নিলে বৃদ্ধ চাষি বোঝায়—তাতে আমরা সবাই জড়িয়ে পড়বো। সবার ঘরই ভাঙবে। সবার ঘরেই আগুন লাগাবে।

গোবিন্দদের ঘরে আগুন দিল জমিদারের ভাড়াটিয়া লেঠেল সর্দার ভীম। আবার ঘর গড়তে গোবিন্দ গেল মহাজন গোলোক পোদ্দারের কাছে।

মহাজন জানে জমির সঙ্গে সম্পর্ক রাখলে সর্বস্ব যায়, যেমন গোবিন্দর গেল। তাই সে সোনারুপোর কারবার করে, আর করে সুদের ব্যবসা। মহাজন সহানুভূতি দেখিয়ে ঠিকমত শুধতে পারবে কিনা বুঝে ধার দেয়।

A raiyot's debt to the Planter descends from generation to generation.

গ্রামে গ্রামে নীলকর সাহেবরা—কম্বল (ক্যাম্বেল), লালমোহন (লার্মার), সুবল (সিবাল্ড), বরুণ (বার্নি) মুস্কিল (মাস্কলিস) এবং বলদ (বণ্ডউইল) সাহেবরা রায়ত ও জমিদারদের নীল বোনার জন্য দুরকমের দাদন বা অগ্রীম দিচ্ছে। এই দাদন নেওয়া প্রায় বাধ্যতামূলক।

নিজবাদ দাদনে নীলকর নিজের জমিতে, জমিদার তার নিজের জমিতে নীল চাষ করবে। আর রায়তী দাদনে কৃষকরা অগ্রীম টাকা নিয়ে নিজেদের জমিতে নীল বুনে ফ্যাক্টরী দরে বেচবে।

মাধব জমিতে চাষ করছে। ইষ্ট ইন্ডিয়া ইন্ডিগো কোম্পানীর ম্যানেজার জন মুরে ঘোড়ায় চড়ে যেতে যেতে তাকে ডাকে। এই জমিতে নীল বুনতে হবে। মাধব বলে, নীল বুনলে ছেলেপুলে সম্বচ্ছর খাবে কি হুজুর।

সাহেব চাবুক ঘুরিয়ে বলে, কুঠিতে এসে দাদন নিতে হবে। যে টাকা এর আগে ধার আছে তা নীল বুনে শুধতে হবে।

দুর্গানিগরের তরুণ জমিদার রাজা নবকৃষ্ণ ব্যানার্জী হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন। তিনি নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর জমিতেও নীলের ছোবল পড়েছে।

জন মুরে দুর্গানিগরের বেয়াদপ রায়তদের শায়েস্তা করতে অগ্নিশর্মা। নবকৃষ্ণ তাদের রক্ষায় উদ্যোগ নিয়েছেন। শত্রুমিত্র মুখোমুখি।

মাধব পরামর্শ চায়—'বল মুরুব্বি, এই আপৎকালে কি করা যায়। আমাদের দয়ালু রাজা আমাদের বাঁচাতে দাঁড়িয়েছেন।' দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় পোড় খাওয়া বৃদ্ধ চাষি বলে—'কিন্তু শেষে দেখো, তিনিও আমাদের বাঁচাতে পারবেন না। সব টুপিওয়ালাই ভাই-ভাই। উকিল-বিচারক সবাই ঐ শাদা-চামড়ার ভাইদের দিকে।'

তবু মাধব প্রশ্ন করে—'তাহলে তুমি কি বলতে চাও, মারি সাহেবের দাদন নিতে, আর আমৃত্যু নীল বুনে যেতে?'

গ্রাম ফুঁসছে—'মারি শালাকো মারো, এটাই আমাদের মরণপণ।' কিন্তু বৃদ্ধ চাষি অনেক দেখেছে। এইসব কথার পাহাড়ে ন্যায় নেই।

অতঃপর মুরে সাহেব ভাড়াটিয়া সড়কিওয়ালা আর নিজের বন্দুক নিয়ে গ্রাম আক্রমণ করে। তার লক্ষ্য খুন, ঘরে আগুন বা লুঠপাট নয়—তার মূল উদ্দেশ্য চাষিদের দাদনে বশ করা। এইখানেই কাঞ্চনপুরের জমিদারের সঙ্গে নীলকর সাহেবের তফাৎ।

এদিকে কাঞ্চনপুরে কালোমানিক খুন হয়েছে। নব্বই টাকা মিথ্যা দেনার খতে গোবিন্দকে সর্বস্বান্ত করেছে ব্রিটিশপোষ্য জমিদার। সব সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হলে গোবিন্দ শহরে এসে মজুর (কুলি) হয়েছে।

কিন্তু জমির সঙ্গে পুরুষানুক্রমে তার অনুভূতি তিলে তিলে যেভাবে

সংস্কারে রূপান্তরিত হয়েছে, তাতে নতুন মজুর জীবনের নির্মম বাস্তবতার সঙ্গে সে বেশিদিন খাপ খাওয়াতে পারেনি। শরীরে ও মনে ক্ষয়ে ক্ষয়ে অল্পদিনেই গোবিন্দর মৃত্যু হল।

গোবিন্দ সামন্তর মৃত্যু হল না। সামন্ততন্ত্র ও ব্রিটিশ বণিকতন্ত্র তার মৃত্যু ঘটালো। প্রতিবাদী কালোমানিক খুন হল মানেই সে শহীদ হল। মাধব সহ সংগ্রামী কৃষকদের ঘর ভাঙলো, অথবা বাধ্য হয়ে জুলুমের যাঁতাকলে নীল বুনতে লাগলো মানেই আরও ব্যাপক প্রতিরোধের বারুদ জমা হতে থাকল। অর্থাৎ এই বাধ্যতার সঙ্গে গোবিন্দর বাবা বদন সামন্তর 'বাধ্য প্রজা' থাকার তফাৎ বোঝা যায়। এরই মধ্যে বৃদ্ধ চাষি মুরুব্বির 'জমিদারের লাঠি ও অর্থ-প্রতিপত্তি'র সঙ্গে লড়াইকে বোকামি ভাবার বাস্তবতাও যে ঐতিহাসিক, তা-ও বোঝা যায়।

চাষির ছেলে গোবিন্দ দু-চার বছর পাঠশালায় পড়লে জমিদার জয়চন্দ্রের উদ্বেগ হয়। কারণ গরিব কৃষক প্রজার অজ্ঞতা-অন্ধতাই সামন্ততান্ত্রিক শোষণের হাতিয়ার। বুর্জোয়ারা তবু প্রয়োজনমত কিছু শিক্ষা দিতে বাধ্যও হয়।

এই উপন্যাসে অত্যাচারের আইনী ও দৈহিক হাতিয়াবের প্রয়োগগুলিই দেখানো হয়েছে। সামন্ততান্ত্রিক বা নতুন বণিকী ঔপনিবেশিক ধর্মীয় সংস্কৃতির ও অবক্ষয়ী ভাবধারার হাতিয়ারগুলি নির্দেশিত হয়নি। তাছাড়া এটি যত বেশি বাংলার কৃষি-অর্থনীতির রেখাচিত্র, সংগ্রামী কৃষকের বহিরঙ্গ জীবনের পরিচয়জ্ঞাপক এবং জমিদার-নীলকর সাহেবদের অর্থনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক কার্যাবলীর দলিল, ততটা উপন্যাসশিল্প হতে পারেনি, কারণ কি অত্যাচারিত, কি অত্যাচারী—কোন পক্ষেরই অন্তরঙ্গ ভাব-সংঘাত এবং পারিবারিক ও ব্যক্তিচরিত্রের দ্বন্দ্ব-সংশয়ের রূপ দেখানো হয়নি। মনে হয়, খ্রীশ্চান শিক্ষক লালবিহারী গ্রামের পথে ও মাঠে-ঘাটে যে সব ঘটনা ও বহিঃপ্রকাশ প্রত্যক্ষ করেছেন, নিজের ঐতিহাসিক বিচারবোধ পর্যবেক্ষণের সহজ প্রতিভা দিয়ে সহজ সরল ভাবে তা উপস্থাপিত করেছেন।

মনে হয়, ভাবাবেগ-প্রধান আর একটি 'নীলদর্পণ' রচনার আগ্রহ তাঁর ছিল না। তাহলে রাজা নবকৃষ্ণ বাঁড়ুয্যেদের পারিবারিক ট্রাজিডি, কালোমানিক বা গোবিন্দদের ঘর-সংসারের অসহায় করুণ ছবি সাধু-রাইচরণদের মত করেই আঁকতেন। নীলদর্পণ-এর আমীন বা পদী ময়রাণী তো তখন সব গাঁয়েই আখচার পাওয়া গেছে! আর তর্কালংকার-শিরোমণি-মৌলভীরাই

বা তখনকার গ্রাম-সমাজের ভাব-সংঘাতে বাদ যাবে কেন ? লক্ষণীয় যে, মুরে সাহেবের পৈশাচিক দাপট ফুটেছে, কিন্তু রোগ সাহেবের মত, ক্ষেত্রমণি বা নারীধর্ষণের মত কোন ঘটনা লালবিহারীর নজরে আসেনি অথবা হিন্দু-মুসলমান চাষি-তাঁতিদের সাম্প্রদায়িক ঐক্যের ছবিটা উপন্যাসে এল না। বলাবাহুল্য, তৎকালীন গ্রাম-সমাজের সামগ্রিক রূপের স্বার্থেই এই দিকগুলি কাঙ্খিত ছিল।

অথচ একাধারে সামন্ততান্ত্রিক শোষণ ও সাম্রাজ্যবাদী নীলকরদের শোষণের যে ছবি এবং তার পাশাপাশি অত্যাচারিত কৃষক ও জমিদারদের ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ-প্রতিরোধের মেজাজ এই রচনায় ফুটেছে তার কারণেই 'গোবিন্দ সামন্ত'কে বাংলার গণ-সাহিত্যের কেবল সূচনা বললেই সব বলা হয় না, সূচনাতেই এমন উন্নত মানের আর্থ-রাজনৈতিক দলিলও বিশ্বসাহিত্যে দুর্লভ বলা চলে।

প্রখ্যাত মার্কসবাদী সমালোচক সৈয়দ শাহেদুল্লাহ তাঁর 'মাতৃভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে যথার্থই বলেছেন—আদিতে জমিতে কৃষক প্রজার স্বত্ব ছিল। পলাশীর দুশো বছর আগে থেকেই ভাঙন সুরু হয়েছে। পশ্চিমী বণিকদের সঙ্গে আদান-প্রদানে, ইউরোপে মূল্যবান ধাতুর ছোঁয়ায় (আমেরিকা থেকে লুঠ করা) বিলাসদ্রব্যের চাহিদা যত বাড়ল, ভারতের রপ্তানীবৃদ্ধি ঘরে এনে দিল সোনা-রূপোর জাহাজ এবং এগুলি এল বড় বড় সামন্তরাজ-পরিবারের ঘরে। ইউরোপের মত যদি এদেশেও অত অর্থ-সম্পদ নতুন নতুন শিল্পের বিকাশে রূপান্তরিত হত, তাহলে এ দেশের চেহারা অন্য রকম হোত। কিন্তু বর্ণাশ্রমের অচলায়তনে বাঁধা গ্রাম-সমাজে ঐ বিপুল সোনা-রূপো অবক্ষয় ও শোষণকে আরও ঘনীভূতই করেছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মুর্শিদকুলির জমিদারী ইজারার নিলাম ব্যবস্থার সংগঠিত রূপ কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (১৭৯৩)।

এতেই সমগ্র গ্রাম-সমাজের কৃষি-অর্থনীতির ভিৎ গেল আলগা হয়ে, কৃষক প্রজাদের ভিটে-মাটির বন্ধন গেল ছিঁড়ে। একদিন গ্রামের সবাইকে জানিয়ে অথবা মত নিয়ে কৃষক প্রজাদের সামনে রাজ-পুরোহিত উচ্চারণ করতেন—'বিধিমস্তু ভবতাম' অথবা 'মতমস্তু ভবতাম'; আর ব্রিটিশ আমলে নীল সাহেব জন মুরে ও জমিদার জয়চন্দ্র গোবিন্দ-কালোমানিক-মাধবদের ঘরে আগুন দেয়, সর্বস্বত্ব লোপাট করে সবার সামনে, আমীন-মোক্তার, ম্যাজিস্ট্রেট, দারোগা, বিচারক 'সব টুপিওলাই ভাই-ভাই।'

অবশ্য, নীলদর্পণ-এর জমিদার গোলোক বসু, 'জমিদার দর্পণ'-এর হায়ওয়ান আলী আর গোবিন্দ সামন্তর জয়চাঁদ রায়চৌধুরীর সঙ্গে দুর্গানগরের ডিরোজিও শিষ্য তরুণ জমিদার নবকৃষ্ণ ব্যানার্জীর পার্থক্যটি বোঝা যায়। গোলোক বসু 'নীলের গাদনে' সর্বস্ব হারানোর বেদনায় বিহ্বল ও কাতর এবং তার পুত্র নবীন বসু প্রতিবাদী ; আবার হায়ওয়ান আলী ও জয়চাঁদ 'রাজ-প্রতিনিধি রূপী মধ্যবর্তী সম' জমিদার, ['জমিদার দর্পণ'-এর সূত্রধার]। আবার নীলদর্পণ-এর নবীনমাধব সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক স্বার্থে আত্মরক্ষা মূলক সংঘাতে অবতীর্ণ, কিন্তু পাশ্চাত্য প্যাট্রিওটিজম্-এ দৃপ্ত নবকৃষ্ণের প্রতিরোধ অন্য চরিত্র নিয়েছে। লালবিহারী এই দিকটা তাঁর পিতার তুলনায় এনে সার্থকভাবে ফুটিয়েছেন এবং আপৎকালে পরামর্শপ্রার্থী মাধবের সঙ্গে বৃদ্ধ মুরুব্বির কথোপকথনে সদিচ্ছা থাকলেও যে রাজাবাবু কৃষকদের বাঁচাতে পারবে না, এটাও তুলে ধরেছেন। কারণ সামরিক, আর্থিক ও আইনী ক্ষমতার পাল্লা ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে অনেক বেশি ভারি।

দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' ১৮৬০ সালে রচিত, লালবিহারীর 'গোবিন্দ সামন্ত' ১৮৮১ সালে রচিত, যাতে আমরা নীল-প্রতিরোধের সংগ্রামী মেজাজ-টাকে আরও পরিণত, আরও ঐক্যবদ্ধ রূপে পেয়েছি ; এতে 'সমিতি' ও 'ধর্মঘট' এসেছে এবং ব্যক্তিগত ক্রোধকে সংযত করে সংগঠিত রূপ দেবার কথাও উচ্চারিত। এ দেশে নীলের চাষ সুরু হয়েছে, নীলকুঠির পত্তন হয়েছে ১৭৭৭-৭৮ সাল থেকে এবং এর দু-তিন বছর থেকেই কৃষকদের প্রতিরোধ সংগ্রাম সুরু হয়েছে। প্রথম-প্রথম জমিদাররা দাদন নিয়ে নীল চাষ করেছে, পরে ক্রমশ এর ধ্বংসাত্মক ফল টের পেয়ে তারাও কৃষকদের সঙ্গে বিদ্রোহে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে। তাই নীলদর্পণ-এর সময়েও ঐ বিদ্রোহ কতটা স্বতঃস্ফূর্ত ও ব্যক্তিগত রোষের সুরে ছিল, এই 'ঐতিহাসিক বাস্তবতা'র প্রশ্ন থেকেই যায়। তবু নীল গণবিদ্রোহের প্রথম শিল্পরূপ হিসাবে 'নীলদর্পণ' বাংলা সাহিত্যে অবিস্মরণীয় অবদান রেখেছে। এর পরেই নীল চাষীদের অশেষ দুর্দশা ও যৌথ আন্দোলনের বাস্তবসম্মত রূপরেখা সার্থক-ভাবে ফুটেছে লালবিহারীর 'গোবিন্দ সামন্ত' ও মীর মশারফ হোসেনের 'উদাসীন পথিকের ডায়েরী' রচনায় অনেকটা।

সম্প্রতি কোন কোন সমালোচক বলছেন, নীল-সাহিত্যগুলিতে কৃষক বিদ্রোহের রূপ যথাযথ ফোটেনি যেমনটি বাস্তবে ঘটেছিল, অর্থাৎ সমকালের মধ্যবিত্ত ভাবধারাই বেশি প্রাধান্য পেয়েছে ; যে-সময়ে, ১৮৪৮ সালে

'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রিকায় জনৈক ইংরেজ নীলকর লেখক 'সাম থার্টি ইয়ার্স এগো' নিবন্ধে লিখছেন—"বহু ক্ষেত্রে নীলকর সাহেব কৃষক লাঠিয়ালদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে তেজী ঘোড়ার পিঠে অতি দক্ষতার সাথে পালিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে কৃষকরা সশস্ত্র আক্রমণের দ্বারা নীলকুঠি ধূলিসাৎ করে দিয়েছে" (প্রভাতকুমার গোস্বামী রচিত 'উনিশ শতকের দর্পণ-নাটক'-এ উদ্ধৃত)। আমরা 'নীলদর্পণ' রচনা কালে লর্ড ক্যানিং-এর উক্তিও পেয়েছি —"নীলচাষিদের সাম্প্রতিক বিদ্রোহ এমন উৎকণ্ঠা জাগিয়েছিল যে, দিল্লীর ঘটনাতেও এমন উদ্বেগ হয়নি।" তখনকার লেঃ গভর্ণর গ্র্যান্ট সাহেব বলেছেন—"শত সহস্র মানুষের বিক্ষোভের এই প্রকাশ, যা বঙ্গদেশে প্রত্যক্ষ করছি, তাকে কেবলই রং বিষয়ক বাণিজ্যিক প্রশ্ন ভেবে যাঁরা গভীরতর গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা বলে ভাবতে অক্ষম, আমার মতে তাঁরা সময়ের ইঙ্গিত ধরতে মারাত্মক ভুল করছেন" (উদ্ধৃতি ঐ]। এই উক্তির মধ্যে পরিস্থিতির বিদ্রোহী মেজাজ বুঝেই বলবো, আসলে 'বেয়াদপ' কৃষকদের উপর অত্যাচার আরও তীব্র ও ব্যাপক করার জন্যই লেঃ গভর্ণরের এই প্ররোচনা।

সমালোচকরা এর বিপরীতে দীনবন্ধুর 'ভূমিকা'র উল্লেখ করে মহারাণী ভিক্টোরিয়া, লর্ড ক্যানিং, গ্র্যান্ট ও ইডেন সাহেবকে 'প্রজাজননী', 'উদারচরিত্র' ও 'সত্যপরায়ণ' ইত্যাদি বিশেষণে বন্দিত করাকে কটাক্ষ করেছেন।

ঠিক কথা, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সম্পূর্ণ রূপটা তখন শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের মনে স্পষ্ট হয়নি। না হওয়াই স্বাভাবিক। তখনকার ঐতিহাসিক বিকাশের স্তর, গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পথ খণ্ডিত ও কুয়াশাচ্ছন্ন রাখার স্তর মনে রেখে, আমরা তোরাপ, গোবিন্দ, কালোমানিক, মাধবদের সামন্তবাদ ও ব্রিটিশ জঙ্গী-শাহীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কৃষকশ্রেণীর প্রতিনিধি চরিত্র ভাবতে পারি এবং এর জন্যই দীনবন্ধু ও লালবিহারীকে গণমুখী সাহিত্যের পথনির্মাতার গৌরবে ভূষিত করতে পারি। 'আইনের শাসন' সম্পর্কে কেবল শিক্ষিত মধ্যবিত্ত কেন, গ্রামের কৃষক-মজুরদের মধ্যেও তো আগ্রহ ব্যক্ত হয়েছে!

আরও একটা দিক রয়েছে। যুক্তিবাদী ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বণিকী পুঁজিবাদের তুলনায় ইংলণ্ডের শিল্প-পুঁজিবাদ প্রগতিশীল ছিল; এবং ভিক্টোরিও শাসন ছিল তারই প্রতিনিধি। আজকের পরিণত দৃষ্টিকোণে নয়, সেকালের সমাজবিকাশের স্তর বুঝেই সিদ্ধান্ত করা সঠিক। ধরা যাক, আজও যদি কেউ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দৃষ্টিকোণের

পরিচয় না রেখে খাঁটি গণতান্ত্রিক হন, তবে কি তাঁকে প্রতিক্রিয়াশীল বলতে পারি ?

পুনশ্চ

I. "The ryots of Bengal are as interesting as a class of people as any peasantry in the world. Amongst them is to be found a vast deal of sympathy of olden times ; and some of the social virtues which they exercise entitle them to our respect and admiration. But they have been greatly abused ; systematic oppression from time immemorial has paralysed their energies, deprived them of their native manliness, and reduced them to the ignoble condition of slaves. Their own countrymen have proved to be their earliest oppressors and most inveterate foes. The Zamindar's Kutcheri is the scene of the ryots degradation." (Rev. Lalbihari Day, Calcutta Review, June, 1951).

II. "Jay Kissen Mookherjea of Uttarpara, a Zamindar in Bengal, offered a prize of Pound 50 for the best novel to be written in Bengali or in English, illustrating the 'Social and Domestic Life of the Rural Population and Working classes of Bengal. The essays were sent to the adjudication early in 1872 ; two of the adjudicators being away to England, and other causes did allow the award to be made till the middle of 1874, when *Dey's Gobinda Samanta* won the prize."

III. "We reproduce here a brief note written by one whose name in the domain of science is universally respected. It was sent to his publisher : 'I see that Rev. Lal Behari Day is editor of the Bengal Magazine, and shall be glad if you would tell him, with my compliments, how much pleasure and instruction I derived from reading a few years ago, his novel *Gobinda Samanta*.

13th April 1881 Charls Darwin

Down, Beckenham, Kent

[Quoted from *Folk Tales of Bengal* and *Recollections of My School-Days*. *Bengal Peasant Life*, by Lalbehari Day, edited by Dr. Mahadevaprasad Saha, Published by Editions Indian, 1969].

কৃষক, গ্রাম-পঞ্চায়েত ও সংস্কৃতি

পরিস্থিতিটা অদ্ভূত ও সংকটজনক। একদিকে বুর্জোয়া বিপ্লব অসমাপ্ত র'য়ে গেল, অপরদিকে সারা দেশটা বুর্জোয়া অবক্ষয়ের কালগ্রাসে পড়েছে।

চাষির হাতে জমি যাওয়া ফরাসী বিপ্লবের বুর্জোয়া দাবি, গণতান্ত্রিক অধিকার। এরজন্য সংগ্রাম গণতান্ত্রিক সংগ্রাম। এই সংগ্রামের আভ্যন্তর উপাদানের বিকাশ গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিরই বিকাশ। তবে সমগ্র বিশ্ব-পরিস্থিতিতে বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে এই বিপ্লব ও মতাদর্শের ঘটনা সত্য হলেও, আমাদের দেশে পরিস্থিতিটা অত সরল নেই।

কৃষিতে পুঁজি ঢুকে কৃষকদের নানা স্তর সৃষ্টি করেছে। গ্রামেও পুঁজি ও ক্ষেত-মজুরদের দ্বন্দ্বটা তীব্রতর হয়েছে। আবার একই কৃষি ব্যবস্থায় প্রাক্-পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্ক বেশ জোরালো থাকার কারণে কৃষক দিশাহারা হচ্ছে, উৎপাদিকা শক্তিও দুর্বল হয়ে পড়ছে।

ভূমিদাস ব্যবস্থার নানামুখী বন্ধন, জমিদারী অর্থনীতির শিকড়ও থাকবে, আবার বলা হবে, ধীরে ধীরে 'বিশুদ্ধ' ধনতন্ত্রের বৃত্তে কৃষি-অর্থনীতির রূপান্তর ঘটালেই সমগ্র গ্রাম-সমাজে 'নবান্ন' আসবে—এ কেমন ধারা প্রগতি? নাকি, বিপ্লবের মাধ্যমে ভূমিদাস ব্যবস্থার সমস্ত জট সহ জমিদারী অর্থনীতির উচ্ছেদ ঘটানোর বা জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের লক্ষ্য সাধনে—ভূমি বিপ্লব!

আজ এটাই প্রমাণিত সত্য যে, জমিদারী অর্থনীতির যাঁতাকলও ভাঙতে হবে, পুঁজিবাদী অবক্ষয় বা অসারতার বিকল্প পথও কাটতে হবে।

আজ আশু প্রয়োজন বড় বড় জোতের কেন্দ্রিভবন প্রতিরোধ করা, ভাঙা। প্রতিরোধ কারা করবে? শ্রমিক ও প্রধানত ক্ষেতমজুর ও গরিব চাষিদের ঐক্য ও সংগ্রাম। স্বভাবতই ঐক্যটা জমিদার বা ধনী কৃষকদের উঠোনে হবে না।

প্রশ্ন হল, কেন ক্ষেতমজুর ও গরিব চাষির মধ্যে জমি বিলি করা আজ কৃষক আন্দোলনে মূল কাজ? কারণ আমরা জানি প্রাক্-পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্কে থাকা জমিতে জোতদারের প্রাধান্য ও কেন্দ্রিভবন ভেঙে জমি-বন্টনের কর্মসূচী সফল করলে দেখা যাবে, যে সামান্য কিছু জমির মালিক সে-ই বর্গাদারী ও ক্ষেতমজুরীও করছে। অপরপক্ষে, পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্কে

বাঁধা বড় বড় খামার গড়ে উঠলে ব্যক্তিগত জমি-বণ্টনের ব্যবস্থা অবশ্যই প্রতিক্রিয়াশীল কাজ।

যে জমিতে আজ সে রক্ত দিচ্ছে, সেই জমি আগে ছিল তার। সে এখন জমি ফিরে পেতে চায়। তাই শ্রমিক-কৃষকের মৈত্রী, কৃষকদের ঐক্য ও সংগ্রামের ভিৎটা বানানো হয়েছে এখান থেকেই।

সাধারণভাবে গ্রামসমাজে সারা দেশে আজও চলছে বড় বড় জোতদারদের শাসন। জমির মালিকানা, অর্থনৈতিক শক্তি, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব সবই তাদের দখলে। এরাই শাসকদল হয়ে কৃষি-বিপ্লবের কাজ রুখে দিচ্ছে, বিভ্রান্ত করছে এবং বিলম্বিত করছে।

পঞ্চায়েতের সেকাল ও একাল

গ্রাম-পঞ্চায়েত আগেও ছিল। এখনও আদিম ও তফশিলী জাতি-উপজাতি সমাজে এই ব্যবস্থা রয়েছে। এ ছাড়া মধ্যপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, উত্তরপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্রে 'স্বাধীন-ভারত' থেকে গ্রাম-পঞ্চায়েত চালু রয়েছে। কিন্তু এগুলি বর্ণহিন্দু, জাত-পাত ও শ্রেণী-আধিপত্যের প্রচলিত কাঠামো বহাল রেখেই চলছে। এগুলিতে 'সমাজকল্যাণ'-এর নামে নিচুতলার গরিব-মুনিশদের 'আনুগত্যের ন্যায়ধর্ম' রক্ষা করা হয়। জোতদার ও বর্ণহিন্দুরাই এই ধরণের পঞ্চায়েতী সংস্থার মাথা হয়ে বংশানুক্রমে বিরাজ করে।

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও কেরালার চেহারাটা অন্য রকম। কারণ এখানে বামপন্থী আন্দোলন ও গণতান্ত্রিক ভাবধারা তীব্র ও ব্যাপক।

পশ্চিমবঙ্গের কথা বলতে পারি, গত দুইটি যুক্তফ্রণ্ট সরকারের আমলে আমরা দেখেছি—প্রায় ৯ লক্ষ বিঘা বেনাম জমি কৃষক সভাকে দিয়ে খুঁজে বের করা হল, সেই জমি গরিব চাষিদের মধ্যে বণ্টিত হল, বর্গা উচ্ছেদ বন্ধের আইন হল, পুলিশ-প্রশাসনের উপর কায়েমী প্রভাব থেকে জোতদারদের বিচ্ছিন্ন করা হল—এতে ক্ষেত-মজুর ও বর্গা চাষিদের আত্মমর্যাদা ও শ্রেণী-চেতনা কিছুটা বাড়ল।

এবারের বামফ্রণ্ট সরকারের আমলে এই ভূমি-সংস্কারের কাজ আরও বাড়ল। ক্ষেতমজুরদের মজুরী বৃদ্ধি, বর্গাদারদের কাজের নিরাপত্তা সহ ফসল ভাগের হিসাব নিশ্চিত করা বা বর্গা অপারেশন, কাজের বদলে খাদ্য কর্মসূচী এবং গণমুখী সর্বজনীন শিক্ষার কর্মসূচী সমগ্র গ্রাম-সমাজে যে গুরুত্বপূর্ণ ও গুণগত পরিবর্তন আনলো তা ভারতীয় পটভূমিকায়, অতীত

ও বর্তমানের অভিজ্ঞতায় অভূতপূর্ব। এর ফল শুধু এ রাজ্যেই নয়, সারা ভারতের ক্ষেত্রেই উদ্দীপক ও সুদূরপ্রসারী।

কিন্তু গ্রাম-সমাজের এইসব উন্নয়নমূলক কাজ কি সরকারী দপ্তর থেকে পরিচালিত হবে ? আদৌ তা নয়। এরই জন্য ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ নীতির রূপায়ণে সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গ্রাম-পঞ্চায়েতের নির্বাচন। অর্থাৎ গ্রামের কোটি কোটি গরিব শ্রমজীবী মানুষের প্রতিনিধিরাই গ্রামীন উন্নয়নের প্রশাসনিক ক্ষমতা ও দায়িত্ব অর্জন করলেন এ রাজ্যের বামফ্রণ্ট সরকার প্রবর্তিত পঞ্চায়েতী ব্যবস্থার মাধ্যমে—ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ নীতির রূপায়ণে। নিঃসন্দেহে এই ঘটনা ভারতীয় রাজনীতির ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইল-ফলক রূপে চিহ্নিত রইলো।

এবার দেখা যাক, কি ভাবে গ্রাম-পঞ্চায়েতের মাধ্যমে গ্রামোন্নয়নের তথা নিচের তলা থেকে ভিত্তিকে মজবুত ও পুষ্ট করার কাজ হবে।

এক. যুগপ্রাচীন 'বাস্তুঘুঘুদের বাসা' ভাঙার ব্যবস্থা, প্রকৃত জন-প্রতিনিধিদের অগ্রণী ও প্রশাসনিক ভূমিকার গ্যারাণ্টি এবং গ্রামীন সংস্কৃতির অচলায়তন ভাঙার সূচনা।

দুই. বর্গাদার উচ্ছেদ রোধ—কাগজপত্র থাকুক আর না-ই থাকুক, যে জমিতে চাষ করে বর্গার অধিকার তারই।

তিন. যে জমিতে শ্রম দেবে সে পাবে ফসলের অর্ধেক ভাগ ; আর যার থাকবে শ্রম ও বলদ-লাঙল তার হবে তিন ভাগ।

চার. মহাজনের উপর নির্ভরতা কমিয়ে আনার জন্য (শেষে উঠে যাবেই) 'গ্রামীন সমবায় ব্যাংক' ব্যবস্থার ব্যাপক কর্মসূচী।

পাঁচ. মালিকের জমিতে থাকা চাষির ভিটে সরকার নিয়ে নিচ্ছে এবং মুনিশ-মাহিন্দারদের সেইসব ভিটের স্বত্ব দিচ্ছে।

ছয়. খাস জমি এবং সিলিং-এর বাইরে উদ্বৃত্ত জমি নিয়ে বর্গাদার ও ভূমিহীন গরিবদের মধ্যে বিলি-ব্যবস্থা। অবশ্যই দেখা হচ্ছে কেউ যেন দুই-তিন বিঘার বেশি না পায়। কেন ? সংসার প্রতিপালনের প্রয়োজন পর্যন্ত, যেন ব্যক্তিগত মালিকানার বিষ ঢুকে না যায়।

সাত. কমপক্ষে ৮ টাকা ১০ পয়সা মজুরী নির্ধারণ।

আট. এইসব ব্যবহারিক ও আর্থিক সুযোগ দানের উদ্দেশ্যই হল গরিব চাষি-কারিগরদের পরিবারের সন্তানরা যাতে শিশুশ্রম থেকে রেহাই

পেয়ে অন্তত প্রাথমিক শিক্ষার ভিৎটা গড়ে নিতে পারে, গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির সুস্থ সূচনা হতে পারে।

দেখা যাচ্ছে, গ্রামীন অর্থনীতি ও প্রশাসনের ক্ষেত্রে এইসব মূল্যবান বস্তুগত ও গুণগত পরিবর্তনের ঘটনায় শ্রমজীবী গরীব জনগণের মধ্যে যে আত্মবিশ্বাস ও মর্যাদাবোধ জাগছে, তাতে গণতান্ত্রিক ও মানবিক চেতনারও রূপান্তর ঘটবে।

তবু প্রশ্ন থেকে যায়। যুগসঞ্চিত জমিদার-জোতদারের সামাজিক প্রভাব, তাদের সম্পর্কে দৈহিক ও মানসিক ভয় এবং নিজেদের শিকড়সঞ্চারী সংস্কার ও অজ্ঞানতা রাতারাতি কেটে যাবে না। আবার বর্তমান কাঠামোয় ঐ সব বঞ্চিত শোষিত শ্রেণীর মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধ ও সামাজিক অধিকার-বোধের নির্উচ্ছ্বাস সৃষ্টি না করলে প্রচলিত শোষণমূলক আর্থ-সামাজিক অচলায়তন ভাঙার, মৌলিক কৃষি-বিপ্লবের পথ খুলবে না।

এই রাজ্যে প্রকৃত গণতান্ত্রিক অধিকারবোধ সৃষ্টির জেনারেটর হিসাবে কাজ করছে গ্রাম-পঞ্চায়েত ও গণমুখী সার্বজনীন শিক্ষার কর্মসূচী।

গ্রাম-পঞ্চায়েত 'গ্রামসেবক' নয়

গ্রামের গরিব বলতে ভূমিহীন চাষি, বর্গাদার, প্রান্তিক ও ছোট চাষি এবং গ্রামীন কুটিরশিল্পী-কারিগরদেরই ধরা হয়। এ রাজ্যে ৫৫ লক্ষ গ্রামীন পরিবারের ৯০ শতাংশ এই শ্রেণীর মধ্যে রয়েছে। বামফ্রন্ট সরকার যে পঞ্চায়েতী পরিকল্পনায় বা গ্রামোন্নয়নের ব্যবহারিক ও প্রশাসনিক বিধিব্যবস্থার দিকে গুরুত্ব দিয়েছে তা কি নিছক উদারতা বা করুণার তাগিদে? আদৌ তা নয়। এর বাস্তবসম্মত সামাজিক ও জাতীয় লক্ষ্য এবং ভিত্তি রয়েছে। কী সেটা?

১. ধনী-গরিবের বৈষম্যের উচ্ছেদ নয়, বৈষম্য কিছুটা কমানো।

২. উৎপাদন আরও বাড়ানো। এর সঙ্গে মজুরী বৃদ্ধি ও ফসলের ন্যায্য দাম যোগ হয়ে গরিবত্ব কমবে এবং গ্রামীন শিল্প-সামগ্রীর চাহিদা বাড়বে (ক্রয়ক্ষমতা কিছু বেড়ে)। তাছাড়া গ্রাম-পঞ্চায়েতের সমবায়-ব্যবস্থায় নিজেদের অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করার প্রয়োজনে গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ও বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রে ভিড় বাড়বে। এতে গ্রামের গরিব শ্রেণীর মধ্যে আত্মবিশ্বাস, দক্ষতা ও মর্যাদাবোধ বাড়বে। উল্লেখযোগ্য যে, আজও ব্যবহারিক ও অন্যান্য

অর্থনৈতিক-মানসিক কারণে গ্রাম-পঞ্চায়েতে গ্রামের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রাধান্য রয়েছে। অবশ্য এই ভারসাম্যের পরিবর্তন সুরু হয়েছে।

৩. গ্রামোন্নয়নে লোকশক্তি বা শ্রমের ভূমিকাই সবচেয়ে বড় সম্পদ। প্রশ্ন হল, কৃষিতে উৎপাদন বাড়বে কেন বলা হচ্ছে? সম্প্রতি 'ফার্ম ম্যানেজমেণ্ট স্টাডিস'-এর রিপোর্টে প্রকাশ: একর প্রতি উৎপাদনের হার বেশি হয়েছে ছোট চাষির জমি থেকে। ধনী চাষির মূলধন বেশি, শ্রম নেই। অপরপক্ষে গরিব চাষির মূলধন নেই, শ্রম প্রচুর। এরই ফলে গরিব চাষির জমিতে উৎপাদনের হার বাড়ছে। কাজেই ঐ যে উদ্বৃত্ত জমি দেওয়া হল এবং সেই সঙ্গে সার-পাম্প ও অন্যান্য কৃষি-উপকরণ ও ব্যাঙ্ক-ঋণ দেওয়া হল —এতে জাতীয় স্বার্থেরই সমৃদ্ধির পথ খুলে গেল।

কাজেই উৎপাদন ও ক্রয়ক্ষমতা বাড়ানোর অর্থই হল শিল্পদ্রব্যের চাহিদা বাড়ানোর দিকে, বেকার সমস্যার সমাধানের দিকে দেশকে এগিয়ে নেওয়া। এর সঙ্গে গণমুখী বিজ্ঞানসম্মত কর্মসূচী চালু থাকলে প্রচলিত রাষ্ট্র-কাঠামো ও উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে বিরোধগুলির উৎস জনগণই খুঁজে পাবেন এবং তার নিষ্পত্তি ঘটাতে উপযুক্ত পথ তাঁরাই কাটবেন। এরই নাম সমাজবিপ্লব, যার সাংস্কৃতিক বা চেতনাগত পটভূমি সৃষ্টির কাজই বামফ্রণ্ট সরকার এ রাজ্যে সুরু করেছেন। তাই স্বভাবতই প্রতিক্রিয়াশীল কায়েমী স্বার্থবাদীদের এত চিৎকার। তাছাড়া কায়েমী স্বার্থের প্রতিনিধি ধনী ও তার অংশীদার মধ্য-বিত্তদের একাংশের মানসিক যন্ত্রণা কি কম? আজ গরিব চাষি-কারিগরদের ছেলে বলছে—'বাপু গেছে বিডিও মিটিনে, আমরা যাচ্ছি ইস্কুলে।'

এতদিন ছিল গ্রামসেবক আমলারাই কর্তাবাবা। এরা সরকারের টাকা খেয়ে জোতদারদেরই সেবা করত। আজ চাষ, সেচ, রাস্তা, বাঁধ সব কিছুই চলছে নিচের থেকে উপরের নীতিতে।

এটা টাকা ঢেলে সম্ভব নয়, যেখানে সব টাকা ও ক্ষমতা দিল্লীতে কেন্দ্রীভূত। এই অবস্থায় রাজ্যের ৪০ হাজার মৌজায় রাজ্য-আয়ের সব টাকা দিয়েও কিছু হবে না। কাজেই শ্রমশক্তিই আজ সবচেয়ে বড় সম্পদ। গ্রামে যা উপকরণ ও প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে তারই উপযুক্ত ব্যবহারে কিছুটা কাঙ্খিত ফল দিতে পারে। সেইরকম পরিবেশ সৃষ্টি করাটাই বড় জরুরী।

এখানে একটু সতর্কীকরণেরও প্রয়োজন রয়েছে। এ রাজ্যের বামফ্রণ্ট সরকার, গ্রাম-পঞ্চায়েত ও গ্রামীন সমবায় ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার নতুন কাঠামো ও কর্মসূচী থেকে একটা চড়া আবেগের ঝোঁকু, বিশেষত সারা ভারতের বাম ও

গণতান্ত্রিক আন্দোলনের দুর্বলতার পটভূমিতে, অবশ্যই থেকে যাচ্ছে। কেবল পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরায় বিচ্ছিন্নভাবে গণ-আন্দোলন বা কৃষক আন্দোলনকে খুব বেশি মাত্রায় তুলে ধরার বিপদও রয়েছে। পূর্বে এর অভিজ্ঞতা যে নেই তা নয়।

গ্রাম-পঞ্চায়েতের কর্মসূচীর আর্থিক যোগানদারের হিসাবে সমবায় ব্যবস্থাকেই সার করে এগোতে যাওয়ার বিপদটা কোথায়? আমরা কি ভুলে যাব, বৃহৎ বুর্জোয়াদের পরিচালনায় এ দেশ মূলত বুর্জোয়া-জমিদার রাষ্ট্র? সমবায়ের টাকা আসে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দিল্লীর সম্পত্তি। কাজেই যে সমবায়ের চলা বা না-চলা নির্ভর করছে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উপর, সেই সমবায়ের উপরই নির্ভর করে গ্রাম-পঞ্চায়েতের উন্নয়নমুখী কর্মসূচী অবাধে চলতে পারে বলে ভাবাটাই অতি-আবেগ ছাড়া কিছু নয়।

কাজেই গ্রামের গরিব মানুষের সমস্যাগুলির কিছু প্রশমনই সম্ভব, মৌলিক সমাধানের পথে বর্তমান রাষ্ট্রীয় চরিত্রই পয়লা নম্বর বাধা—এটা বুঝতে ও বোঝাতে হবে। এরই জন্য অর্জিত রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বেশি বেশি করে গণ-জমায়েত ও শ্রেণী শত্রুকে বিচ্ছিন্ন করার দিকেই সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে।

ঐ যে দুই-এক বিঘা উদ্বৃত্ত জমি পাট্টা দেওয়ার ঘটনাকে যদি জমির 'সামাজিকীকরণ' বলে কেউ ভুল করে তবে অচিরেই তার মধ্যে হতাশা আসবে। সে যখনই 'ভর্তুকি' পাবে না, তখনই উগ্র হয়ে উঠবে। সে যদি ভেবে থাকে 'ভর্তুকি'টাই তার একমাত্র গণতান্ত্রিক অধিকার বা সম্বল তাহলে সে তার নিজের পায়েই কুড়ুল মারবে। ঐ ভর্তুকির উপর নির্ভর করে কৃষি-অর্থনীতির নবান্ন আনার বাসনা নেহাতই কল্পনাবিলাসী মধ্যবিত্ততা ছাড়া কিছু নয়।

তাহলে ঐ সব বর্গা ও পাট্টা পাওয়া গরিব চাষিরা কি করবে? তারা বেশি করে 'সার্ভিস কো-অপারেটিভ'-এ অংশ নেবে, সমষ্টিগত স্বেচ্ছাশ্রমে অংশ নিয়ে তার ফল নিজেদের মধ্যে সংহত রাখায় নজর দেবে। এইভাবেই মহাজন ও ভর্তুকি-নির্ভরতা থেকে নিজেদের মুক্ত করার উন্নত সাংস্কৃতিক চেতনায় রূপান্তরিত হবে—যে-চেতনা সেই দিকেও আলো ফেলবে যে দিকে আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের নির্দেশে 'কাজের বদলে খাদ্য কর্মসূচী' বাতিল করেছে কেন্দ্রের বুর্জোয়া-জমিদার সরকার। গ্রামের অবস্থাপন্ন পরিবারের সন্তানেরা তো আর কাজ বা শ্রম করবে না! তাই তারা এবার

কেন্দ্রীয় সরকারের 'জাতীয় কর্মসংস্থান প্রকল্প' এর সুযোগ নিতে পারবে। পরশ্রমজীবী কায়েমী স্বার্থের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের এই সহানুভূতির ঝোঁকটা গরিব শ্রমজীবীরা কতটা টের পাচ্ছেন, সেটাই দেখা দরকার।

কৃষকের সংস্কৃতি

প্রাচীন ঋক্‌বেদের যুগ থেকে, রামায়ণ-মহাভারত থেকে আমাদের দেশে কৃষিনির্ভর গ্রামীন সমাজ ও সংস্কৃতি চলে আসছে। আজও কৃষকই আমাদের প্রধান উৎপাদক; এই সমাজ ও সংস্কৃতির পরিচয় পেতে হলে কৃষি উৎপাদনের ব্যবহারিক উপায়-পদ্ধতি ও সামাজিক সম্পর্কগুলি বোঝা দরকার। ঋক্‌বেদের স্তোত্রে প্রার্থনা করা হয়েছে—'হে উষা, আমাদের অন্ন (শস্য) দাও, গোধন দাও।' মহাভারতের রাখাল কৃষ্ণ, হলধর বলরাম ও বিরাট রাজার গোহালের বর্ণনা থেকে পশুচারণ ও কৃষি-সমাজের পরিচয় মেলে। আরও আদিম লোকসমাজে ম্যাজিক ও লোকাচারে নারীকে যে কৃষি-প্রজননের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে, তা থেকে এটাই ধারণা করা সম্ভব যে পশু-পালন ও শিকারের যুগে যখন পুরুষরা শিকারে যেত, তখন নারীরা অরণ্যে লতাপাতা ও বীজ কুড়তো। তাদের হাতের শস্য বীজ মাটিতে পড়ে নতুন ফসল হলে সেই কৃষিকাজের সূচনার সঙ্গে নারীদের সম্পর্ক জড়িয়ে গেল। নারীও গর্ভধারণ করে, মাটিরও গর্ভ সঞ্চার হয়। হরপ্পার শিলমোহরে নগ্ননারীর যৌনাঙ্গ থেকে লতা গজানোর ছবি পাওয়া গেছে।

পরবর্তীকালে শ্রমবিভাগের ফলে পুরুষ কায়িক শ্রম দিয়ে সামন্ততান্ত্রিক কৃষি-অর্থনীতির সংহত সমাজ গড়েছে, আর নারী গেরস্থালীর কাজের (সন্তান উৎপাদন সহ) সীমাবদ্ধ বলয়ে আবর্তিত হয়েছে। তবু হাল-বলদ দিয়ে জমি চাষের উৎপাদন পদ্ধতি গড়ে উঠলেও জল নেই, সুতরাং বৃষ্টির জন্য আদিম লোকাচার ও লৌকিক ছড়া ও নাচগান চালু থাকল। এতে নারীরাই অংশ নিল বেশি। ভাল ফসল হচ্ছে না বা পোকায় খেয়ে নিচ্ছে, সুতরাং চাষের জমির উপর উলঙ্গ নারীর (হুদুম দেওয়া), নরনারীর সঙ্গম, বেঙ বিয়া, বদনা বিয়া, হুদুম দেওয়া বা মাগন যাত্রা, বসুধারা ব্রত, হলপ্রবাহ, গারুই ব্রত বা গাম্বী উৎসব, তুষ ছিটানো ইত্যাদি লোকাচার করলে দুঃসময় কেটে যাবে এমন সংস্কারের [যা লোক-সংস্কৃতি নামে প্রচলিত] কেন্দ্রীয় চরিত্র হয় নারীরাই। অবশ্য এই সব লোকাচার বা লোক-বিশ্বাসের মধ্যে আদিম সমাজেরও অনেক সাংস্কৃতিক উপাদান আজও মিলেমিশে রয়েছে,

বিশেষ করে উৎপাদনে অনুন্নত আদিবাসী বা উপজাতীয় সমাজে। অর্থাৎ মন্ত্রতন্ত্র, তুকতাক, তাবিজ-মাদুলি, ওঝা গুণিন, পানিপড়া, ঝাড়ফুক ইত্যাদি আদিম ম্যাজিক-আশ্রিত সংস্কারও যেমন রয়েছে, স্বর্গ, নরক, জন্মান্তর, বর্ণাশ্রমঘটিত পাপ-পুণ্য, অদৃষ্ট বা ভাগ্যফল, ডাইনী, সতীদাহ, নরবলি ইত্যাদি সামন্ততান্ত্রিক ধর্মীয় বা ভাববাদী সংস্কৃতির আধিপত্যও তেমনই যথেষ্ট সক্রিয়।

উনিশ শতকের সূচনাকালে রামমোহন কেন কৃষক বিদ্রোহের ডাক না দিয়ে সতীদাহ ও গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন নিয়ে মাতামাতি করলেন বলে আজ যে-সব আর্ম-চেয়ার কেতাবী বুদ্ধিজীবী অভিজাত বামাচারী সাজেন, তাঁরা আজও মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের গ্রামে গ্রামে 'অস্পৃশ্যতা'র পবিত্র সংস্কৃতির শিকার হরিজননিধনের ঘটনায়, কিংবা ডাইনী পোড়ানোর ঘটনায় কতটা বিচলিত ? তাঁদের অনেকেই কি ওঝা গুণিনের 'ন্যাস্টি-প্রিমিটিভ' সংস্কৃতি ছেড়ে 'এ্যারিস্টোক্যাট' সাঁইবাবা, অনুকূলবাবা কিংবা সাহেব-চৈতন্যের অলৌকিক প্রাঙ্গণে ভিড় করছেন না ?

রাত্রে আসানসোল যাওয়ার মাঝপথে গাড়ি খারাপ হল। দুই মাইল দূর থেকে মেকানিক্‌স এনে গাড়ি সারানো হল। সহযাত্রী অধ্যাপক-লেখক মহাশয় সারাক্ষণ জামার বোতাম খুলে বাবার লকেট ছুঁয়ে বসেছিলেন। গাড়ি চললে মন্তব্য করলেন—'বাবার শুভেচ্ছা না থাকলে কি গাড়ি চলতো ?'

আদিম বা মধ্যযুগীয় উৎপাদন ব্যবস্থার জোয়ালে বাঁধা কোটি কোটি নিরক্ষর কৃষক জনগণের মধ্যে অন্ধবিশ্বাস ও কু-সংস্কারের প্রাধান্য থাকবে, এতে আর আশ্চর্য কি ? কিন্তু ভাববাদী চিন্তাধারার প্রভাব এমনই শিকড়-সঞ্চারী যে তথাকথিত শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান নাগরিক বুদ্ধিজীবীদের মন থেকেও অলৌকিকতার প্রতি বিশ্বাস বা সংস্কার কাটতে চায় না। এই সম্পর্কে প্রবীন মার্কসবাদী কৃষকনেতা মুহম্মদ আবদুল্লাহ রসুল সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন—"বুদ্ধি ও যুক্তি দিয়ে যাকে অস্বীকার করা যায়, মনের কোণে তার পক্ষে অন্তরের অনুভূতি থাকলে সে অস্বীকৃতি কার্যত নাকচ হয়ে যায়। কুসংস্কার যদি সংস্কার হয়, তাকে শুধু যুক্তি দিয়ে ঠেকিয়ে রাখা যাবে না।" [সংস্কৃতির কথা, পৃঃ ৭]।

আবার কৃষকের সংস্কৃতি কথাতেই আসি। এই সংস্কৃতি মূলত লোক-সংস্কৃতি। যদিও 'লোক' উপসর্গে যুক্ত, তবু লোকায়ত দর্শন-আচার ও লোকসংস্কৃতি এক নয়। এই লোকজীবনের শিল্প, সঙ্গীত, নৃত্য, চিত্র ও

সাহিত্যাদির মধ্যে বস্তুবাদী বা লোকায়ত উপাদানও যেমন রয়েছে, তেমনই সামন্ত শ্রেণীর ভাববাদী সংস্কৃতির প্রাধান্যও কম নয়। এটা ঘটেছে আর্যীকরণের ফলে। তবু প্রাক্-মুসলমান আমলে লোকজীবনে ও তার নিজস্ব-সংস্কৃতিতে ঐ ব্রাহ্মণ্য আর্য সংস্কৃতির ভাববাদী ধারা বেশি পড়েনি। বরং বাংলায় আর্য-ব্রাহ্মণ্য প্রভাব অনেক বিলম্বে মৌর্যযুগে পড়ার কারণে, এবং বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের বস্তুবাদী প্রভাবে বাংলার লোকসংস্কৃতিতে পার্থিব ও লোকায়তিক ধ্যান-ধারণা ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় বেশিই পড়েছে বলতে হবে।

অবশ্য মুসলমান বিজয়ের পর গ্রামীন সংস্কৃতির উচ্চশ্রেণীর বর্ণাশ্রমিক ভাববাদী চিন্তাধারা লোকজীবনের নিজস্ব শ্রমনির্ভর ও গোষ্ঠীগত সংস্কৃতির মধ্যে বেশি করে মিশে যায়। তখন ব্রাহ্মণ কবিরা অনায়াসে লিখেছেন স্বর্গের দেবতা বা দেবী অস্পৃশ্য ও দরিদ্রদের ঘরে জন্ম নিয়েছে। এটা ছিল মুসলিম শাসকদের বিরুদ্ধে এক ধরণের সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ গড়া। অবশ্য এই ধরণের সাংস্কৃতিক সমীকরণের আরও একটা কারণ হল, ব্রাহ্মণ্য বর্ণাশ্রমের অত্যাচারে বিকল্প মঞ্চ গড়তে মধ্যযুগের এক সময়ে পূর্ব বাংলায় বৌদ্ধরা মুসলমান সংস্কৃতিতে এবং পশ্চিম বাংলায় বৈষ্ণব আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়েছে। অর্থাৎ ভাববাদের বিরুদ্ধে একটা ধারাবাহিক বস্তুবাদী বা লোকায়তিক সংস্কৃতি চালু থেকেছে গ্রাম-সমাজের সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে।

উনিশ শতকের গোড়া থেকে বাংলায় যুক্তিবাদী সমাজ-সংস্কার আন্দোলন ভারতীয় পটভূমিকায় অগ্রণী ভূমিকা নেবার রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক বা অর্থনৈতিক কারণ ছিল। এই যুক্তিবাদী আন্দোলনের রেশ গ্রাম সমাজে তেমন পড়েনি এটাও সত্যি। তবু বিভিন্ন সামাজিক সংস্কার আন্দোলন এই বাংলাতেই রাজনৈতিক আন্দোলনের যে বাতাবরণ সৃষ্টি করেছিল—তারই প্রভাবে প্রথমে লালনের গানে এবং পরে মুকুন্দদাস-নজরুলের গানে বাংলার লোকসংস্কৃতিতে পার্থিব জীবন বাসনার জোয়ার সৃষ্টি হয়েছিল। সারা ভারতের মধ্যে বাংলাতেই কেন কৃষক বা গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও লোক-সংস্কৃতির মধ্যে বস্তুবাদী গণতান্ত্রিক উপাদান বেশি, তার গবেষণায় বাঙালীর বিশিষ্ট নৃতাত্ত্বিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের সূত্রগুলি অবশ্যই বিচার করতে হবে।

ম্যাকাসিম গোর্কি লোকশিল্পকে অমার্জিত পাথরের সঙ্গে তুলনা করে

বলেছেন, প্রতিভাবান মানুষেরা ঐ পাথরকে পরিশীলিত ও রূপান্তরিত করে সুন্দর হীরক সৃষ্টি করেছেন। ঐ সব প্রতিভারাই হলেন শ্রেণী-সমাজের উচ্চকোটির প্রতিনিধি। এঁরাই ঐ হীরকের মধ্যে স্বর্গের দ্যুতি, পরকালের ম্যাজিক, ঈশ্বরের অলৌকিকতা বানিয়ে পার্থিব জগত সংসার থেকে, বস্তুগত ভোগবাসনা থেকে মানুষের মনকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে বিশুদ্ধ আনন্দ ও শান্তি দেয়।

সামন্ত শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামী কৃষককে এই সমগ্র প্রক্রিয়া বা কলা-কৌশলটাই জানতে হবে। সারি-জারি-ভাদু-গম্ভীরা তার নিজস্ব সংস্কৃতি বলে রামায়ণ-মহাভারত বা মঙ্গলকাব্যকে সে বাতিল করবে না! কারণ ঐ দুই ধারার মধ্যে বস্তুবাদ ও ভাববাদের মিশ্র উপাদান মিলেমিশে রয়েছে। সংগ্রামী কৃষককে জানতে হবে, গ্রামীন সংস্কৃতির কোথায় কিভাবে ও কেন বিভিন্ন ও পরস্পর বিরোধী ভাবধারা রয়েছে। এই সমগ্র জানাটাই এবং সংগ্রামী অভিযানের স্তরে স্তরে তার নিজস্ব লোক-সংস্কৃতির বিকাশে ঐ জ্ঞানের প্রয়োজনীয় প্রয়োগটাই তার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের মানোন্নয়নে সহায়ক শক্তি।

ধরা যাক, রামযাত্রা, মনসার গান, সখি-সংবাদের মত 'ছান্দোগ্য উপনিষদ' থেকে প্রজাপতি ও ইন্দ্র-বিরোচন সংবাদ-এর কাহিনী নিয়ে 'প্রজাপতি-সংবাদ' পালা বেঁধে যদি কোন গ্রাম্য কবিয়াল তাঁর দল নিয়ে অভিনয় করেন এবং তাতে দেখানো হয়—

[আত্মা কি জানতে ইন্দ্র এবং অসুরপতি বিরোচন প্রজাপতির কাছে এলেন]

প্রজাপতি ঃ কি সংবাদ ?

ইন্দ্র ও বিরোচন ঃ প্রভু, শুনেছি, যিনি আত্মা জানেন, তিনি পাপ থেকে মুক্ত, সব রকম কাম্যবস্তুই তিনি পান। আমাদের আত্মা কি দেখান।

[প্রজাপতি একটি জলপূর্ণ পাত্র এনে ওদের সামনে রাখলেন]

প্রজাপতি ঃ এসো, এই জলপূর্ণ পাত্রে নিজেদের দেখ।

[ওরা এসে দেখলো]

কি দেখলে ?

ইন্দ্র ও বিরোচন ঃ প্রভু, সবটাই দেখলাম। গায়ের লোম, মাথার চুল, হাত-পায়ের নখ সবই।

প্রজাপতি ঃ বেশ, এবার সুন্দর অলঙ্কারে ও পোশাকে সজ্জিত হয়ে এসো।

[ওরা তাই করলো]

এবার দেখ। কি দেখছ?

ইন্দ্র ও বিরোচন ঃ আগের মত আর লোম, চুল ও নখ দেখতে পাচ্ছি না। সুন্দর ঝলমলে মুকুটে অলংকারে পরিচ্ছদে নিজেদের শোভিত দেখলাম।

প্রজাপতি ঃ ইনিই আত্মা। ইনিই ব্রহ্ম।

[ওরা চলে গেল]

আত্মাকে না উপলব্ধি করেই ওরা চলে গেল। ওদের মধ্যে যে একেই প্রকৃত জ্ঞান বা উপনিষদ বলে বুঝবে সে দেবতাই হোক, অসুরই হোক, সে ধ্বংস হবে।

পরের দৃশ্য

বিরোচন ঃ শোন ভাই অসুরগণ। পৃথিবীতে এই আত্মারই, এই দেহেরই পূজা করবে। তা করলে ইহলোক-পরলোক সুখের হয়। এটাই আমাদের মানে অসুরদের উপনিষদ। আজ থেকে যে ব্যক্তির মৃত্যু হবে বা প্রেত হবে তার দেহ সুগন্ধি ফুলের মালায়, শস্যাদি পূর্ণ করে সাজিয়ে দেবে। সে আত্মা হবে, পরলোকে সুখী থাকবে।

এরপর সূত্রধার আসরে এসে গাইবে ঃ

শুনলে তো ভাই আত্মা কারে বলে?
দেবাসুরের এমন কাণ্ড! হায়রে পড়েছি কোন্ কলে?

আসর থেকে একজন ঃ এবার তোমার কলটা নাড়ো, বুঝিয়ে বলো—

সূত্র ঃ শোন—শোন ব্যস্ত হ'চ্ছ কেন—

সেদিন রাতে বাগ্দি পাড়ায় গিয়ে
পথের উপর এঁকেছিলাম কিছু বাঘের ছাপ
ভোর না হতে সেই না দেখে
গাঁয়ের সবাই আঁৎকে বলে, বাপ্!
ওই বনের থেকে এসেছিল বাঘ।
এইভাবেতেই স্বর্গ-নরক ভাগ্য করে খেলা।
এই ধোঁকাতেই আমরা সবাই ভগবানের চেলা।

[আসরের সবাই 'হো-হো করে হেসে উঠলো। কেউ বললো, 'বাঃ বেশ বলেছো', কেউ বললো 'তবু মনের খট্‌কা যায় না হে !']

সুত্র ঃ যাবে—যাবে, ধীরে ধীরে কাটবে সবার ধাঁধা,
আদ্যিকালের মায়ার জটে পড়ে আছি বাঁধা
গাভী-বলদ পুজোও করি
(আবার) চাষের মাঠে বেদম মারি
আঁতুড় ঘরের সামনে রাখি গোমুণ্ড কংকাল
ভূত তাড়াতে ভূতের নেত্য করছি কতকাল।

[মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গায়েন' গল্পের বর্তমান লেখক কৃত নাট্যরূপের জন্য রচিত কবিগানের অংশ]

আজ কৃষিতে অবক্ষয়ী পুঁজি ঢুকেছে। বৃহৎ পুঁজিপতিরা সেইসঙ্গে গ্রামীন সংস্কৃতির মধ্যে সতীত্ব ও দৈবশক্তির গৌরব প্রচারের পাশাপাশি 'মনসার যাত্রাগানে' ও যৌন-উত্তেজনা সৃষ্টিকারক কব্জবারে নাচের বা বিকৃত স্থূল রুচির আলকাপ-খেমটার রম্‌রমা নেশা ছড়াতেও লক্ষ লক্ষ টাকা ঢালছে। এতে মুনাফা ও শ্রমজীবী গরিব জনগণের মধ্যে সংগ্রামবিমুখতার ভাবধারা দুই-ই জমছে।

কিন্তু পুরোপুরি জমছে কি ? যে গরিব চাষি ও কারিগরশ্রেণী দীর্ঘ সংগ্রামের ঐতিহ্যে আজ জমি পাচ্ছে, মহাজনের 'বন্ধক' থেকে মুক্তির স্বাদ পাচ্ছে, বর্গা অধিকার ও সার-পাম্প পেয়েছে, তারা কি আর আদ্যিকালের শিবের মাথায় জল দিয়ে বা খনা-ডাকের বচন বলে খরার দিনেও ফসলের স্বপ্ন দেখতে পারে ? তারা আজ নিজেদের গ্রাম-পঞ্চায়েতের গঠনমূলক কর্মসূচীর রূপায়ণের মধ্যে প্রতিকূল সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিস্থিতির মোকাবিলাতেই অংশ নিতে পারে এবং তাই-ই ঘটছে এ রাজ্যের গ্রামে গ্রামে।

আগের জোতদার-আমলা শাসিত পঞ্চায়েতে গরিব চাষিদের অবস্থা কেমন ছিল সেটাও ভাদু গায়েনরা ধরে রেখেছে—

'পঞ্চায়েতের জ্বালায় হৈল প্রাণে বাঁচা দায়
গরু বাছুর রাখলে পরে, ট্যাক্‌সো দিতে হবে তায়
দুদিন দেরি হলে, চৌকিদার দুয়ারে হাঁকায়।'

পূর্বপুরুষের এই গানের, তাদের অতীত লোক-সংস্কৃতির বিকাশ ঘটিয়েছে তাদের সংগ্রামী উত্তরাধিকারে, নিজেদের গড়া পঞ্চায়েতের আত্মবিশ্বাসে—

'খাজনা মকুব ইবার টুসু চষছে চাষি নিজের ক্ষেত
বীজ ধান সার দিচ্ছে ইখন ঢ্যাঁড়ুরা দিয়ে পঞ্চায়েত।
সেচের কথা ভাবছে সরকার লেভী আদায় নেইকো আর
সনার ধানে ভরবেক টুসু ইবার চাষির ক্ষেত খামার।'

[উপরের ভাদু-টুসু গান দুটি লোকসঙ্গীত বিশেষজ্ঞ শ্রীরামশংকর চৌধুরী সংকলিত]

আজ ভারতীয় গণনাট্য শিল্পীদের এই রকম অজস্র গান ছড়িয়ে পড়েছে বীজধানের মত—গ্রামের গরিব শ্রমজীবী জনগণের বস্তুবাদী সংগ্রামী ভাবনার উদ্দীপনে—তাদের পঞ্চায়েতী বিজয় ও উন্নয়নের গঠনমূলক শ্রমের ছন্দে।

কৃষকের লোক-সংস্কৃতির মধ্যে সম্পৃক্ত আদিম যাদুবিশ্বাস ও সামন্ত-তান্ত্রিক ভাববাদী পশ্চাৎপদতার 'ঐতিহ্য'কে আজ পঞ্চায়েত, রাসায়নিক সার, পাম্প, সমবায় ব্যাঙ্ক, ট্রাক্টর, সেচের জন্য বৈদ্যুতিক ব্যারেজ, গ্রামে গ্রামে ইস্কুল-গ্রন্থাগারের বাস্তব পরিস্থিতির মধ্যে 'পুনরুজ্জীবিত' বা 'সংরক্ষিত' করা নয়, তা সম্ভবও নয়। কারণ যুগে যুগে শ্রমজীবী মানুষ তার অতীতের বিকাশ ঘটিয়েই আজ তার গণমুখী বস্তুবাদী সংস্কৃতির ঐতিহ্য সৃষ্টি করছে। আজকের সংগ্রামী কৃষক তার অতীতকে জানবে, মূল্যায়ন করবে এই দৃষ্টিকোণেই।

বিশ্বযুদ্ধ ও সাহিত্য-সংস্কৃতির সংকট

আজ মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদ বিশ্বজোড়া যুদ্ধ ও যুদ্ধাস্ত্রের ফাঁদ পেতেছে। সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে যুদ্ধ হল আন্তর্জাতিক একচেটিয়া ব্যবসা। যুদ্ধের আতঙ্ক সৃষ্টির টোপ দিয়ে, যুদ্ধের প্ররোচনা সৃষ্টি করে দেশে বিপুল যুদ্ধাস্ত্র বিক্রির বাজার বাড়িয়ে অবক্ষয়ী পুঁজিবাদ বাঁচতে চাইছে। জাতীয় অর্থনীতির সামরিকীকরণ, মানবসভ্যতা ও সংস্কৃতির অবমূল্যায়ন, বিজ্ঞানকে ফ্রাঙ্কেনস্টাইনে পরিণত করা ইত্যাদি ঘটনা উন্নত প্রচার-পদ্ধতির মাধ্যমে তারা দেশে দশে সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শে প্রদীপ্ত গণ-আন্দোলন (যা তাদের প্রধানতম শত্রু) স্তিমিত ও দমন করতে বিশ্বব্যাপী বিপুল উদ্যোগ নিয়েছে।

মানুষের সৃষ্টি বিজ্ঞান মানুষ খুনের কাজে লাগছে। স্বভাবতই যুদ্ধবাজরা এই প্রক্রিয়ায় মানুষকে বিজ্ঞান ও সভ্যতা-বিমুখ করে দেয়। কিন্তু যাঁরা বোঝেন এই অবক্ষয় ও হত্যার পিছনে কোন শক্তি কাজ করছে তাঁরা অবশ্যই আর্নল্ড ওয়েস্কারের সঙ্গেই একমত হবেন। তাঁর 'চিকেন সুপ উইথ বার্লি' উপন্যাসের নায়িকা বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতার পথ, এমন কি নিজের সন্তানের হতাশার পথ ছাড়লেন এই যুক্তিতে—ইলেক্ট্রিক ফিউজ সারাতে এসে মিস্ত্রি সব বাড়িটার আলোই নষ্ট করলো বলে কি আমরা বৈদ্যুতিক আলোরই প্রয়োজন ও দাবি ছাড়তে পারি? সমাজতন্ত্রই আমাদের আলো, আমাদের জীবনের পথ, যাতে মানুষ সুন্দর হতে পারে।

কিন্তু এই সচেতনতার উত্তরণ প্রথম সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ পর্বে সহজলভ্য ছিল না। তখন বিশ্বযুদ্ধের চরিত্র ও ফলাফল সম্পর্কে অস্বচ্ছ ও দ্বিধাগ্রস্ত বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী ও বিজ্ঞানীরা অন্ধ জাতীয়তাবাদের তাড়নায় স্বেচ্ছায় যখন যুদ্ধের সপক্ষে প্রচার করেছেন, যুদ্ধাস্ত্র উৎপাদনে বাধ্য শ্রমিক শ্রেণীর বিরাট অংশও তখন ঐ সব পণ্ডিতদের প্রচারে আচ্ছন্ন ছিল।

ইউরোপে প্রথম যুদ্ধের ধ্বংসাত্মক তাণ্ডবের বিরুদ্ধে স্পষ্ট ঘোষণা রাখলেন ফ্রান্সের আঁরি বারবুস তাঁর 'আণ্ডার দি ফায়ার' উপন্যাসে (১৯১৬)। তবু তিনি এই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের করালগ্রাস থেকে মুক্তির পথ যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, এই সত্য উচ্চারণ করতে পারেননি। রঁমা রঁলাও এই যুদ্ধের কাছে মাথা নোয়াননি। তবে তিনি তখন মানবদরদের প্রকাশ ঘটিয়েছেন যুদ্ধাহত সৈন্যদের সেবা করে। অবশ্য এ কথাও ঠিক, যুদ্ধের আগে কেউই যুদ্ধের বিরুদ্ধে থাকেননি। যুদ্ধের ভয়াবহ বিধ্বংসী

পরিণাম প্রত্যক্ষ করেই যুদ্ধবিরোধী ভূমিকা দেখা দিয়েছে ; এমনকি রুশ দেশে লেনিনের নেতৃত্বে শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবী পার্টি যখন সাম্রাজ্যবাদের বিকল্প সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের সূচনা হয়েছে, তখনও বিশ্বের বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীরা ঐ মহান যুগান্তকারী ঘটনার তাৎপর্য সঠিকভাবে বুঝতে পারেননি। কাজেই যুদ্ধের বিরুদ্ধে মানবতার আর্তি মানেই শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী সংস্কৃতির বিকাশে অংশগ্রহণ নয়, এটাও বোঝা দরকার।

এমনকি যুদ্ধের বিরুদ্ধে সাধারণ শ্রমজীবী মানুষও যে কী বিপুল শক্তিতে ক্রমে প্রতিবাদী হয়ে উঠেছিলেন, সে কথাও ইউরোপের বুর্জোয়া শিবির চেপে যেতেই ব্যস্ত থেকেছে। ঐ সময়ে শ্রমজীবী জনগণেরই অংশ ফরাসী বাহিনীতে যে বিদ্রোহ হয়েছিল, জার্মানীর সেনা বিদ্রোহ যে সাম্রাজ্যবাদী একচেটিয়া পুঁজিপতি শাসকদের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল সেইসব ঘটনা তো কই বুর্জোয়া সাহিত্যে-শিল্পে গৌরবান্বিত হল না। তাঁদের যুদ্ধ-বিরোধিতা কেমন? রেমার্কের 'দি রোড ব্যাক' উপন্যাসের শিক্ষক-নায়ক যুদ্ধ শেষে গ্রামে ফিরে গিয়ে সবার সঙ্গে ভ্রাতৃত্বভাব জাগাতে ও শান্তিপূর্ণ শ্রমদানের আদর্শ প্রচারে আত্মনিয়োগ করলেন ; সেইসঙ্গে এমনও আভাস দিলেন যতদিন *এই যুদ্ধের কারখানা ও কবরখানা থাকবে* ততদিন জ্ঞান-বিজ্ঞান সংস্কৃতির সবকিছুই করুণ পরিহাস ছাড়া কিছু নয়।

ঐ যুদ্ধকে কারা ও কেন সংগঠিত করে এবং তার বিরুদ্ধে জনগণের প্রতিরোধের ভূমিকা কত শক্তিশালী, এইসব শিক্ষায় রেমার্কের শিক্ষক-নায়ক নিজেই শিক্ষিত হতে না পেরে নারোদনিক পেটি-বুর্জোয়া 'ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড়'-এ প্রত্যাবর্তন করেছেন। একই সময়ে এইচ. জি. ওয়েলস আশা করেছেন (তাঁর 'দি অটোক্র্যাসি অব মিঃ পারহাম' বইতে)—বিচারবোধ সম্পন্ন পুঁজিপতিরা যুদ্ধের মূর্খতা বুঝতে সক্ষম হলে তবেই যুদ্ধের বিভীষিকা থেকে পরিত্রাণ সম্ভব। অথচ এরই মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্ব-যুদ্ধের নাগপাশ থেকে মুক্তির একমাত্র পথ যে নভেম্বর বিপ্লব সেটাও জন্মগ্রহণ করেছে সোভিয়েত রাশিয়ায়। তাই এই বিশ্বযুদ্ধের একমাত্র কল্যাণকামী শক্তি বা লক্ষণ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে যে সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধপ্রচেষ্টাকে বা ধ্বংসাত্মক শক্তির প্রকাশকে চিরতরে খতম করা—এই সত্য একমাত্র জনগণের বিপ্লবী সংগ্রামে দায়বদ্ধ লেখকশিল্পীরাই উপলব্ধি করতে পারেন। সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধ-চক্রান্তের স্বরূপ তুলে ধরা, সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শ ও নির্মাণকার্যকে গৌরবান্বিত করা, কোন্ স্বার্থে জনগণকে যুদ্ধের

মধ্যে ঠেলে দেওয়া হয়, দেশে দেশে তার বিরুদ্ধে কিভাবে সংগঠিত প্রতিরোধ গড়ে তোলা জরুরী, এইসব মহান বিষয়বস্তুকে শিল্পসম্মত প্রকাশরীতিতে মানুষের সামনে উপস্থিত করাই আজ শ্রেষ্ঠ মূল্যবোধ।

যুদ্ধের সময়ে বা বিপ্লবের সময়ে ইউরোপের বুর্জোয়া সাহিত্যিকরা অস্বচ্ছ ও সন্দেহপ্রবণ ছিলেন। যুদ্ধ ও বিপ্লবের পর একদিকে ধ্বংসাত্মক, অপর দিকে সৃষ্টিশীল কর্মকাণ্ড দেখে উৎসাহিত হয়েছেন। রলাঁ ও ওয়েলস, এমনকি আমাদের রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত রুশ জনগণের কঠিন আত্মত্যাগ ও সৃষ্টিযজ্ঞকে, বলশেভিকদের কর্মপ্রয়াসকে অভিনন্দিত করেছেন। কিন্তু কোন্ আদর্শের পথে কিভাবে নিজের নিজের দেশের জনগণকে সমাজতন্ত্রের পথে আকৃষ্ট করা যাবে সে সম্পর্কে কোন বক্তব্য রাখতে পারেননি।

অবশ্য প্রকৃতপক্ষে বিপ্লবের সমর্থক লেখক-বুদ্ধিজীবীরাও তাঁদের সৃষ্টিকে যে পুরোপুরি শিল্পসম্মত করতে পেরেছেন তা নয়। জন রীড, রিজ্ উইলিয়াম্স, প্রাইস প্রমুখ লেখকদের বিপ্লবমুখী রচনা যতটা তথ্যমালার বিবরণ ততটা মর্মস্পর্শী সাহিত্য হতে পারেনি।

কিন্তু একদিকে ইউরোপের পুঁজিবাদী অর্থনীতির অবক্ষয়ী রূপ, অন্য দিকে বিপ্লবোত্তর রুশ দেশে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির গঠনমূলক নবযৌবনের প্রাণস্ফূর্তি যখন বিশ্বের বিবেকী লেখক-বুদ্ধিজীবীদের চেতনায় বৈপরীত্যের তরঙ্গ সৃষ্টি করল, তখনই প্রকৃত অর্থে বিপ্লবী সাহিত্যে সক্রিয় কল্পনার প্রকাশ হতে থাকল, নতুন সর্বহারা সাহিত্যের শরীরে শিল্পের ছোঁয়া লাগল। তবু এটাও ঘটনা যে, পুরোন পুঁজিবাদী অবক্ষয়ে বিদ্রোহী ও দোলাচল লেখক-শিল্পীরা নতুন সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার সৃষ্টিশীল কর্মধারায় মুগ্ধ হয়ে অভিনন্দনের হাত নাড়লেও অতীত ভাবাদর্শের রেশ একেবারে মুছে ফেলা সহজ নয়।

দেখা গেছে, পশ্চিমী বিবেকী সৎ বুদ্ধিজীবীরা নতুন সোভিয়েত সমাজের প্রতি আকৃষ্ট হলেও নিজেদের দেশের জনগণ ও কমিউনিস্ট পার্টি সম্পর্কে একটা দায়সারা সার্টিফিকেট দিয়ে প্রধানত তাদের ত্রুটি দুর্বলতা নিয়েই বেশি ব্যস্ত থাকেন। কিন্তু আমরা ভুলি না যে, পশ্চিমী দেশগুলির পেটি-বুর্জোয়া হামবড়াই ঝোঁক তো দূরের কথা, লেনিন যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধকে দেশে দেশে গৃহযুদ্ধে রূপান্তরিত করার আহ্বান দিয়েছিলেন, তখন প্লেখানভ প্রমুখ বাঘা পণ্ডিতরাও তাকে দিবাস্বপ্ন বলে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলেন।

আসলে পুঁজিবাদী অবক্ষয়, আক্রমণ ও বুর্জোয়া গণতন্ত্রের ভণ্ডামির প্রতি অনাস্থার নেতিবাচক ভূমিকা থেকে বুর্জোয়া লেখক-শিল্পীরা সমাজতান্ত্রিক ও ফ্যাসিবাদী মতাদর্শের সামনে এসে যখন হ্যামলেটের মত 'টু বি অর নট টু বি' তে দোলাচল থাকেন, তখন তাঁদের পক্ষে ফ্যাসিবাদেরই তাৎক্ষণিক আকর্ষণ বেশি—একই সঙ্গে ভয়ে ও লোভে। একদিন যে বুদ্ধিজীবী লেখকরা মার্কসবাদীদের রাজনীতি-সাপেক্ষতা বা গণমুখীনতার তত্ত্বকে পাগলামি বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন, ফ্যাসিস্ট একনায়কতন্ত্রের পর্বে তাঁদের অনেকেই গোয়েবলস্-মুসোলিনী-ফ্রাঙ্কোর আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন। সর্ব-হারা বিপ্লবের সামনে যাঁরা 'আমাকে একটু শান্তিতে থাকতে দিন', 'নিবিড় সৃষ্টির মধ্যে মগ্ন থাকতে দিন' বলেছিলেন, তাঁরাই ফ্যাসিস্টদের বন্দীশালা ও ফ্রাঁ-ডলারের সামনে বলেছেন—'সামরিক একনায়কতন্ত্র? কেন নয়: দেখাই যাক না! তাছাড়া ডায়নোসারের বিরুদ্ধে লড়াই? ওসব আদর্শবাদী উজবুকদের পাগলামি!' এই বলতে বলতে তাঁরা নিক্ষিপ্ত বিবেকী ও কমিউনিস্ট লেখক-শিল্পীদের বন্দীশালার পাশ কাটিয়ে মানুষের সংস্কৃতি ও ইতিহাসহীনতার অন্ধকারে ফিরে গিয়ে শুধুই জাতিগত ও আত্মসর্বস্ব বৈশিষ্ট্যের জাবর কাটাকেই পরম সুখ বা ধূর্ত শৃগালের বাস্তববুদ্ধি অনুভব করেছেন। মনে হয়, এইসব পেটি-বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীরা ফ্যাসিস্ট রাজনীতি ও সংস্কৃতির চেয়ে মার্কসবাদ ও শ্রমিক-শ্রেণীর বিপ্লবী মতাদর্শের জাগরণে বেশি বিপন্ন বোধ করেছেন। পরে অবশ্য অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে অনেকের এই অবস্থাও কেটেছে, এটাও ঘটনা।

আমরা লক্ষ্য করেছি, এক সময়ে আপ্টন সিনক্লেয়ার সোভিয়েত বিপ্লবকে সমর্থন করে বিশ্বাসঘাতক কাউৎস্কিকে নির্দেশ করে বলেছিলেন—এই ভদ্র-লোক আমেরিকার সেই গেঁয়ো চাষির মত যে সামনে উট দেখে বলে—নাঃ পৃথিবীতে এমন কোন জন্তু নেই। এই সিনক্লেয়ারই শেষ পর্যন্ত পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে যেতে 'ব্রিটেন আমেরিকার মত নিয়মতান্ত্রিক সরকার ভাঙার বা শ্রেণীগত সংঘাতের ডামাডোলের দরকার হবে না' বলে ফতোয়া দিয়েছেন। আবার যে বার্ণার্ড শ সমাজতান্ত্রিক রুশ দেশ ঘুরে এসে 'টু গুড টু বি ট্রু' ও 'অন দি রকস'-এর মত বুদ্ধিদীপ্ত বিপ্লবী নাটক লিখেছেন, তিনিই শেষ পর্যন্ত হিটলার-মুসোলিনীর সাংগঠনিক ও সৃজনশীল দর্শনের প্রশংসায় মুখর হয়েছেন।

মোদ্দা কথা এটাই যে, কেবলই দূর থেকে সোভিয়েট সমাজতন্ত্রের

প্রশংসার ফুল ছুঁড়ে দিলেই নিজেকে প্রগতিশীল করা যাবে না, যদি না নিজেদের দেশের শ্রমজীবী শ্রেণীর গণতান্ত্রিক অধিকার ও বিপ্লবী সম্ভাবনা সম্পর্কে বিশ্বাস ও মূল্যবোধ অর্জন করা যায়। এটা না হলে অনেক তথাকথিত খ্যাতিমান পণ্ডিত-বুদ্ধিজীবীও ফ্যাসিবাদের খপ্পরে পড়ে যান।

আসলে ফরাসী বিপ্লবের মানবতা ও ন্যায়বিচারের মূল্যবোধ এবং ব্যক্তিত্বের সুস্থ বিকাশের প্রতিশ্রুতি যখন ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদের ভয়ংকর কুৎসিত আক্রমণে বিপন্ন হয়েছে, তখন সেই অনিশ্চয়তা ও সন্দেহের অক্টোপাসী গ্রাস থেকে মুক্তির একমাত্র পথ নভেম্বর বিপ্লবের পথ—সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শ ও তার সংগ্রামী কর্মসূচীতে অংশগ্রহণের পথ। তা নইলে ঐ অবক্ষয়ী পুঁজিবাদেরই বাঁচার সংস্কৃতি ফ্যাসিবাদী বন্ধ জলায় বা নোংরা পচা খাদে পড়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই।

বিশ্ব-চলচ্চিত্র উৎসবে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের পটভূমিকায় তোলা ফ্রান্সের একটি ছবিতে দেখা গেল, শিশুর খেলনা বোমায় পরিণত হচ্ছে, দেয়াশলাই বাক্স বিস্ফোরিত হয়ে আগুনের হলকায় আকাশ ছুঁলো, বড় বড় বাড়ির মেরুদণ্ড মোমের মত গলে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। পাশাপাশি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও তার বিকাশের পটভূমিকায় আমরা কি এমন ছবি কল্পনা করতে পারি না যাতে বোমারু বিমানগুলো এক ঝাঁক উজ্জ্বল পায়রাতে রূপান্তরিত হল, ভয়ংকর মারণাস্ত্রে সজ্জিত বিশ্বের সামরিক ঘাঁটিগুলো ভোরের রক্তিম আলোয় ক্রমশ শিশুদের খেলার জন্য ফুলেভরা বাগানে পরিণত হচ্ছে! ১৯০৫ সালে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পর্বে লেনিন জারের সন্ত্রাস ও বুদ্ধিজীবীদের বিশ্বাস-ঘাতকতায় ক্লান্ত বলশেভিক যুবকদের এই রকম সমাজতান্ত্রিক স্বপ্নই দেখতে বলেছেন। গোর্কি একেই বলেছেন 'সক্রিয় কল্পনা' প্রায় একই সময়ে ডস্টেয়ভস্কির নায়ক-নায়িকারা ব্যক্তিআত্মার যন্ত্রণায় ও আত্মসমীক্ষার তাগিদে আর্তনাদ করছে; অর্থাৎ প্রচলিত ব্যবস্থা ও দুঃসময়কে মেনেও নিতে পারছে না, আবার সমাজব্যবস্থা বদলের দিকে বলশেভিক ঘোড়সওয়ারও হতে পারছে না। তবে প্রুস্তের নায়ক-নায়িকার মত ড্রয়িং-রুম মনবিকলনের জাবর কেটে 'নিজেদেরকে বিশ্লেষণেরও বাইরে' রাখার আত্মপ্রসাদে বুড়ো কুকুরের মত ঝিমোচ্ছে না ডস্টেয়ভস্কির নায়ক-নায়িকারা, এটাই মাত্রায় ইতিবাচক। তখন আইরিশ কথাশিল্পী জেমস জয়েসের সাহিত্যভঙ্গিতে ইউরোপীয় বাজার রমরমা। এই জয়েস বিশ্বযুদ্ধের পর্বে (১৯১৬) আয়ার্লাণ্ডের মধ্যবিত্তদের

গড়া জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ধারেকাছে না গিয়ে নায়ক-নায়িকাদের নিয়ে ফেললেন বেশ্যালয়ে আর মদের দোকানে।

এই থেকেই সুরু হল চেতনাচেতন আত্মহননের মনস্তাত্ত্বিক ময়নাতদন্ত। প্রশ্ন হল, ঐ পর্বে তাঁর দেশ, সারা ইউরোপ, গোটা দুনিয়াই কি ঐ রকম সংকীর্ণ চেতনাস্রোতে পচা পাঁকের কূপে খাবি খেয়েছে? এটাই কি অবক্ষয়ী সমাজের একমাত্র বাস্তবসত্য ও সাহিত্যাঙ্গিক হতে পারে?

সৎ ও বিবেকী বুর্জোয়া দার্শনিক ওয়ালটার বেঞ্জামিন তাঁর 'থিসিস অন ফিলসফি অব হিস্ট্রি'তে সমাজতন্ত্রের আবির্ভাব কল্পনা করেছেন এইভাবে—অতীতের দিকে মুখ করা এক দেবদূত বহু ম্লান ধ্বংসাত্মক ঘটনার বৃত্তের দিকে তাকিয়ে রয়েছে ডানা মেলে। সহসা এক প্রবল ঝড় ধেয়ে এল স্বর্গ থেকে। দেবদূত তার ডানা মুড়তেই পারলো না। এই 'এঞ্জেলাস নোভাস'-এর দ্বারা প্রুস্ত, জয়েস, কাফ্‌কা, এলিয়ট প্রমুখ অনেকের সঙ্গে ব্রেখ্‌ট ও মায়াকভস্কিও অনুপ্রাণিত হয়েছেন। তবে শেষের দুজনের দেবদূতের মুখ সামনের দিকে—ধ্বংসের মধ্যেও ভবিষ্যতের স্বপ্নের দিকে।

আমার ধারণা, সাম্রাজ্যবাদী ধ্বংসাত্মক ও অবক্ষয়ী ভূমিকার প্রতিবাদী মূল্যবোধের বিচারে এই রকম রোমান্টিক কল্পনা নিঃসন্দেহে অবক্ষয়ী স্থূল বাস্তবতার তুলনায় মূল্যবান হলেও, সমাজতন্ত্র সম্পর্কে এটাও এক ধরণের সরলীকৃত বুদ্ধিজীবীসুলভ ভাববাদী অনুভবকেই প্রশ্রয় দেয়। কারণ সমাজতন্ত্রের জন্মকে স্বর্গ থেকে ঝড়ের প্রতীকে অথবা মানবসভ্যতার ইতিহাসকে দেবদূতের মুখ ও ডানার অবস্থান-বৈচিত্র্যে উপস্থাপিত করলে, আইজেনস্টাইনের 'ব্যাটেলশীপ পোটেমকিন' বা পিকাসোর 'গুয়েনির্কা'তে পরিস্ফুটিত জনগণের কান্না-ঘাম-রক্তের সংগ্রামী অতীত থেকে বিকশিত বলিষ্ঠ আগামী দিনের বাস্তবসত্য প্রতিভাত হয় না। এইজন্যই শিল্প-সাহিত্যের সামগ্রিক রূপকল্পের জন্য মার্কসীয় দ্বন্দ্বমূলক দর্শনের পাঠ ও উপলব্ধি অপরিহার্য। অবশ্য অ-মার্কসবাদী সৎ ও নিষ্ঠাবান লেখক-শিল্পীদের ফ্যাসিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী পাশবিক আগ্রাসী বাস্তবতাকে অস্বীকারের ভূমিকাও প্রকৃত গণমুখী ও বৈজ্ঞানিক সমাজপ্রগতির মূল্যবান সহযোগিতা, এটা যেন না ভুলি।

[এই প্রবন্ধে বিশেষকরে কার্ল রাদেক রচিত 'যুদ্ধকালের বিশ্ব-সাহিত্য'-এর সাহায্য নিয়েছি—লেখক]।

বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের সংস্কৃতিচিন্তা

প্রায় একই সময়ে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর্বে রঁমা রঁলা শান্তি ও বিশ্ব-মানবিকতার সপক্ষে দুটি চিঠি লিখলেন। একটি বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইনকে, অপরটি জার্মান নাট্যকার 'উইভার' খ্যাত হাউপ্টমানকে। আইনস্টাইন উত্তরে জানালেন, "গত আটমাস ধরে, এমন কি বিভিন্ন দেশের মনীষী ও পণ্ডিত ব্যক্তিরা পর্যন্ত এমনভাবে কোমর বেঁধেছেন যাতে মনে হচ্ছে তাঁদের মস্তিষ্কগুলিকে কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে।" ১৯১২ সালের নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত হাউপ্টমান উগ্র জাতিদম্ভের তাড়নায় লিখেছিলেনঃ "মৃত জার্মানরা গ্যেটের বংশধর বলে যদি মনে করতে চায় করুক, কিন্তু জীবিত জার্মানরা যেন নিজেদের অত্তিল্লার বংশধর বলেই মনে করে।" একদিকে এনলাইটনারদের উত্তরসাধনায় যুক্তিবাদ ও বিশ্বজনীন মানবতাবোধ, অপরদিকে ভাববাদী আধ্যাত্মিক দর্শনের উত্তরসাধনায় সোস্যাল ডেমোক্র্যাসির কদর্য জাতীয়তাবোধ।

ফ্রান্সেও তখন রলার 'জাঁ-ক্রিসতফ', 'যুদ্ধের ঊর্ধে' রচনাকে নির্দেশ করে উগ্র-জাতীয়তাবাদী লেখক-বুদ্ধিজীবী ও সাংবাদিকরা 'দেশদ্রোহী', বলে গালি-গালাজ বর্ষণ করেছে। জার্মানির প্রখ্যাত লেখক টমাস মান (পরে বদলেছিলেন), হেরমান হেসে এবং নোবেল-বিজয়ী বিজ্ঞানী অস্টওয়াল্ড ও লেনার্দ প্রমুখ 'দেশপ্রেমিক'গণও জাঁক করে ঘোষণা করেছেনঃ বিশুদ্ধ জার্মান রক্তের শ্রেষ্ঠতা, জার্মানিই হল পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি, ইউরোপীয় সভ্যতার কেন্দ্র, জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের কারণে জার্মানির বিজ্ঞানও সর্বশ্রেষ্ঠ, সামরিক অভিযান চালিয়ে অন্যান্য নিকৃষ্ট জাতিকে পদানত করে ইউরোপীয় সভ্যতার পুনর্জাগরণ ঘটানো জার্মানির ঐশ্বরিক কর্তব্য ইত্যাদি। কিন্তু এই রকম আসুরিক আস্ফালন থেকে বিরত রইলেন আলবার্ট আইনস্টাইন। তিনি জানালেন—যুক্তি আজ বিপন্ন। সারা ইউরোপের বুদ্ধিজীবী-ব্যক্তিত্বের আজ দারুণ দুঃসময়। ইউরোপীয় রেনেসাঁসের পরে তিন শতাব্দিব্যাপী যুক্তিবাদী ও চিন্তাশীল মনীষীদের সুগভীর জীবনসাধনায় যে ধর্মের গোঁড়ামি ও কুসংস্কারের ভূত অপসারিত হয়ে নতুন সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে, সেই ধর্মীয় গোঁড়ামি এখন অন্ধ ও উগ্র জাতীয়তাবাদের তাণ্ডবে মাথা চাড়া দিয়েছে।

বৈপ্লবিক যৌবনকালে বুর্জোয়ারা যে-মানুষকে সেক্সপীয়ারের কণ্ঠে 'প্রকৃত ঈশ্বর' বলেছিল, ঔপনিবেশিক ও সাম্রাজ্যবাদী স্তরে এসে তারাই মধ্যযুগীয় ধর্ম-প্রথা, ভাষা, সাদা-কালো ও সভ্য-বর্বর ভেদ এনে 'এলাইটিজম' ও 'রেসিজিম'-এর দার্শনিক সাফাই বানিয়ে নিল। ঔপনিবেশিক শোষণ ও জাতি-বৈষম্যের উপর নির্ভর করলো ইউরোপীয় ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও সংস্কৃতির মূল্যবোধ।

যুদ্ধ শেষে, ১৯১৯ সালে রচিত 'প্যারাডাইস লস্ট' নিবন্ধে আইনস্টাইন বললেন, জাতীয়তাবাদের স্বর্গ গেল ভেঙে; এবার মানুষ আন্তর্জাতিক গুরুত্ব উপলব্ধি করে বিশ্বসভ্যতার বিকাশে অংশ নিতে পা ফেললেন।

আণবিক যুদ্ধের ব্যাপক ও নির্মম ধ্বংসস্তূপের উপর দাঁড়িয়ে বিজ্ঞানী লিখলেন—আমি প্রতিদিনই শতবার নিজের কথা যখনই ভাবি, তখন বুঝি আমার অন্তর ও বাহিরের জীবন অপর মানুষের শ্রমের উপর নির্ভর করে রয়েছে; তাই আমি ঠিক করেছি, আমি যা ও যেভাবে তাঁদের কাছে পেয়েছি এবং এখনও পাচ্ছি, তেমনি করেই আমি শ্রমজীবী মানুষের কাছে আমার সমস্ত উদ্যোগ ফিরিয়ে দেব। তিনি বুঝেছেন, সমাজের শ্রেণীভেদ ও ন্যায়বিচার—এরা পরস্পরের দিকে মুখ ফিরিয়েই রয়েছে। ন্যায়বিচার হল মুখোশ; আসলে বলপ্রয়োগের নীতির উপরই সমাজের শ্রেণীভেদ দাঁড়িয়ে রয়েছে। কাজেই ভাববাদী দর্শনের ঠুলি পরে 'মানবিক স্বাধীনতা'কে মান্য করার কোন অর্থই নেই। আইনস্টাইন স্বীকার করেছেন, প্রথম যৌবনে শোপেনহাওয়ারের 'মানুষের ইচ্ছাশক্তিই সব'—এই ধারণায় অনুপ্রাণিত ছিলেন। কিন্তু যত দিন গেছে বুঝেছেন, এর দ্বারা মানুষের দায়িত্ববোধ চরিতার্থ হতে পারে না। বরং অচিরেই তা অসার ও পঙ্গু হতে বাধ্য। এতে এক ধরণের নিষ্ক্রিয় সান্ত্বনাবোধ জাগে এবং জীবনকে গুরুত্বের সঙ্গে নেওয়ার তাগিদ নরম ও দুর্বল হয়ে পড়ে। মানুষের স্বাধীনতা ও কর্মপ্রয়াসের ক্ষেত্রে দ্বন্দ্বমূলক নিয়মকে মেনেই তিনি বলেছেন, মানুষ কেবলই বাইরের চাপে কাজ করে তা নয়, ভিতরের তাগিদও তাকে কর্মপ্রয়াসে রূপান্তরিত করে। যুদ্ধের পর সারা ইউরোপে অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংকটের সময়ে তাঁকে সবচেয়ে বেশী ভাবিয়েছিল মানুষের বিচ্ছিন্নতার সমস্যা। তিনি যখনই ন্যায়বিচার ও সামাজিক দারিত্ববোধ নিয়ে ভাবতে গেছেন, তখনই দেখেছেন তাঁর মানবিক স্বাধীনতা ও কর্মপ্রয়াসের ধারণার সঙ্গে মানুষ ও তার প্রতিবেশী-পরিবেশের বিচ্ছিন্নতা ও বৈপরীত্য বিশ্রীভাবে পথ জুড়ে বসছে। তিনি

উপলব্ধি করেছেন, এই বিচ্ছিন্নতার বাধা সরানোর কাজই প্রকৃত অর্থে বিজ্ঞানী ও অন্যান্য সংস্কৃতিকর্মীদের সামাজিক ভূমিকা।

এই থেকেই তাঁর গণতন্ত্রবোধ গড়ে উঠেছে। নিজের কথায়ঃ 'সব মানুষই শ্রদ্ধেয় হোক, কেউই যেন বিচ্ছিন্ন না থাকে।' এই বোধের অভাবেই মানুষ স্বৈরতন্ত্রী ফ্যাসিস্টদের ভয় ও মায়ার বেড়াজালে রুদ্ধশ্বাস হয়ে পড়ে, নৈতিক অধঃপতনের বদ্ধ জলায় খাবি খায়। একনায়কতন্ত্রের ফ্যাসিবাদী ঝোঁক রাষ্ট্রব্যবস্থাকে কাদায় ফেলে গোটা জাতি ও মানব সমাজকে পর্যন্ত পচা পাঁকের বেনো জলে ডুবিয়ে দিতে চায়, ভাসিয়ে নিয়ে যায়। এই অবস্থায় উগ্র-জাতীয়তাবাদ ও ভয়ংকর ব্যক্তি-পূজার ঝোঁক সম্পর্কে আইনস্টাইন বলেছেনঃ

"This plauge-spot of civilisation ought to be abolished with all possible speed. Heroism by order, senseless violence and all the pestilent nonsense that goes by the name of patriotism —how I hate them. War seems to me a mean, contemptible thing ; I would rather be hacked in pieces than take part in such an abominable business" (The world as I see it).

তিরিশের দশকে যখন সারা ইউরোপে ফ্যাসিবাদের নগ্ন প্রেতনৃত্য চলছে এবং তারই জঘণ্য ছায়া এশিয়া ও আফ্রিকার দেশে দেশে আতংক ও মৃত্যু ছড়াচ্ছে, তখন আইনস্টাইন তাঁর 'বিজ্ঞান ও সভ্যতা' (১৯৩৩) নিবন্ধে বিশ্বের অর্থনৈতিক সংকট ও শ্রমজীবী মানুষেব দারিদ্র-দুর্দশার প্রশ্নে যে বক্তব্য রেখেছেন, নিঃসন্দেহে তার মূল্য ঐতিহাসিক। সেই মুহূর্তে কি করে মানবসমাজ ও তার অর্জিত গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে রক্ষা করা যায় এবং কি করে ইউরোপকে আরও একটি মর্মান্তিক বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব, এই চিন্তাই তাঁকে ব্যস্ত রেখেছিল।

বিশ্বশান্তির প্রশ্নকে তিনি রাষ্ট্রনায়কদের চুক্তিপত্রে সীমাবদ্ধ দেখতে চাননি। প্রকৃত শিক্ষা-সংস্কৃতির উপর রেখে সমস্যাটির বিচার করেছেন। উল্লেখযোগ্য. প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর 'লীগ অব নেশনস' বা রাষ্ট্রনায়কদের আন্তর্জাতিক সংগঠনে আর বিশ্বাস রাখতে পারছেন না। তিনি বলেছেন, যে আগ্রাসী রাষ্ট্রশক্তি মানবসংস্কৃতি ও ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে দাবিয়ে রাখতে উদ্যত, আমরা যদি তার প্রতিরোধ করতে চাই, তবে নিজেরা আগে পরিষ্কার হতে হবে—মানুষের কোন্ শক্তি ও সম্পদ আজ বিপন্ন। দীর্ঘ সংগ্রামের

মধ্য দিয়ে আমাদের পূর্বসূরীদের মূল্যবোধের উত্তরাধিকার অর্জন করেছি। সেই সময়ে ফ্যাসিবাদের রাষ্ট্রীয় অক্টোপাস মানুষের বুদ্ধি, বিবেক, যুক্তি ও বিজ্ঞানের প্রয়োগ এবং বিকাশের পথ রুদ্ধ করে দাঁড়িয়েছে। তিনি লক্ষ্য করেছেন, যে-মুক্ত পরিবেশে সেক্সপীয়ার, গ্যেটে, নিউটন, ফ্যারাডে, পাস্তুর ও লিস্টার প্রমুখ মহান স্রষ্টাদের আবির্ভাব ও অবদান সম্ভব হয়েছিল, তা-ও অনুপস্থিত। মানুষ যদি তার স্বক্ষেত্রের কার্যক্রমকে বাস্তবায়িত করতে, সেইমত পরিবেশ সৃষ্টি করতে না পারত, তবে রেলপথ, টেলিগ্রাফ, ঔষধপত্র, গ্রন্থপ্রকাশ ও উন্নততর যন্ত্রপাতি সৃষ্টি হত না। সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির অভাব মানেই মধ্যযুগীয় এশীয় স্বৈরতন্ত্রের মত দানবীয় রাজত্বে ক্রীতদাসের জীবন যাপন করা। অথচ মানুষের ধর্মই হল স্বাধীনতা। এটা তার অর্জিত গৌরবময় অধিকার, যা কেবলই সে ভোগ করবে না, তাকে রক্ষা ও বিকশিত করবে। এরই নাম সভ্যতার ক্রমবিকাশ।

লক্ষ্য করার মত, আইনস্টাইন ফ্যাসিস্ট আক্রমণের মুখে সভ্যতার সংকটের প্রশ্নে বার বার অর্থনীতির প্রসঙ্গও তুলে ধরেছেন। লেনিন ও স্তালিনের 'সাম্রাজ্যবাদ' ও 'ফ্যাসিবাদ'-এর মূল্যায়ন এবং তাঁদের সমাজতান্ত্রিক সমাধানের দৃষ্টিকোণে তাঁর অর্থনৈতিক প্রসঙ্গগুলির সীমাবদ্ধতা থাকলেও, সমকালের মিল-ম্যালথাসীয় পচাগলা বুর্জোয়া ভাবাদর্শের তুলনায় অবক্ষয়ী সংস্কৃতির প্রসঙ্গে তাঁর অর্থনীতির বিচার অনেক র‍্যাশনাল। তিনি এই 'বিজ্ঞান ও সভ্যতা' নিবন্ধেই সংকটাপন্ন সংস্কৃতিকে বাঁচাতে শ্রমের যোগান ও চাহিদা এবং উৎপাদন ও ভোগের ভারসাম্য রাখার উপর গুরুত্ব দিয়ে এগিয়ে আসতে ও সঙ্ঘবদ্ধ হতে মানুষের সচেতনতা ও সক্রিয়তাকে আহ্বান জানিয়েছেন। 'ইতিহাসের এক বিপজ্জনক অবক্ষয়ের মধ্যে রয়েছি—এই ভেবে কি আমরা কেবলই উদ্বিগ্ন ও নিরাশ হয়েই আমাদের অনুভূতির পরিচয় দেব?' এই প্রশ্নে তিনি স্পষ্ট ও জোরালভাবেই আশাবাদী ও ইতিবাচক পদক্ষেপের সৈনিক। বাধার মুখেই মানুষ সমাধানের জন্য নাড়া খায়, সাড়া জাগে তার চেতনায় এবং সেই সচেতন ও ইতিবাচক কল্পনাশক্তির মধ্যে সে তার কর্মধারাকে স্থিরলক্ষ্য ভবিষ্যৎ রচনায় রূপান্তরিত বরে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার ভিয়েনাতে 'জয়েন্ট পীস কাউনসিল-এর উদ্যোগে যে বাধ্যতামূলক সৈনিকবৃত্তি ও সমর শিক্ষার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে ওঠে, আইনস্টাইন ছিলেন তার অগ্রণী ভূমিকায়। এই সময়ে নিউ ইয়র্কের 'রিজ কার্লটন' হোটেলে 'যুদ্ধ

ও শান্তির সমস্যা' বিষয়ে অনুষ্ঠিত এক সভায় নিষ্ক্রিয় শান্তিবাদীদের কটাক্ষ করে তিনি বলেন ঃ

Pacifist speakers comlng to a meeting like this frequently become like sheep talking to other sheeps. The wolves are always just outside the door."

তাঁর এই দীর্ঘ বক্তৃতাটি নিউ ইয়র্ক হেরাল্ড ট্রিবিউন, ১৫ই ডিসেম্বর ১৯৩০ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

আইনস্টাইনের 'সমাজ ও ব্যক্তিত্ব' নিবন্ধটি ফ্যাসিবাদী অরণ্যের গর্ভ থেকে বিচ্ছুরিত বিবেকী চিন্তার একটি মূল্যবান হীরক খণ্ড। ব্যবহারিক ও আত্মিক জীবনে ব্যক্তি ও সমাজ পরস্পর দ্বান্দিক সম্পর্কে ক্রমবিকাশশীল, এই বক্তব্যই এই নিবন্ধের প্রতিবাদ্য বিষয়। আমাদের জ্ঞান, বিশ্বাস ও ভাষা সহ ব্যবহারিক জীবনের সবকিছুই সামাজিক উৎপাদনের সঙ্গে ক্রিয়াশীল। অবশ্য তিনি কখনই অচল অবরোধে আবদ্ধ ধর্মীয় প্রথা-সংস্কারে বাঁধা সমাজের অনুগত থাকাকে ব্যক্তিত্বের মূল্যবোধ বলে নির্দেশ্র করেননি। বরং মধ্যযুগীয় অবরোধের নাগপাশ থেকে ব্যক্তিত্বের মুক্তিকেই রেনেসাঁসের গৌরবময় ভূমিকা বলে উল্লেখ করেছেন। জার্মানির ফ্যাসিস্ট রাজত্বে কিভাবে মানুষের প্রতিভা ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের পরিপন্থী তার বর্ণনা দিয়ে বলেছেন ঃ

"···বিশেষ করে শিল্পের ক্ষেত্রে মহান স্রষ্টার অভাব খুবই মর্মান্তিক। চিত্র ও সঙ্গীত অধঃপতনে নিমজ্জিত। এ সবের কোন জনপ্রিয় আবেদনই নেই। রাজনীতিতে প্রকৃত নেতৃত্বের অভাব দেখা দিয়েছে এবং নাগরিকদের স্বাধীন চেতনা ও বিচারবোধ মারাত্মকভাবে অবনমিত হয়েছে। সংসদীয় গণতন্ত্রের স্থানে বিভিন্ন দেশে ফ্যাসিস্ট একনায়কতন্ত্র মাথা চাড়া দিচ্ছে। মানুষের মর্যাদাবোধ ও অধিকারবোধ এমনই অসাড় ও দুর্বল হয়ে পড়েছে যে, ফ্যাসিজিমও সহনীয় হচ্ছে···কিন্তু আমি বিশ্বাস করি উন্নততর সময় আসছে।" এই 'উন্নততর সময়' কিভাবে আসবে ? তার মতে, এর জন্য পরিকল্পিত শ্রমবিভাজন চাই এবং প্রতিটি ব্যক্তির অর্থনৈতিক নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হতে পারে, এই লক্ষ্যে শিল্প ও প্রযুক্তি-বিজ্ঞানের প্রসার অবাধ রাখা দরকার। কারণ, গোটা সমাজের সামরিকীকরণ ঘটিয়ে এবং যন্ত্র ও বিজ্ঞানের সমস্ত শক্তিকে সামরিক প্রয়োজনে লাগিয়ে কোন জাতি তার অকালমৃত্যু ঠেকাতে পারে না।

স্মরণ রাখা দরকার, সংস্কৃতির অবক্ষয়ের জন্য আইনস্টাইন অর্থনীতির প্রশ্ন এনেছেন, অর্থ-ব্যবস্থার গভীরে যাননি, অথবা তাঁর মত বুর্জোয়া

এনলাইটনারের পক্ষে যতটা যাওয়া সম্ভব ততটাই গেছেন। প্রথমতঃ তিনি প্রচলিত কাঠামোর মধ্যেই সদিচ্ছার প্রকাশ করেছেন; দ্বিতীয়তঃ সংস্কৃতিকে তিনি প্রয়োজনীয় জীবনচারণ থেকে স্বতন্ত্র চর্চা ও অভিনিবেশের বিষয় বলে নির্দেশ করেছেন। এই প্রসঙ্গে তার 'সংস্কৃতি ও সমৃদ্ধি' রচনায় বুর্জোয়া ব্যাক্তিত্ববাদের প্রতিফলন হলেও, তিনি এটাও বলেছেন যে, সাংস্কৃতিক মূল্য-বোধ সম্পর্কে শ্রদ্ধার ঐতিহ্য তখনই গড়ে উঠেছে বলে ধরা হবে, যখন কোন জাতির শ্রমজীবী মানুষের শ্রম ও উৎপাদনের মহান অবদানকে সেই জাতির সাংস্কৃতিক সৃষ্টিকর্মে সানুরাগে বিধৃত হচ্ছে বলে দেখা যাবে।

আইনস্টাইন ১৯৩৫ সালে লেখা তাঁর 'বিজ্ঞান ও সমাজ' রচনায় স্পষ্ট-ভাবে ঘোষণা করেছেন—বিজ্ঞানকে ধ্বংসাত্মক কাজে লাগানোই বিজ্ঞান বিরোধিতা। এটা ফ্যাসিস্ট বা সমরবাদী রাষ্ট্রের কাজ এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রযুক্তিবিদ্যা ও বিজ্ঞানকে মানবসভ্যতার স্বাস্থ্যে ও বিকাশে কাজে লাগায়। প্রসঙ্গতঃ তিনি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার মালিকানার প্রশ্নও তুলেছেন। তবে ধনতান্ত্রিক উৎপাদনব্যবস্থা মাফিক প্রাইভেট সম্পত্তি বা উৎপাদনের উপায়ের মালিকানা ও তার সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনা করেননি। কিন্তু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা তার মৌলিক ভূমিকা পালন করুক, অর্থাৎ মানবিক সম্পদ ও শক্তি বৃদ্ধি করুক, তীব্রভাবে এটাই চেয়েছেন।

উল্লেখযোগ্য যে, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্র এবং বিজ্ঞান প্রযুক্তির মালিকানার প্রসঙ্গে তাঁর আলোচনায় অসম্পূর্ণতা ও সীমাবদ্ধতা থাকাই স্বাভাবিক। তবু উদার বুর্জোয়া মানবিকতার দৃষ্টিতে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ও ফ্যাসিবাদী বর্বরতা সম্পর্কে বিশ্ববাসীর কাছে যে ঘৃণা বিলিয়েছেন তার তুলনা রঁলা, রবীন্দ্রনাথ, আঁরি বারবুস, পল রবসন ও গোর্কি প্রমুখ মহান স্রষ্টাদের উজ্জ্বল ভূমিকা। বিজ্ঞান মানুষের চিন্তা-ভাবনাকে কিভাবে রূপান্তরিত করে তার আলোচনায় তিনি প্রাক্-বৈজ্ঞানিক যুগের আদিম মানসিকতার ব্যাখ্যা করেছেন। বিজ্ঞানের অভাবেই যে ভূত-প্রেত ও অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস গজিয়ে উঠেছিল, এবং বিজ্ঞানই যে মানুষকে তার এইসব ভয়ংকর অনুভূতি ও প্রকৃতির কাছে অসহায়তাবোধ থেকে মুক্তি দিয়েছে তার সবিশেষ উল্লেখ করেছেন। বোঝা যায়, সমকালের ফ্যাসিবাদী দর্শনের বিজ্ঞানবিমুখতাকে নির্দেশ করেই তিনি আদিম সমাজের এ্যানালজি এনেছেন। এই সময়ে মুসোলিনীর অধীনে বিচার ও শিক্ষামন্ত্রী সিগনর রকোর (১৯২৫-৩২) কাছে এক পত্রে তিনি 'ফ্যাসিবাদ ও বিজ্ঞান' বিষয়ে আলোকপাত করেন।

সে সময়ে বিজ্ঞানীদের স্বাধীনভাবে কাজ করা বন্ধ হয়েছিল। মতপ্রকাশের ও চিন্তার স্বাধীনতা অপহৃত হয়েছিল। ইতালির দুই জন বিজ্ঞানীর কাছ থেকে বিবেকের যন্ত্রণাভরা পত্র পেয়েই তিনি রকোকে স্মরণ করিয়ে দেন, বিষয়টি কেবল মানবিক অনুভূতির চাপ ও ক্ষয় সৃষ্টির সমস্যা নয়, মানব-সংস্কৃতির ঐতিহ্যগত সংকট। তিনি জানান, নিজেদের মধ্যে রাজনৈতিক মতাদর্শের পার্থক্য থাকতে পারে; কিন্তু পরস্পর একটা মৌলিক প্রশ্নে একমত যে, ইউরোপের বুদ্ধি ও সংস্কৃতিগত মানবিক অবদানকে উচ্চতম মূল্য দিতে না পারার অর্থ বর্বরতা। বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে, চিন্তা ও শিক্ষার জগতের যে স্বাধীনতা একদিন গ্রীক সভ্যতার ও ইতালীয় রেনে-সাঁসের আবির্ভাব সম্ভব করেছিল, তার উত্তরাধিকারের পথ রুদ্ধ করার অর্থ মানবসভ্যতার ধ্বংস ডেকে আনা।

এই দশকের গোড়ায় (১৯৩১-৩২) সমরবাদী জাপান যখন চীনের সাংহাই ও চাপেই অঞ্চলে বোমাবর্ষণ করছে, তখন জেনিভা নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের আগেই আইনস্টাইন লিঁয় শহরে সভা করে সারা বিশ্বের বিবেকী মানুষের কাছে যুদ্ধের ষড়যন্ত্র ও বর্বরতার প্রতিরোধে এগিয়ে আসতে আহ্বান জানান ও যুদ্ধ প্রতিরোধী আন্তর্জাতিক তহবিল গড়েন। ১৯৩৭ সালেও তিনি রাসেল, রঁলা, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখের সঙ্গে যুক্ত আবেদনে ফ্যাসিস্ট বর্বরতার বিরুদ্ধে সারা বিশ্বে গণ-প্রতিরোধ গড়ার আহ্বান জানিয়েছেন। ১৯৪৫ সালে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত রাশিয়ার লালাফৌজের হাতে ফ্যাসিস্ট হিটলারের পতনের পর মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ভয়ংকর 'ম্যাকার্থি রেজিম'-এর অভ্যুদয় হয়। আশ্রয়দাতা হলেও (১৯৩৩ সালে ফ্যাসিস্ট জার্মানি থেকে উদ্বাস্তু হয়েছিলেন), মার্কিনী সন্ত্রাসের এই বীভৎস কালো মুখকে ধিক্কার জানাতে আইনস্টাইন দ্বিধা করেননি! একাধিক মিছিল মিটিং ও রচনা-প্রকাশ সহ তিনি গণতন্ত্র ও ব্যক্তিস্বাধীনতার সংগ্রামে সামিল হয়েছিলেন।

লক্ষ্য করার মত, পাঁচের দশকে তাঁর অর্থনীতি ও রাজনীতি বিষয়ক চিন্তাভাবনা আরও পরিণত ও গভীর হয়েছে। এক জনসভায় বলেছেন, "আমেরিকার শাসনতন্ত্রে স্বীকৃত মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও অধিকার রক্ষার জন্য আমরা এখানে সমবেত হয়েছি এবং এই প্রসঙ্গে শিক্ষার স্বাধীনতাও আলোচ্য; বলে নিই যে, আমাদের মত বুদ্ধিজীবীদের কাছে এই স্বাধীনতা হারিয়ে যাওয়া মারাত্মক বিপদের হয়ে উঠেছে। কেমন করে এমনটা হল? কেন এই বিপদ আগের চেয়ে বেশী করে আমাদের সামনে উপস্থিত হল?

গোটা দেশের উৎপাদনী পুঁজি মুষ্টিমেয় ধনিক গোষ্ঠীর হাতে কেন্দ্রীভূত হওয়ায় উৎপাদনেরও কেন্দ্রীভবন ঘটে চলেছে ; এই ধনিক গোষ্ঠী শিক্ষা ও সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে প্রচণ্ড আধিপত্য করছে ; এমনকি সরকারের উপরও সীমাহীন প্রভাব কায়েম করছে। এই ঘটনাই জাতির সাংস্কৃতিক জীবনকে বিপন্ন করে তুলেছে।" উল্লেখযোগ্য যে, এই মহান বিজ্ঞানী মনোপলি পুঁজির অতিরিক্ত কেন্দ্রীভবনের কারণে সৃষ্ট ভয়াবহ বেকার সমস্যার কথাও গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করেন।

বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের স্বচ্ছ ও শানিত বিবেকের পরিচয় পেতে তাঁর 'নৈতিক অবক্ষয়' ও 'সমাজতন্ত্র কেন' রচনা দুটির উল্লেখ অবশ্যই প্রয়োজনীয়। সভ্যতার সংকটে বিদীর্ণ হৃদয় ও সুতীব্র ঘৃণা নিয়ে জাতির নৈতিক অবক্ষয়ের মূল কারণ হিসাবে তিনি ফ্যাসিস্ট পশুশক্তির পায়ে পূজা দেওয়া, সত্যের অন্বেষা ছেড়ে ঐ একনায়কতন্ত্রী সামরিক ও বর্বর শক্তির স্বার্থে বিবেক ও মূল্যবোধ বিকিয়ে দেওয়াকে নির্দেশ করেছেন।

প্রধানত শিক্ষা ও দর্শনের মধ্যে সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিকতা ঢুকিয়ে বিশেষীকরণের যন্ত্রে ও বিকৃত ইতিহাসের ছাঁচে ঢালাই করে প্রায় 'কমপিউটার-ম্যান' গড়ার ব্যাপক পরিকল্পনায় উদ্বিগ্ন আইনস্টাইন তাঁর 'শিক্ষা' বিষয়ক রচনায় বলেছেন—ওরা ডারউইনবাদের সামাজিক মূল্যকে খতম করে বিচ্ছিন্নতা ও ধ্বংসাত্মক যুদ্ধের বা প্রতিযোগিতার সাফাই বানিয়ে নিচ্ছে। ওরা ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীন বিকাশের বদলে 'প্যাকেজ-ডিল' বা বিশেষীকরণ প্রথায় মানুষকে মেশিনে রূপান্তরিত করছে—'···more elosely resembles a well-trained dog than a harmoniously developed person related to the community.' উল্লেখযোগ্য যে, মানবিক অধিকার ও গণতন্ত্রের প্রশ্নে নিগ্রো-সমস্যা ও জাতিত্ববাদের যন্ত্রণাও আইনস্টাইনকে কম আহত করেনি। নিউ ইয়র্ক থেকে প্রকাশিত 'মান্থলি রিভিউ'-এর মে ১৯৪৯ সংখ্যায় প্রকাশিত 'সমাজতন্ত্র কেন' নিবন্ধে মানুষের বেদনাদায়ক নিঃসঙ্গতা ও বিচ্ছিন্নতা এবং সেই ফাঁকে ঢুকে পড়া পাশবপ্রবৃত্তি ও সমাজ-বিরোধী ধ্যান-ধারণার বিষাক্ত কৃমি—এ সমস্তই সমাজ ও ব্যক্তি মানুষের সম্পর্কগত সংকটের ফলে ঘটছে, এই পর্যন্ত বলেই তিনি ক্ষান্ত হননি। মুষ্টিমেয় একচেটিয়া পুঁজিপতিদের হাতে উৎপাদনের উপায় ও পুঁজি কেন্দ্রীভূত হওয়ার ফলে গোটা ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় যে নৈরাজ্য দেখা দিয়েছে—বিচ্ছিন্নতা ও অবক্ষয়ের উৎস সেখানেই

নিহিত বলে তিনি নির্দেশ করেছেন। প্রসঙ্গত তিনি বুর্জোয়াদের 'পরিকল্পিত অর্থনীতি'র দাওয়াইকে নস্যাৎ করে বলেছেন, এর মধ্যেও মানুষের দাসত্ব ঘুচতে পারে না। তাই তাঁর ব্যবস্থাপত্র হল—সমাজতন্ত্র, যা অর্জনের জন্য মৌলিকভাবে কতকগুলি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান, যার মধ্যে পুঁজির অতিরিক্ত কেন্দ্রীভবন থাকবে না, তারই পাহারাদার সর্বশক্তিমান আমলাতন্ত্র থাকবে না, ঐতিহ্যের স্বাভাবিক খাতেই গড়ে উঠবে গণতান্ত্রিক শক্তি, জনগণের যৌথ কর্মপ্রয়াসেই তখন ব্যক্তি-স্বাধীনতা স্বাস্থ্যে ও সৌন্দর্যে বিকশিত হবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার, আইনস্টাইনের 'সমাজতন্ত্র কেন'র জবাবী ব্যাখ্যায় সমাজবদলের মার্কসীয় তত্ত্ব বা লেনিনীয় সংগঠনচিন্তা নেই বলে যাঁরা নিরাশ হবেন, তাঁরা নিজেদেরই বাস্তববোধের অভাবের পরিচয় দেবেন। বুর্জোয়া এনলাইটনারদের ঐতিহ্যে এগিয়ে আসা পরিণত চিন্তাশীল ও বিশ্ব-মানবতার অগ্রণী বিবেকরূপে তিনি যেভাবে বিশ্ব-ধনতন্ত্রের ক্ষয়, ব্যর্থতা ও বীভৎস বর্বরতার উন্মোচন করেছেন এবং বর্তমান সভ্যতার মুক্তি ও প্রগতি ঘটাতে বিশ্ব-গণতন্ত্রের অভিযানকে অভিনন্দিত করেছেন, তাতে দুনিয়ার বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীও তাঁদের সংগ্রামে অনুপ্রাণিত হচ্ছেন।

সংস্কৃতি ও অপসংস্কৃতি

মানব পরিবেশের প্রাকৃতিক ও ব্যবহারিক সম্পত্তি তখনই পুঁজিতে রূপান্তরিত হয়েছে যখন থেকে তা বাজারে বিক্রি হয়ে ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জনে চলাচল করেছে। এটা ঐতিহাসিকভাবে শুরু হয়েছে ইংলণ্ডের শিল্প-বিপ্লবের সুরে, যার আদর্শগত বৈপ্লবিক উজ্জীবন সারা ইউরোপে ছড়িয়ে বিশ্বসভ্যতার গোড়া ধরে নাড়া দিয়েছে ১৭৮৯-৯১ সালের ফরাসী বিপ্লবে। লক্ষ্যণীয় যে, 'স্বাধীনতা সাম্য মৈত্রী'র বাণী নিয়ে ধনতন্ত্রবাদী বুর্জোয়ারা তখন থেকে সামন্তবাদী অভিজাতদের শোষণ ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে নতুন ধরণের ব্যক্তিগত মালিকানাভিত্তিক মুনাফাকামী শোষণ ও নৈতিকতার বাস্তব ও ভাবগত পরিবেশ সৃষ্টি করে, গোটা সমাজকে দুইটি শ্রেণীতে ভাগ করেছে—পুঁজিবাদী ও প্রলেতারিয়েত।

স্বভাবতই সমাজে যে-শ্রেণীর শাসন চলে তারই ভাবাদর্শ, নৈতিকতা ও মূল্যবোধ আধিপত্য করে, ন্যায়-অন্যায়ের ভারসাম্য সেই মাপেই বজায় থাকে। এই পুঁজিবাদী সমাজে শ্রমের সঙ্গে শ্রমিকও পণ্যে পরিণত হয়েছে, শিক্ষা-সংস্কৃতিও কেনাবেচার সামগ্রী হয়েছে। এরই মধ্যে কিছু নিচুর তলার লোক কথামালার ধূর্ত শেয়ালের মত বাঘকে জব্দ করে মজা পেয়েছে। অসাম্য প্রতারণার এই বুর্জোয়া নৈতিকতার বেশ কিছু দার্শনিক-বুদ্ধিজীবী 'শান্তিশৃঙ্খলার প্রতি মর্যাদাবোধ', 'চুরি করা পাপ', 'সামাজিক নিরাপত্তা', 'মহানুভবতা বদান্যতা ও নীতিবোধ' ধরণের কায়েমী স্বার্থের অনুকূলে মতাদর্শ প্রচার করে সমাজে মান্যগণ্য হয়েছে।

এই সমাজেই গণিকাবৃত্তি চালু রেখেই মানবতা ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার জয়গান চলেছে, দাস-প্রথা আইন করে বন্ধ করেও শিশু ও গর্ভবতী নারী শ্রমিকদের কারখানা, খনি ও চা-বাগানের ঘানিতে ফেলে দিবারাত্র রক্ত শুষে 'জাতীয়' উৎপাদনে রেকর্ড সৃষ্টি হচ্ছে, বিশ্বের বাজারে 'সাহায্য' প্রতিযোগিতায় বৃহৎ মাল্টি-ন্যাশনাল বুর্জোয়ারা এক-একটা 'অরণ্যদেব'-এর মত অপরাজেয় হতে চাইছে। এদেরই বগলসে বাঁধা পড়ে বিজ্ঞানী-প্রযুক্তিবিদ্-শিল্পী-সাহিত্যিকদের বড় অংশই ধ্বংসাত্মক নরমেধ যজ্ঞের ইন্ধন যুগিয়ে সুখশয্যায় এমনকি 'নোবেল প্রাইজ' আসন্ন বলেও স্বপ্ন দেখছেন।

আমাদের দেশে ব্রিটিশ বুর্জোয়ারা যে নতুন অর্থ-ব্যবস্থা ও তন্নিষ্ঠ

শাসন-সংস্কৃতির কর্মসূচী চালু করেছিল তা তাদের উন্মেষ যুগের বিপ্লবী ভাবাদর্শে জারিত হয়নি ; তা ছিল পচনশীল মিল-বেন্থাম-বার্কলের পাশ্চাত্য দর্শন-এর সঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মিশ্র বাস্তব অবস্থা। এরই মধ্যে রেল-টেলিগ্রাফও বসেছে, স্বনির্ভর গ্রাম-সমাজের কুটির শিল্প ও ছোট ছোট পারিবারিক ভিটে ভেঙে ক্রমে বড় বড় শিল্প কারখানাও বসেছে। স্বভাবতই রুশ দেশের নারোদবাদীদের মত একদিকে দেখা গেল পুরোন বন্ধনগুলি ছিন্ন হবার মায়াকান্না, নতুন শ্রেণী-সমাবেশ ও তার সংগ্রামী আবর্তের বাস্তবতাকে অস্বীকার, মহামানবের আবির্ভাব কল্পনা ইত্যাদির পিছুটান, পেটি-বুর্জোয়া প্রুধোবাদের 'ভবিষ্যৎ অন্ধকার'-এর বিষণ্ণ করুণ ভাবাবেগের আচ্ছন্নতা ; অপরদিকে সাগর পার থেকে আসা পাশ্চাত্যেরই বেকনীয় এনলাইটনারদের প্রভাবে রামমোহন-বিদ্যাসাগর-মধুসূদন-ডিরোজিও প্রমুখ কয়েকজন মনীষী স্রষ্টার মাধ্যমে মধ্যযুগীয় কু-আচার ও অন্ধবিশ্বাসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। মধুসূদনের চিত্রাঙ্গদা বলল—'পূজা করি রাখিবে মাথায়, সেও আমি নহি/অবহেলা করি পুষিয়া রাখিবে পিছে, সেও আমি নহি', রবীন্দ্রনাথের "স্ত্রীর পত্র"-এর মৃণাল ইবসেনের নোরার মত আধিপত্যকামী স্বামীর ঘর ছেড়ে গেল শ্রমিকরা ধর্মঘট করল, নীল-সাঁওতাল বিদ্রোহের ঐতিহ্যে বলীয়ান কৃষকরা সেই ধর্মঘটী শ্রমিকদের কাজ নিয়ে (শহরে এসে) বাঁচার হাতছানি প্রত্যাখ্যান করতে শুরু করল। অর্থাৎ আমাদের সমাজের মধ্যে এই দোলা-চলতা ও সীমাবদ্ধতার উপাদান ছিল বলেই বঙ্কিমচন্দ্র 'সাম্য', 'কমলাকান্তের দপ্তর', 'কৃষকের অবস্থা'র মত প্রবন্ধ লিখেও 'কৃষ্ণচরিত্র' বা 'ধর্মতত্ত্ব' প্রচার করেন, রোহিনীর ঐ করুণ পরিণামকে নীতিবোধের গৌরবে সৌন্দর্যায়িত করেন, আবার শরৎচন্দ্র রোহিনীর প্রতি দরদী হয়েও, অভয়া-সুনন্দার মত বিদ্রোহী চরিত্র সৃষ্টি করেও, প্রচলিত হিন্দু-সংস্কার ও 'সামাজিক মূল্যবোধ'কে আঘাত করে সৌন্দর্যসৃষ্টি ব্যাহত হবার আশঙ্কায় বিধবা বিবাহ দিয়ে সুস্থ বুর্জোয়া গণতন্ত্রেরও প্রতিষ্ঠা দিতে পারলেন না।

এই শরৎচন্দ্রই 'একাদশী বৈরাগী' গল্পে অপূর্ব নামে এক অপূর্ব চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। কালীদহ গ্রামের ধনী ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তানটি কলকাতা থেকে 'অনার সহ গ্রাজুয়েট' হয়েও, সমকালের শিক্ষা-সংস্কৃতি ক্ষেত্রে প্রাচ্য বনাম পাশ্চাত্য-পন্থীদের বিতর্কে শ্রেণীগত কারণেই গ্রামে ফিরে বর্ণাশ্রমভিত্তিক হিন্দু-পুনরুজ্জীবনবাদী আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়। 'পণ্ডিত মশাই'-এর কেশব শহর থেকে ইংরেজি জানা বাবু হয়ে গ্রামে ফিরে স্কুল করে। গরিব

চাষি-তাঁতিদের ছেলেরা সেখানে যায় না। কিন্তু গ্রামের কৃষক পরিবারের সন্তান বৃন্দাবনের পাঠশালায় ছাত্র উপ্‌চে পড়ে। 'পল্লীসমাজ'-এর বেণী ঘোষাল রমাকে বলছে—"এই যে একটা নতুন ইস্কুল করেছে, এই নিয়ে আমাদের ভুগতে হবে। এমনিতেই ছোটলোকগুলো জমিদার বলে মানতে চায় না।"

এ তো গেল গ্রামের কথা। এদেশের বুর্জোয়ারা কেবলই জাত-পাত, সাম্প্রদায়িক ভেদ, উপজাতীয় বিচ্ছিন্নতাবাদের 'নৈতিক ভাবধারা'র পরিচর্যা করেনি, বাবু কালচার ও কুলি-কালচারের সঙ্গে, গ্রাম ও শহরের সঙ্গে ফারাক বানিয়ে ভিক্টোরিও ভারসাম্যের দ্বন্দ্ব করে ছেড়েছে। সাহেবদের তোষামোদ অথবা প্রতারণা করে কিছু পয়সা কামিয়ে দেশি ভদ্রলোকেদের কিছু ইংরেজি বলা ও একাধিক রমণীসঙ্গ যেন আভিজাত্যের প্রতীক হয়েছে; হাটে-বাজারে, আদালতে-আপিসে মিথ্যা, শঠতা, ঘুষ ও জুয়াচুরিই বুদ্ধিমান ও ভাগ্যবানদের গুণপনায় পরিণত হয়েছে। এ সবই পচনশীল সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে, ঔপনিবেশিক বুর্জোয়া ভাবাদর্শের যোগসাজসে গড়া সমাজের 'ওয়েজ অব লাইফ' বা সংস্কৃতি।

আজ এই নয়া-উপনিবেশবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী ইয়াঙ্কি কালচারের সুরে ঐ ভিক্টোরিও নৈতিকতাও অচল। এর লক্ষণগুলি হল: অবাধ বাজারের বেশ্যাপনা, খুন, ড্রাগ হ্যাবিট, নারীধর্ষণ, আত্মহনন, রহস্য-রোমাঞ্চ সিরিজ, সুপারম্যান, নৈরাশ্য, নৈরাজ্য ও সমাজবিরোধী প্রবণতাগুলিকে গৌরবান্বিত করা, ব্যাপক প্রচার মাধ্যমে ম্যাস্‌-কালচার-এ পরিণত করা, সাঁইবাবা-জ্যোতিষী-সুপারম্যান-এর কাছে বিজ্ঞানের ব্যর্থতা দেখানো ইত্যাদি মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের ঢালাও কারবার। লক্ষণীয় যে, এইসব অবক্ষয়ী প্রবণতার রাহুগ্রাসে যুবসমাজের সঙ্গে শিশুরাও বাদ পড়ছে না। প্রশ্নটা মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের মনে অন্ধকারের হুতোশ-লাগা নয়, বেশি মারাত্মক বুর্জোয়া নৈতিকতার অর্থলোভ, আত্মকেন্দ্রিকতা ও স্বার্থান্ধতা শ্রমিকশ্রেণীর বড় অংশকেও কলুষিত করছে। এখনো অর্থনীতিবাদী ঝোঁক ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে থাকায় তাঁদের অনেককেই পেটি বুর্জোয়া অহমিকা ও রক্ষণশীলতার জাল থেকে বেরিয়ে আসতে দিচ্ছে না। তাঁরা অনেকেই গ্রামে জমি থাকলে বর্গায় বা জমিতে কাজের নিরাপত্তা স্থাপনে, জনশিক্ষার কর্মসূচিকে বাধা দিচ্ছে, ও জাত-পাতের নিগ্রহে মদত দিচ্ছে।

অসমাপ্ত গণতান্ত্রিক বিপ্লবের ফাঁক দিয়ে বুর্জোয়া জমিদারদের রাষ্ট্রযন্ত্র

শ্রমিক-কৃষক মধ্যবিত্তদের এইভাবে কলুষিত করছে, অর্জিত মূল্যবোধগুলিকে পর্যন্ত মুছে দিচ্ছে। নিজেরাও যেমন দ্রুত নেমে যাচ্ছে, জনগণকেও তেমনি আরও বিচ্ছিন্ন ও বিকৃত করতে সব রকম চেষ্টা চালিয়ে নিজেদের 'সাংস্কৃতিক' পাহারা মজবুত করছে। আজ গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির সংগ্রাম এই কারণেই আমাদের জাতীয় প্রশ্ন। একদিকে সামন্তবাদী অবশেষের রক্ষণশীল প্রভাব, অপরদিকে ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদের অবক্ষয়ী ভাবধারার প্রভাব—এই দ্বিমুখী আক্রমণকে প্রতিহত করে গণতান্ত্রিক ও মানবিক মূল্যবোধের প্রসার ঘটাতে না পারলে প্রলেতারিও বিপ্লবী সংস্কৃতির জন্য সচেতনতার ভিত্তি রচিত হতে পারে না। এ কথা ঠিক, সমাজে যে সব বস্তুগত ও ভাবগত বিচ্ছিন্নতা রয়েছে তাতে স্বভাবতই ঐ সব অবক্ষয়ী প্রবণতার প্রাধান্য থাকবে, আরও বাড়বে। অথ কিম্? অর্থাৎ সমাজের অর্থব্যবস্থার বা উৎপাদন সম্পর্কের পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ প্রতিফলনই যদি সংস্কৃতি হয়, তবে এই রকম সমাজে সুস্থ সংস্কৃতির জন্য সংগ্রামে ফয়দা কিসের? সমাজটা বদলালেই তো নতুন সংস্কৃতি ও তার মূল্যবোধের জন্ম ও বিকাশ হবে।

এইখানেই কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বুঝে নেওয়া দরকার ঃ

১. সংস্কৃতি অর্থনৈতিক ভিত্তির উপরিথাক হলেও ঠুঁটো জগন্নাথ বা নিষ্ক্রিয় ছায়া নয়।

২. সামাজিক ভিত্তি ও তার পেয়াদা পারিষদদের অবস্থান সব সময়ে সমান্তরাল ও দ্বন্দ্বহীন থাকে না। অর্থাৎ যুগে যুগে প্রতিটি সমাজে প্রত্যেক জাতির ইতিহাসেই ইতি-নেতির, পীড়ন-প্রতিবাদের ও স্থিতি-গতির পারস্পরিক সংঘাত প্রক্রিয়া চলেছে বলেই মানবসভ্যতার বিকাশ হয়েছে—বর্বর বা আদিম সাম্যবাদী যুগ থেকে সভ্যতার যুগে, দাস যুগে, সামন্ত যুগে, ধনতন্ত্রের যুগে ও সমাজতন্ত্রের যুগে।

৩. সংস্কৃতি কেবলই কবিতা, গল্প-উপন্যাস, নৃত্যগীত বা নাট্য, চিত্র ও ভাস্কর্য ইত্যাদি হৃদয়গত উন্মেষ নয়, এর সঙ্গে শ্রম, বুদ্ধি ও দক্ষতা সমগ্র সৃষ্টিকর্মই যুক্ত।

৪. শিক্ষা আনে চেতনা, যা বিপ্লবী পরিবর্তনের পূর্বশর্ত। অর্থাৎ শিক্ষাই হল সংস্কৃতি, যার প্রক্রিয়া বর্বর যুগেও ছিল (মাটির পাত্র, গুহাচিত্র, পাথরের হাতিয়ার)। আসলে শ্রম ও শিক্ষার যৌথ ভূমিকার বিকাশ ঘটিয়ে মানুষ শুধু সভ্যতার যুগে আসেনি, তার ক্রমবিকাশে সংস্কৃতির ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। ফ্রেডেরিখ এঙ্গেলস ষ্টার্কেনবুর্গকে লেখা এক চিঠিতে ব্যাখ্যা

করে বলছেন—"রাজনীতি, আইন, দর্শন, ধর্ম, সাহিত্য, নন্দনতত্ত্ব ইত্যাদির বিকাশধারা অর্থনৈতিক বিকাশের উপরই নির্ভরশীল, কিন্তু এরা পরস্পরের উপর, সেই সঙ্গে অর্থনৈতিক ভিত্তির উপরও প্রভাব বিস্তার করে। এ কথা আদৌ ঠিক নয় যে অর্থনৈতিক অবস্থানই একমাত্র কারণ এবং একাই সক্রিয়। বরং বলা চলে অর্থনৈতিক প্রয়োজনকে ভিত্তি করে নানামুখী ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলে, আর অর্থনৈতিক প্রয়োজনই শেষপর্যন্ত নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে।"

সমাজের বিকাশে প্রয়োজনীয় কাজের তাগিদটাই বড় কথা। এই থেকেই মানুষ নতুন ধারণা পদ্ধতি ও মতবাদ গ'ড়ে তোলে, যা দিয়ে পুরোন ও প্রচলিত বাধা দূর করে এগিয়ে যায়, জনগণকে সচেতন ও সংগঠিত ক'রে ক্ষয়িষ্ণু প্রথা ও ভাবধারাগুলিকে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পরাস্ত করে।

৫. শিল্প-সংস্কৃতি মানুষকে তৃপ্তি দেয়, আনন্দ দেয়, এগুলি ব্যক্তিগত রুচির ব্যাপার, সবার জন্য নয় ইত্যাদি কথা চালু হয়েছে বুর্জোয়ারা সমাজে কায়েম হবার পর থেকেই। অর্থাৎ যে বুর্জোয়ারা সামন্তযুগের বেশ কিছু আধার রেখেই বক্তব্যে ও ব্যবস্থাপনায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনলো বিশ্ব-সভ্যতার ইতিহাসে, সেই তারাই আইন, ধর্মদর্শন, বিজ্ঞান ও শিল্পকলার অঙ্গসজ্জা ও মর্মবস্তুকে এমনভাবে গড়ে নিল যাতে তার নিজস্ব অর্থব্যবস্থারই প্রহরীগিরি মজবুত হয়।

এই সঙ্গে এটাও ঠিক, বুর্জোয়ারা উৎপাদনের পদ্ধতি ও উপকরণের অবিরাম পরিবর্তন না ঘটিয়ে বাঁচতে পারে না। এরই কারণে অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ সংকট-সংঘাতের আবর্তে পড়ে অবিরাম সংস্কৃতির পোশাক-পরিচ্ছদ ও কলাকৌশল বদলে নেয় আত্মরক্ষারই প্রয়োজনে। সার্ভেন্তিস-সেক্সপীয়ার-ইবসেন থেকে আয়ানেস্কো বেকেট-জয়েসে এবং বেকন থেকে বার্কলে-ব্যালেন্টাইনে আসতে হয় এই কারণেই। এটাই বুর্জোয়াদের ট্রাজেডি। কার্ল মার্কস তাঁর এইটিনথ ব্রুমেয়ার অব লুই বোনাপার্টিতে অপূর্ব কাব্যময় ভাষায় বলছেন—"অতীতের সমাজ মৃত মুখগুলির ঐতিহ্য জীবিতদের মস্তিষ্কে রাত্রির দুঃস্বপ্নের মত চেপে থাকে এবং তখনই তারা নিজেদের সঙ্গে অন্য সবকিছুকেই বৈপ্লবিক প্রবাহের মধ্যে নিয়ে আসার চেষ্টা করে অভূতপূর্ব কিছু সৃষ্টির চেষ্টা করে এবং সেই সংকটের মুহূর্তেই তারা বাস্তবতার সঙ্গে অতীতের সমস্ত চরিত্র বা উপাদানগুলিকে যেন মন্ত্রবলে নিজেদের সেবায় নিযুক্ত করে—তাদের নাম, তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ এবং রণধ্বনিগুলিকেও অনুকরণ করার চেষ্টা করে···উনবিংশ শতাব্দীর বিপ্লব মৃতকে অবশ্যই

সমাধিস্থ করবে। আগে যেখানে বক্তব্য আধারকে অতিক্রম করেছিল, আজ সেখানে আধার বক্তব্যকে ছাপিয়ে যাবে।"

এই স্তর পুঁজিবাদী ব্যবস্থার চূড়ান্ত অবক্ষয়ী স্তর—সাম্রাজ্যবাদ। এই স্তরে বিশ্ব-বাজারের দখল কায়েম করতে পারমাণবিক যুদ্ধের প্রয়োজনে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির বিপুল ও গভীরতর বিকাশ অনিবার্য হয়েছে, যার দাবিতে শ্রমিক-শ্রেণীর সংখ্যা ও শিক্ষাগত যোগ্যতার বিকাশও ঘটাতে বাধ্য হয়েছে। যে পুঁজিবাদী সভ্যতার বুকের উপর দাঁড়িয়ে একদিন দিদেরো-টলস্টয়-রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ মনীষীরা বলেছিলেন—শ্রমজীবীদের অজ্ঞতাই শাসকদের শোষণ ও প্রতারণার মূল শক্তি, সেই পুঁজিবাদের চূড়ান্ত স্তরে—সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসী ক্ষুধার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে লেনিনও দৃপ্ত বিশ্বাসে ঘোষণা করেছেন—তোমাদেরই আধার তোমাদের বক্তব্যকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে, সেই পরিবর্তিত আধার থেকে জেগে উঠেছে নতুন শক্তি নতুন বক্তব্য যা আবার নতুন আধারের জন্ম দেবেই। রুশ শিক্ষাবিদ কালিনিন বুর্জোয়া শিক্ষা-সংস্কৃতির এই দ্বন্দ্বটিকে ব্যাখ্যা করে বলছেন—"বুর্জোয়ারা চায় শ্রমিক কৃষক কোন প্রতিবাদ না করে দাসানুদাস হয়ে শোষণের সব বোঝা বহন করুক। তাই গোড়া থেকেই তাদের মধ্যে কোন উদ্যম ও সাহস সঞ্চারক সংস্কৃতি প্রচার থেকে বিরত থেকেছে, সেই রকম শিক্ষা থেকে দূরেই রেখেছে। কারণ অজ্ঞান ও দুর্দশাগ্রস্ত লোককে বাগে রাখা সহজ কিন্তু এই ধরণের লোক দিয়ে তো যুদ্ধ জয় হয় না। প্রাথমিক কিছু জ্ঞান-বুদ্ধি না দিলে তো তাদের যন্ত্র ও অস্ত্র চালানোয় উৎসাহিত করা যাবে না। একদিকে যন্ত্রপাতির উন্নতি, যুদ্ধাস্ত্র প্রতিযোগিতা, অপরদিকে শিক্ষা-সংস্কৃতির সুযোগ-লাভের জন্য শ্রমিক-কৃষকদের অধিকারের সংগ্রাম বুর্জোয়াশ্রেণীকে বাধ্য করে তাদের কিছু জ্ঞান-বুদ্ধি দেবার ব্যবস্থা করতে। পাশাপাশি আগ্রাসী যুদ্ধের প্রয়োজনে তাদের মধ্যে দৃঢ়তা, সাহস ও অন্যান্য গুণের বিকাশ ঘটাতেও তারা বাধ্য হয়, যা শেষপর্যন্ত বুর্জোয়াদের পক্ষেই বিপজ্জনক।"

এই 'বিপজ্জনক' ঐতিহাসিক ঘটনাই ১৯১৭ সালের রুশীয় সমাজ-তান্ত্রিক বিপ্লব। পচনশীল বর্বর বুর্জোয়াদের পক্ষে যা বিপজ্জনক, বিশ্বের শ্রমজীবী, বিবেকী ও গণতান্ত্রিক জনগণের পক্ষে তা আশীর্বাদ।

বিশ্বসভ্যতার এই পর্বে কোন জাতি সাম্রাজ্যবাদী রাহুগ্রাস (বিশ্বযুদ্ধ ও ও ফ্যাসিবাদ যার বাঁচার হাতিয়ার) এবং সমাজতান্ত্রিক উত্তরণের চাহিদার বাইরে থাকতে পারে না। এই পর্বের দ্বন্দ্বগুলিই শ্রমিকশ্রেণীকে বিপ্লবী

সংগ্রামগুলির পথে নিয়ে গিয়ে, পুরোন রাষ্ট্রযন্ত্র কেবল দখল করতেই নয়, তাকে সমূলে উচ্ছেদ ক'রে, অর্থাৎ জমিদার-ধনিক শ্রেণীর হাত থেকে উৎপাদনের উপায় ও হাতিয়ার কেড়ে নিয়ে সেগুলি সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তিতে রূপান্তরিত করার দিকে নিয়ে গেছে। এইভাবেই নভেম্বর বিপ্লব সারা বিশ্বে নতুন দুনিয়ার সৃষ্টি ও সূচনা করল, যা বিশ্বের ইতিহাসে অভূতপূর্ব অনিবার্য ঐতিহাসিক সত্য।

বলা বাহুল্য, বনিয়াদের লড়াই আর উপরিথাক বা সংস্কৃতির লড়াই বিচ্ছিন্ন নয়। হয়ত কখনও কোন দেশে একটা অপরটার চেয়ে এগিয়ে বা পিছিয়ে থাকে। কিন্তু পরস্পর পুষ্ট ও শক্তিশালী হয় তখনই যখন দুটি ধারাই সমান্তরাল থেকে একে অপরকে প্রভাবিত করতে করতে এগিয়ে যায়।

এই বিপ্লব আমাদের শিখিয়েছে, সামন্ত বুর্জোয়া যুগের শাসকরা শ্রমজীবী মানুষকে যে বিপুল সাংস্কৃতিক অতীত থেকে বঞ্চিত বিচ্ছিন্ন রেখেছিল সেই অতীত ঐতিহ্যকে পূর্ণ উদ্যমে ও স্বাধিকার বোধেই অর্জন করতে হবে। অবশ্য তার মানে এই নয় যে, অতীতের জঞ্জালগুলিকেও গ্রহণ করতে হবে। ফ্রেডেরিখ এঙ্গেলস তাঁর 'এ্যাণ্টি ডুরিং'-এ ঐ মহা পণ্ডিতটির 'অতীত মুছে ফেলার' ও 'সমস্ত ধর্মকে নিষিদ্ধ' করার অতি-বাম তত্ত্বকে জোর এক হাত নিয়েছেন। 'প্রলেতারিও সংস্কৃতি আকাশ থেকে নেমে আসে না' বলে বারবার মতাদর্শগত সংগ্রাম করতে হয়েছে বিপ্লবোত্তর সোভিয়েত দেশে ও চীনে।

সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের ক্ষেত্রে অবক্ষয়ী বুর্জোয়াদের আর দেবার কিছু নেই। তাদের অবক্ষয়ী নেতিবাচক প্রভাব তাদের নিজেদের দেশে, সমাজ-তান্ত্রিক দেশে এবং আমাদের মত নয়া-ঔপনিবেশিক দেশে সদা-সক্রিয়। কিন্তু আমরা তো এ কথাও ভুলতে পারি না যে, আজ ঐ সাম্রাজ্যবাদী দেশের জনগণের উপর, আমাদের মত দেশগুলির উপর সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতির মতাদর্শগত প্রভাবও নিষ্ক্রিয় নয়। বরং তা দিনে দিনে বাড়ছে। ঐ সব পশ্চিমী দেশে, খোদ মার্কিন মুল্লুকে নিউট্রন বোমার বিরুদ্ধে, অর্থনীতির সামরিকীকরণের বিরুদ্ধে, মূল্যবৃদ্ধি ও বেকারত্বের বিরুদ্ধে যে লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবী ও বিবেকী মানুষের প্রতিবাদী কণ্ঠ ধ্বনিত হচ্ছে তা আঁরি বারবুস-এর 'লে ফু' অথবা চার্লি চ্যাপলিনের 'গ্রেট ডিকটেটর' ও 'মডার্ন টাইমস'-এর মহান উত্তরাধিকার।

পুনশ্চ ঃ

যে সমাজের ভিৎ ব্যক্তিগত মালিকানায় মুনাফাকামী পণ্যোৎপাদনের উপর গড়ে উঠেছে, সেই সমাজে ব্যক্তির আতঙ্ক, আত্মসুখ, বিচ্ছিন্নতা ও দ্বন্দ্বই হল প্রচলিত মতাদর্শ। এরই উপর শাখা-প্রশাখায় ফুটে ওঠে শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতি-ভাবনার লালন-পালন। আবার এরই মধ্যেকার বিরোধ-সংঘাত ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধগুলিকে উস্কে দেবার বা এগিয়ে নিয়ে যাবার মত শিল্পী-সাহিত্যিক-বিজ্ঞানী-দার্শনিকদের প্রাচুর্য না থাকলেও, অভাব যে কোন যুগেই হয় না, এটাও ঐতিহাসিক সত্য।

আজ বিশ্ব-সভ্যতায় মরণোন্মুখ পুঁজিবাদের সাম্রাজ্যবাদী যুগও যেমন বাস্তব, তেমনি সমাজতন্ত্রের উত্তরণমুখীনতা ও নির্মাণের ঘটনাও বাস্তব সত্য। তবু স্মরণ রাখা দরকার, সমাজ-বিকাশের স্তর অনুযায়ী প্রতিটি দেশের নিজস্ব জাতীয় ইতিহাস ও বৈশিষ্ট্যের নিরিখেই সংস্কৃতির স্বাস্থ্য ও তার রোগের চেহারা-চরিত্র নির্ণয়ের দায়িত্ব পালন করতে হবে।

সম্প্রতি অপসংস্কৃতিকে চিহ্নিত করা বা সংজ্ঞা নির্ণয় সম্পর্কে কিছু স্বাস্থ্যকর বিতর্কের অবতারণা হয়েছে। একাংশ বলেন, সাম্রাজ্যবাদী বা নয়া ঔপনিবেশিক যৌনসর্বস্ব এ্যান্টি-কালচারকেই অপসংস্কৃতি বলাই ঠিক। কিন্তু এই সংজ্ঞায় অতি-সরলীকরণের সম্ভাবনা থেকে যায়। কোন অংশ বলেন, যেখানেই বিচ্ছিন্নতা সেখানেই অবক্ষয় বা অপসংস্কৃতির চোরাবালি। এটি আবার অতিব্যাপ্ত সংজ্ঞার মধ্যে পড়ে। যবে থেকে মানুষের সমাজে শ্রমবিভাগ হয়েছে তবে থেকেই এই বিচ্ছিন্নতার (alienation) জন্ম ও বিস্তার হয়েছে। এই প্রশ্নটা সমাজে উৎপাদন ব্যবস্থা ও সম্পর্ক এবং তজ্জনিত সাংস্কৃতিক সংকটের প্রশ্ন। তাছাড়া বিচ্ছিন্নতার ফাঁক শুধু বেনো জলেই ভরে না, সমাজ-সংসারের দ্বন্দ্বমূলক নিয়মে, পরিমাণে সামান্য হলেও ইতি-বাচক গণতান্ত্রিক উপাদানের গুণগত শক্তি থেকে যায়ই।

বর্তমান ঐতিহাসিক স্তরে আমাদের দেশে সংস্কৃতি ও অপসংস্কৃতির প্রশ্নকে যদি এইভাবে বিচারে আনি—সমাজে উৎপাদনের অগ্রগতির পক্ষে এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও কর্মসূচীর পক্ষে যা সহায়ক শক্তি তাকে বলবো সংস্কৃতি ও তার বিরোধী নেতিবাচক শক্তিগুলিকে বলবো অপ-সংস্কৃতি বা সংস্কৃতির অবক্ষয়, তবেই বর্তমান ঐতিহাসিক ও জাতীয় স্তরের প্রগতি আন্দোলনে সঠিক উদ্দীপক যোগানো যায়। যদি অপসংস্কৃতিকে শুধুই নয়া ঔপনিবেশিক যৌনসর্বস্ব 'মাস কালচার' বলে চিহ্নিত করি, তবে তো

এই সিদ্ধান্তে আসতে হয় যাহা নয়া ঔপনিবেশিক যৌনাত্মক 'এ্যান্টি কালচার' নহে তাহাই সংস্কৃতি! এ তো আমাদের মত অসমাপ্ত গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সমাজে, মধ্যযুগীয় কু-সংস্কারে আচ্ছন্ন ৪২ শতাংশ দারিদ্র সীমার নিচে থাকা সমসংখ্যক নিরক্ষর জনগণের দেশে মারাত্মক সিদ্ধান্ত!

যে অপসংস্কৃতি উন্নত পশ্চিমী দেশে ও পশ্চিমী প্রভাবিত তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলিতে 'সমাজতন্ত্রের বিকল্প' হিসাবে চালু হয়েছে, সেইগুলি আমাদের দেশের বাস্তব পরিস্থিতিতে কতটুকু অঞ্চল এবং কত মানুষের মনোভূমি গ্রাস করার মাধ্যম পায়? অর্থাৎ এসব প্রচারের জন্য যে উন্নত বিজ্ঞান-প্রযুক্তির প্রয়োজন, তার কতটা আমাদের দেশে ছড়াতে পেরেছে? তার মানে অবশ্যই এটা নয় যে, যতটা সামান্য অংশেই এর কুৎসিত বিভৎসতার সঞ্চার হয়েছে এবং হয়ে চলেছে, সেই অংশের ক্ষয় ও পচনকে লঘু করে দেখতে হবে। তাছাড়া এটাও বুঝি, সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়ারা তাদের নতুন নতুন বাজার দেশগুলিতে পুঁজি ও গমের সঙ্গে ফিল্ম-টেলিভিসনের মাধ্যমে সবরকম মূল্যবোধহীনতার ধ্যান-ধারণা ছড়াতেও সচেষ্ট। কারণ তারা জানে, ইস্কুল বসানোর চেয়ে এইসব অপসংস্কৃতি ছড়ালে মুনাফা ও বিভ্রান্ত গণমন দুটোরই গ্যারান্টি হয়!

তাদেরও লক্ষ্য জনগণ। গণমনকে বিচ্ছিন্নতা, হতাশা ও মূল্যবোধ-হীনতার নেশায় বুঁদ ও ভোঁতা করার উদ্দেশ্যেই তারা বিজ্ঞানপ্রযুক্তির অত্যাধুনিক গণমাধ্যমগুলিকে কাজে লাগায়। এই স্তরের বিশ্বপুঁজিবাদী মালিক-গোমস্তারা 'আপনি আচরি ধর্ম সবারে শিখায়।'

প্রসঙ্গত বলা দরকার, কিছু বুদ্ধিজীবী লেখক (যাঁদের অনেকেই বামপন্থী বলে পরিচিত) মনে করেন—'বুর্জোয়াশ্রেণী ও তাদের পদলেহীরা যখন পচে যাচ্ছে, নষ্ট হচ্ছে যাক না! তারা যতই 'ডিমরালাইজড' হয় ততই তো জনগণের পক্ষে ভাল।' সামন্তযুগে যেমন লর্ড-নাইটরা নিজেরা বারাঙ্গনা ভবনে যেত, ব্যাভিচারে নষ্ট হোত, তেমনি অষ্টাদশ-উনিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্তও বুর্জোয়ারা কেবল নিজেরাই নষ্ট হয়েছে, জন-গণকে ততটা জড়াতে পারেনি। কিন্তু আজ এই নয়া-উপনিবেশবাদী স্তরে ক্ষয়িষ্ণু বুর্জোয়ারা নিজেদের সঙ্গে জনগণকে নিয়েই তলিয়ে যেতে চায়। এই তলিয়ে যাওয়া বা ক্ষয়ে যাওয়াটাই তাদের পুঁজি ও মুনাফার পাহারাদারী।

তবু মাত্রার হিসাবটা মাথায় রেখেই স্বীকার করতে হবে, উন্নত বুর্জোয়া সমাজে এই ধরণের সর্বগ্রাসী অবক্ষয়ের ঘটনার সঙ্গে আজও বর্ণাশ্রম

শাসিত মধ্যযুগীয় উৎপাদন পদ্ধতিতে অভ্যস্ত দুঃসহ দারিদ্র ও নিরক্ষতার কালগ্রাসে অসহায় ভারতীয় জনগণের মধ্যে বুর্জোয়াদের এই বিশেষ ভূমিকার কতটা তুলনা চলে, এ নিয়ে অবশ্যই প্রশ্ন উঠতে পারে।

আপাতদৃষ্টিতে সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের বিজ্ঞানবিরোধিতার কথা স্ববিরোধী মনে হতে পারে। যে স্তরে উৎপাদনের অবিরাম পরিবর্তন ঘটিয়ে বিজ্ঞান প্রযুক্তির দুর্গ তৈরী করছে সেখানে আবার বিজ্ঞানবিরোধিতা কিসের? আসলে সাম্রাজ্যবাদীরা বিজ্ঞান প্রযুক্তির মাধ্যমেই বিজ্ঞানের বিকৃতি ঘটাতে চাইছে এবং মানুষকে বিজ্ঞানবিমুখ করে বিজ্ঞান প্রযুক্তির মৌলিক অধিকার সম্পর্কে উদাসীন ও ভোঁতা করে রাখতে সদাপ্রয়াসী। বুর্জোয়ারা শ্রমিকের শ্রমটাকে নিচ্ছে, যন্ত্রের যন্ত্রীটাকে নিচ্ছে, কিন্তু শ্রমিক বা যন্ত্রীর মানুষটাকে বা মনুষ্যত্বকে ছেঁটেকেটে বা বিকৃত করে দিয়ে চলেছে সমানে। এইভাবে তারা বিজ্ঞান প্রযুক্তির সামাজিকীকরণের দ্বন্দ্ব থেকে বাঁচার রাস্তা নিয়তই বদলাচ্ছে। তারা জনগণের ঘরে ঘরে, বিজ্ঞান প্রযুক্তির মাধ্যমে বা আধারে অপসংস্কৃতির চোলাই পেঁাছে দিতে চায়, কিন্তু বিজ্ঞান প্রযুক্তির অধিকারটা নয়। জনগণ যদি প্রকৃতি ও সমাজ বিজ্ঞানের অধিকারে নিজেদেরকে এবং তারই উত্তরাধিকারে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে যুক্তি ও মূল্যবোধের দুর্গে পরিণত করতে পারে, তবে কি আর ঐ সব যৌনবিকৃতির অন্ধ তামসিকতা, অতি-লৌকিক শক্তি-নির্ভরতা বা পরিবর্তন বিমুখতার চোলাই দিয়ে মানুষকেও হুইল পিষ্টন বা সার্কাসের ক্লাউনে পরিণত করা যায়?

আসলে যৌনবিকৃতি, খুন ধর্ষণের এ্যান্টি-কালচারটা হল 'পাসিং ফ্যাশন।' কিন্তু এর আধার হিসাবে বিজ্ঞানবোধহীন কিছু বিজ্ঞানী ও ঐতিহ্যবোধহীন কিছু শিল্পী-সাহিত্যিক, আর ব্যাপকভাবে জৈব প্রয়োজন-সর্বস্ব যান্ত্রিক শ্রমজীবী বানাতে লাগাতার প্রয়াস চালিয়েছে। ওরা জানে বিজ্ঞান প্রযুক্তির 'সামাজিকীকরণ' ছাড়া ব্যাপকভাবে এ্যান্টি-কালচারও ছড়ানো যায় না। তাই অতীতের সবরকম ইতিবাচক ঐতিহ্য, সমাজ-সংসারের সবরকম গণতান্ত্রিক ও মানবিক উপাদানগুলিকে উচ্ছেদ করে তবেই মানুষ-যন্ত্রের হাত থেকে বিজ্ঞান প্রযুক্তির আধুনিকতম আবিস্কারকে গড়ে নিচ্ছে, একচেটিয়া মালিকানায় আগলে রাখছে। সংক্ষেপে ও সহজ করে বললে এই রকম দাঁড়ায়ঃ গাঁয়ের মজুর ঘরামিরা ইস্কুল বানিয়ে দিচ্ছে আর তাদের ঘরের ছেলেমেয়েদের কী শেখানো হবে সেটা ঠিক করবে জমিদারের নায়েব-পুরুতরা।

আজ পশ্চিমী বুর্জোয়া সমাজে প্রায় ঘরে ঘরে টেলিভিসন। লক্ষ লক্ষ শ্রমিক ও প্রযুক্তিবিদ্ এই রকম গণ-মাধ্যমের স্রষ্টা। অথচ তাতে দেখানো হচ্ছে শেক, ক্যাবারে, খুন-ধর্ষণ, অলৌকিক নায়কের বিচিত্র বীরত্ব, যৌন-বিকারের স্নায়ুরোগীদের প্রতি সমবেদনা, নগ্ন নারীদেহের বেসাতি এইসব। কী করে সম্ভব হচ্ছে? অবশ্যই গোটা জাতির অধিকাংশ মানুষের চিন্তা-চেতনার শিরায় শিরায় ঘুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে! এমনকি আজ ডারউইন-বাদের মধ্যে, অণু-বিজ্ঞানের মধ্যেও সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিকতার তত্ত্ব ঢুকিয়ে বিজ্ঞানের প্রতি, বস্তুবাদের প্রতি সমস্ত মূল্যবোধের ক্ষয়রোগ ধরানো চলছে। এই ঘটনা প্রায় একশ বছর আগে থেকেই চলছে। দুনিয়া বদলের মহান দর্শন 'কমিউনিষ্ট ম্যানিফেস্টো' (১৮৪৮) প্রকাশের সময় পাশাপাশি 'খৃীশ্চান সমাজ-তন্ত্রবাদ' বানানো হয়েছিল, বেকনের পাশে বস্তুবাদের আদল রেখে বার্কলের ভাববাদী দর্শন চালুর চেষ্টা হয়েছে। যে সময়ে জেম্‌স জিনস প্রমুখ ভাববাদীরা বিজ্ঞান ও বস্তুবাদকে গৌণ করে মনকেই বস্তুজগতের স্রষ্টা বলে ব্যাখ্যা দিচ্ছেন, সেই সময়ে লেনিন তাঁর 'বস্তুবাদ ও অভিজ্ঞতাবাদী সমালোচনা' গ্রন্থে (১৯০৮) বস্তুর সীমা অতিক্রান্তি বিবর্তনের মহান ভূমিকা তুলে ধরেছেন এবং ঐ রকম বিজ্ঞানবিমুখ আধ্যাত্মিক প্রবণতা সম্পর্কে সাবধান করে ১৯২৪ সালে লেখা এক পত্রে গোর্কিকে বলেন—'আদর্শের পোশাকে সবরকম মন ভোলানো সাজের সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিকতার ধারণা অপেক্ষা লক্ষ লক্ষ পাপ, নোংরামি, ধূর্তামি, হিংসার সংক্রমণ জনগণ সহজে বুঝতে পারেন এবং এই শেষেরগুলি প্রথমোক্ত অপেক্ষা কম বিপজ্জনক।" বলবাহুল্য, সামন্ততান্ত্রিক মোটা দাগের পুরোহিততন্ত্রের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদীদের সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিকতার পার্থক্য করতেই 'মন ভোলানো সাজ'-এর প্রশ্ন এনেছেন। তাছাড়া 'মোটা দাগ' ও সূক্ষ্মতার মাত্রাগত পার্থক্য করতেই বুর্জোয়া নোংরামি ও সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিকতার তুলনা করেছেন। বুর্জোয়া নোংরামি ও হিংসাকে আদৌ লঘু করেন নি!

প্রসঙ্গতঃ একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আজ নয়া-উপনিবেশবাদীরা দেশে বিদেশে বিজ্ঞান প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহারের মধ্যে 'অবক্ষয়ী গণ-সংস্কৃতি'র প্রচার চালাচ্ছে বলে অথবা বিজ্ঞানের মধ্যে সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিকতার ধারণা ঢুকিয়ে দিচ্ছে বলে সমাজ-প্রগতিমুখী গণতান্ত্রিক মানুষ যেন কখনোই বিজ্ঞান প্রযুক্তির নবনব আবিষ্কার ও বিপুল উপকরণগুলির বিরুদ্ধেই জেহাদ ঘোষণা না করে বা বিজ্ঞান প্রযুক্তি সম্পর্কে অনীহার

শিকারে পরিণত না হয়, এটা দেখাও সুস্থ সংস্কৃতি আন্দোলনের একটি মূল্যবান দিক।

আজ বিজ্ঞানমুখীনতার অর্থ বিজ্ঞানের সঙ্গে মানবতা ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে এক করে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ অর্জন করা। এমনই সমাজ-বিকাশের স্তরে আজ যদি কেউ 'সমাজতান্ত্রিক সাহিত্য-সংস্কৃতি' তেমন হচ্ছে না বলে বুক চাপড়ান্, তবে সেটাও এক ধরণের অবাস্তব সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতার ক্ষতিকর ঝোঁক। আমরা আজ সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি চাই না (তা এখন হবারও নয়), সমাজতন্ত্রের জন্য গণতন্ত্রের প্রসার ও যুক্তিবাদী মানবিক মূল্যবোধের সিঁড়িগুলি হাঁটতে চাই। এর জন্য ১৯০৫-১৩ সালে সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পর্কে লেনিনের লেখাগুলি বর্তমানে আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতি আন্দোলনের পক্ষে জোরালো আয়ুধ বলে মনে করি। বিপ্লবোত্তর সমাজের সাহিত্য ও সাহিত্যনীতির নজির নিরিখ আমাদের বর্তমান স্তরের প্রগতি সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে গেলে ঘোড়ার আগে গাড়ি জোড়ার মত তাজ্জব কাণ্ড হয়ে যাবে।

এইসঙ্গে এটাও খেয়াল রাখতে হবে সমাজতান্ত্রিক শিল্প-সাহিত্য, আর শিল্প-সাহিত্যের বিচারে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার তত্ত্বের প্রয়োগ এক জিনিস নয়। এই প্রসঙ্গে, বিশেষ করে ই. এম. এস নাম্বুদিরিপাদের 'সিলেক্টেড রাইটিংস' গ্রন্থের 'মার্কসিজ্ম এ্যান্ড এস্থেটিক্স' প্রবন্ধটি এবং বর্তমান প্রবন্ধকার-সম্পাদিত 'সাহিত্য শিল্প ভাবনা' গ্রন্থটি পাঠ করলে আগ্রহী পাঠক উপকৃত হবেন আশা করি।

সুস্থ কিশোর মানসের সন্ধানে

বার্ট্রাণ্ড রাসেল ইংলণ্ডের গ্রামার স্কুল পড়ুয়াদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদী 'এলিট' ভদ্রলোক বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ এদেশে ব্রিটিশ শিক্ষার কাঠামোয় লালিত ভদ্রলোক বুদ্ধিজীবীদের 'তোতা-কাহিনীর কুশীলব বলেছেন। এই প্রচলিত প্রথাবদ্ধ বিদ্যালয়ে একটি শিশু বড় হয়ে একজন 'জাতীয়তাবাদী' হতে পারে, রসায়ন, চিকিৎসা, দর্শন বা প্রাণী বিদ্যায় বিশেষজ্ঞ হতে পারে অথবা একজন ধর্মপ্রাণ নীতিবাগীশও হতে পারে; কিন্তু প্রকৃত অর্থে শিক্ষিত হওয়া অন্য জিনিস।

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পলিটিক্যাল থিওরির অধ্যাপক ডেভিড সেলবোর্ণ ৪ঠা মার্চ ১৯৮২ সালে 'দি স্টেটসম্যান' পত্রিকায় রচিত শিক্ষা ও ভাষার সম্পর্ক ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন—"ভারতের সর্বনাশ করেছে পরাধীনতা। তার আর্থিক রাজনৈতিক সর্বনাশ শুধু নয়, তার সাংস্কৃতিক সর্বনাশও ডেকে এনেছে। যে সব ভদ্রলোক বাজে ইংরেজী বলে তাঁরা আমার কাছে ক্ষমা চেয়ে নেন, নিজেদের সাংস্কৃতিক অন্ত্যজ মনে করেন। কিন্তু যাঁরা আমার চেয়েও ভাল ইংরেজী বলেন তাঁরা রঙবেরঙের পেখম ধরে রাজস্থানের ময়ূরের মত নেচে বেড়ান। আর বাংলা (মাতৃভাষা) বলিয়ে ইতর দাঁড়কাকদের দাবড়ে বাহারে ইংরেজী অ্যাকসেন্টের পেখম মেলে ঘুরে বেড়ান পার্টিতে।"

শিক্ষা বা সংস্কৃতির অধিকার অর্জনের ঘটনা অনেকটা মানবদেহের সুষম বিকাশ প্রক্রিয়ার মতোই ঘটনা। কোন একটা বিশেষ অঙ্গের পেশী স্পষ্ট বা জোরালো হলেই যেমন সুদেহী বা স্বাস্থ্যবান পুরুষ বলা যাবেনা, তেমনি 'আমি রসায়নবিদ বা পদার্থবিদ, সঙ্গীতে রুচি নেই; অথবা 'আমি ইতিহাসে বিশেষজ্ঞ—নৃতত্ত্বে, সৌরবিজ্ঞানে বা নাট্যকলায় আকর্ষণ বোধ করিনা; 'আমি ভাল ইংরেজী জানি, প্রাচীন ইতিহাস বা বিজ্ঞান বুঝি না' এরকম যাঁরা বলেন বা প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থার ছাঁচ যাঁদের দিয়ে এই রকম কথা বলায়, নিঃসন্দেহে তাঁদের শিক্ষা খণ্ডিত, মানবব্যক্তিত্বের গঠনেও তাঁরা অসম্পূর্ণ। প্রকৃত শিক্ষা কখনই যা কিছু মানবিক তা থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। এই প্রসঙ্গে প্রখ্যাত নন্দনতাত্ত্বিক ও শিক্ষাবিদ আনাতোলি লুনাচারস্কি 'অন এডুকেশন' গ্রন্থে বলেছেন একজন শিক্ষিত নাগরিক হওয়া মানে শুধুই কোন

বিষয়ে দক্ষ বা বিশেষজ্ঞ হওয়া নয়, সেইসঙ্গে তাকে সামাজিক ঐতিহ্য, মানব-সভ্যতার বিকাশে মানবিক শক্তিগুলির অবদান, সমকালের পারিপার্শ্বিক বাস্তবতা সম্পর্কে অনুভূতিশীল ও চেতনাসম্পন্ন মানুষও হয়ে উঠতে হবে, বিশেষ ও সাধারণের সম্মিলনে যে ঐক্যতান, তার প্রতিটি এবং সামগ্রিক সুর সম্পর্কে আগ্রহী ও স্পর্শকাতর হতে হবে। তবেই সেই দক্ষতা ও চেতনা-সঞ্চারী শিক্ষাই সমাজ-পরিবর্তনের সাংস্কৃতিক হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে। যুগে যুগে মানুষ প্রাকৃতিক ও সামাজিক উপাদানগুলিকে ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করেছে এবং শিক্ষা-সংস্কৃতির উন্নততর মানবিক ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছে।

শিক্ষার অর্থই হল, ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ প্রক্রিয়ায় স্তরে স্তরে কার্যকর সহযোগিতা দেওয়া এবং সমাজ বিকাশের সঙ্গে ব্যক্তিত্বের গঠন প্রক্রিয়াকে এমন ভাবে যুক্ত করা যাতে শিক্ষার্থী সমাজ পশ্চাদ্‌গতির উপাদানগুলিকে বর্জন করতে শেখে এবং তার অর্জনের কোঠায় যেন বস্তুসম্পদ নির্মাণের ও মানবিক মূল্যবোধগুলির ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকে। এখানেই ব্যক্তিত্বের গঠনে পরিবেশ ও ইতিহাস সচেতনতার গুরুত্ব।

যখন বলি, সমাজের গতিশীলতা সম্পর্কে বোধের বিকাশ তখন অতীত বর্তমান, দেশ ও বিশ্বের ধারণা যুক্ত থাকে। অথবা যখন বলি, মানুষের বাস্তব অভিজ্ঞতা, যা শিক্ষা-প্রক্রিয়ার অন্যতম প্রধান উপাদান, তখন উৎপাদনশীল শ্রমের এবং মননশীল মানবিক অনুভূতির মূল্য ও ইতিহাস সঞ্চালনের প্রক্রিয়াকে শিক্ষার ভিত্তি থেকে পর্যায়ক্রমিক বিকাশের মধ্যে সত্য বলে গ্রহণ করাই গণতান্ত্রিক ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি।

আমাদের দেশের সংবিধানে গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাব্যবস্থার কথা একাধিক কমিশনের সুপারিশে, সার্বজনীন উৎপাদনশীল শিক্ষার কথা বড় গলায় বলা হলেও এযাবৎ একটি জাতীয় গণতান্ত্রিক শিক্ষার পরিকল্পনা কার্যকর হল না। এখানে প্রাপ্তবয়স্কদের সার্বজনীন ভোট আছে, জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন পর্ষদ রয়েছে, কিন্তু সার্বজনীন, জাতীয় ও গণতান্ত্রিক শিক্ষার কোন কর্মসূচী নেই, যার ফলে 'বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ'-এ আজ বিপুল শ্রমশক্তি অপচয়ের দারিদ্র ও নিরক্ষরতার রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছে; এবং যার ফলে প্রাকৃতিক ও মানবিক সম্পদে সমৃদ্ধ এই দেশ বৃহৎ পুঁজিপতি, জমিদার-জোতদার ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির মুনাফা-মৃগয়ার মোক্ষম লীলা-ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। বোঝা যায়, কেন বিগত দুই শতাব্দীর ঔপনিবেশিক

শিক্ষার প্রান্তিক কিছু রদবদল করে সর্বস্তরেই প্রধানত সামাজিক ইতিহাসবোধ বর্জিত উৎপাদনবিমুখ অবাস্তব 'প্যাকেজ ডিল' পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচী চালু রাখা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের শিক্ষার কর্মসূচীতে স্বভাবত কিছু ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়েছে, যদিও ভারতের জাতীয় এবং গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য সর্বভারতীয় শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ (বিশেষ করে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক স্বীকৃত কোঠারী কমিশন ও এন সি ই আর টি) এবং 'ইউনেস্কো' প্রভৃতি বিশ্ব-সংস্থার স্বীকৃত নীতিগুলির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

তবু ভিন্নতর দৃষ্টিভঙ্গির কথা বললাম এই কারণে: ১. শুধু নীতি গত স্বীকৃতি নয়, প্রয়োগের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ। ২. এই প্রথম প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন স্তরের ও সংগঠনের প্রতিনিধিদের অভিজ্ঞতা ও বক্তব্যের সংহতি সাধন। ৩. শিশুর সর্বাঙ্গীন বিকাশের প্রয়োজনকে গতিশীল সমাজের চাহিদার সঙ্গে সমন্বয়করণ। ৪. ছয় থেকে এগারো বছরের শিশুর, বিশেষ করে অবহেলিত দরিদ্র শ্রমজীবী শ্রেণীর শিশুদের প্রয়োজনকে গুরুত্ব দান। ৫. সামাজিক প্রসঙ্গ ও যুক্তিনির্ভর জ্ঞানের সংযুক্তিকরণ।

বামফ্রন্ট সরকারের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির কথা আরও বললাম এইকারণে, যেখানে এতদিন পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষার কোন উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যই ছিল না, সেখানে এই প্রথম সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে সামনে রেখে প্রাথমিক শিক্ষার বাস্তবমুখী কর্মসূচীর রূপায়ণ সুরু হয়েছে।

প্রাথমিক স্তরে অর্থাৎ ৬—১১ বছর পর্যন্ত শিশুদের ইতিহাস পাঠের অপর নাম পরিবেশ বা সমাজ-পরিচিতি।

কেন শেখানো হবে? সাধারণ উদ্দেশ্য হল:

ক. উপযুক্ত নাগরিক করা। খ. গণতান্ত্রিক, সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধ জাগানো। গ. সমাজ ও প্রকৃতি সম্পর্কে কু-সংস্কারমুক্ত যুক্তি-বাদী মনোভাব গড়া। ঘ. নিজের দেহ ও পরিবেশ সম্পর্কে একটা মর্যাদাবোধ গড়া এবং সেইমত জীবন চর্চায় অভ্যস্ত করা।

এই স্তরে তারা জানবে রোজকার অভিজ্ঞতার সঙ্গে সামাজিক কাজগুলির সম্পর্ক। সমাজের উন্নয়নমূলক কাজের সঙ্গে যে মানুষের শ্রমশক্তির ভূমিকা কত মূল্যবান, সেটাও জানবে। সেই সঙ্গে জানবে পরশ্রমজীবী বা শ্রমবিমুখ অংশের জন্যই মানুষের এত দুঃখ ও অপমান।

শিশু-শিক্ষায় সমাজ বা ইতিহাস পরিচয়ের মধ্যে দেশ, বিশ্ব এবং সমাজ যে বদলায়, এই দৃষ্টিভঙ্গি জাগানোর এবং প্রাকৃতিক ঘটনা ও সামাজিক বিষয়-গুলির প্রতি বিজ্ঞানসিদ্ধ পর্যবেক্ষণী শক্তির গোড়াপত্তন করানোর ব্যবস্থাও থাকবে।

এই স্তরেই শিশুদের জিজ্ঞাসু ও অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিভঙ্গিকে উৎসাহিত করতে হবে, আর মানব জাতির সভ্যতা বিকাশে শ্রমশীল মানুষের অবদান সম্পর্কে শ্রদ্ধাবোধ জাগানো হবে। এর সঙ্গে মানুষের প্রতি ভালোবাসা ও বিশ্বপ্রেমের আলোকে দেশের প্রতি ভালোবাসা জাগাতে হবে।

শিশু নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং পরিবার-জীবন থেকে শুরু করে গ্রাম, পাড়া-পড়শি, কারখানা ঘর, খেলার মাঠ, হাটবাজার, বিদ্যালয়, গ্রাম-শহরের বাড়ী ঘর, গাছপালা, পাখি, শহরের বাজারে কোথা থেকে কারা শাকসব্জি আনে, বিদ্যালয়ের পরিবেশে সংঘবদ্ধতার ও পরিচ্ছন্নতার মূল্যবোধ—এইসবই জানবে শিখবে।

তারা শিখবে পরিবারের সঙ্গে কেমন আচরণ করতে হয়। এর মধ্যে গড়ে উঠবে প্রীতি ও শ্রদ্ধার সম্পর্ক।

তারা জানবে—এখন যে বাড়ী বা ঘরে তারা থাকে, সেগুলি কারা তৈরী করেছে, আগে মানুষ কি রকম ঘরে বাস করত, বাড়ীঘর তৈরীর জিনিসপত্র কোথা থেকে কিভাবে পাওয়া যায়। বাড়িতে বাগান, রোদ হাওয়া ও বিশুদ্ধ পানীয় জল থাকার দরকার কেন, যাদের বাড়িঘর নেই তারা কিভাবে থাকে—এইসব।

এই স্তরের ইতিহাস পাঠে থাকবে পাড়া, গ্রাম, থানা, পোস্ট-অফিস পঞ্চায়েত, মিউনিসিপ্যালিটি, জেলা, রাজ্য, দেশ সম্পর্কে সরল প্রাথমিক ধারণা। শিশু জানবে তার পরিচিত মানুষজন কে কি কাজ করে, পাড়ার লোকেদের যৌথ কাজ ও উৎসবে যোগদান, পোষাক ও খাদ্য ব্যবহার ইত্যাদি।

শিশুর ইতিহাসবোধে আসবে গ্রাম-শহরের পার্থক্য সম্পর্কে ধারণা, খাল, নলকূপ, পাম্পসেট, যানবাহন, আলো ও ডাক-তারের ব্যবস্থা, চিকিৎসা, রেল ষ্টেশন এইসব। সে আরও জানবে, জমিতে কি কি ফসল হয়, জমি কাদের, কারা জমিতে কাজ করে, হাল বলদ, সার। গ্রামে আর কি কি জিনিস কারা কিভাবে তৈরী করে, শহরের কারখানায় কারা কি কি জিনিষ তৈরী করে। শিশু জানবে মানুষের সঙ্গে যুক্ত প্রকৃতির সম্পর্ক, মানুষ তার বুদ্ধি ও শ্রম দিয়ে পেয়েছে খাদ্য, পানীয়, কাঠের ও ধাতুর জিনিষপত্র, হাজার হাজার বছর

ধরে আবিষ্কারের ফল হিসেবে পেয়েছে বিদ্যুৎ, রেডিও, রেলগাড়ি, আকাশ যান, মোটরগাড়ি ও আরও কত জিনিস।

শিশু একটু বড় হয়ে ৯—১০ বছরে শিখবে—সভ্য সমাজের অবদানগুলি, অর্জন করবে মানুষের সভ্যতার ক্রমিক উন্নতি সম্পর্কে নতুন নতুন মূল্যবোধ।

এখন সে পড়বে মানুষের সভ্যতার গল্প : আদিম মানুষ—প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই, আগুনের আবিষ্কার, খাদ্য সংগ্রহ অভিযান, পশুশিকার, পাথরের হাতিয়ার, ভাষার জন্ম, সবারই সমান কাজ সমান ভোগ।

এইভাবে পরপর সে জানবে পশুপালনের যুগ গোষ্ঠীজীবনের যুগ, মিশর, সিন্ধু, চীন সভ্যতার গল্প, লোহা আবিষ্কারের ফলে নতুন যুগের গল্প, কৃষি-ধাতু-লিপির যুগ, সবাই সমানের যুগ থেকে দাস-শ্রমের যুগে আসার কাহিনী।

এইবার সে জানবে ভূমিরাজ ও ভূমিদাসের কাহিনী। সেইসঙ্গে যন্ত্রপাতির উন্নতির সঙ্গে কুটিরশিল্পের পাশে পাশে কিভাবে ছোট ছোট কারখানা গড়ে উঠছে, তা-ও জানবে এবং তার ইতিহাস-জ্ঞানের পরিমণ্ডলে আসবে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার, গোষ্ঠী থেকে বড় রাজ্য দখল, জমি, খনি ও রাজ্য দখলের জন্য গ্রীক পারসিক যুদ্ধ, ভারতে পারসিক অভিযান, তুর্কি ও আফগান অভিযান।

এর পাশাপাশি সে শিখবে ধর্মীয় গোঁড়ামি ও অস্পৃশ্যতা কাকে বলে এবং তার বিরুদ্ধে নানক, কবীর, যীশু, বুদ্ধ, মহাবীর ও মহম্মদের প্রচার, সে জানবে নালন্দা ও তক্ষশীলার কথা, অজন্তা-ইলোরা ও তাজমহলের কথা এবং বেদ, কোরাণ, উপনিষদ প্রভৃতি ধর্ম-সাহিত্যের কাহিনী।

শিশু এরপর ১১—১২ বছর বয়সে জানবে : ভৌগোলিক আবিষ্কারের সঙ্গে বাণিজ্যের এবং বাণিজ্য-বিস্তারের সঙ্গে উপনিবেশ গড়ার কাহিনী; আধুনিক বিজ্ঞান, বাষ্প ও বিদ্যুতের সঙ্গে সহজতর ও উন্নত জীবনের সম্পর্ক; শিল্প কারখানার প্রসারে অসংখ্য শ্রমিক ও মুষ্টিমেয় মালিকের সম্পর্ক, শিল্প ও কৃষি-শ্রমিকদের জীবনযাপনের পরিবেশ; আধুনিক যোগাযোগ ও পরিবহন; আধুনিক রাষ্ট্রগুলির মধ্যে যুদ্ধ; দেশে দেশে মানুষের আন্দোলন ও বিদ্রোহের কাহিনী; পরাধীন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনী; মনীষীদের জীবন ও কর্মসাধনার কথা; সকল মানুষের সুখ শান্তির জন্য আগ্রহ উদ্দীপক ঘটনা ও কাহিনী।

শিশু ও কিশোরদের মানসগঠনের ভিত্তি এইসব উপাদানে গড়া হলে পর তবেই মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে তার বুদ্ধি ও ভাবাবেগের মধ্যে একটা স্বাভাবিক চলাচল ঘটবে এবং এই রকম ভিত্তি ও ক্রমবিকাশের প্রক্রিয়ায় অখণ্ড মানবব্যক্তিত্ব গড়ে উঠবে।

কিন্তু এমন ব্যক্তিত্বের বিকাশের পথে আজ কত না কাঁটা ও বিষাক্ত উপাদান ছড়ানো শিশুর চারপাশে! তার পরিবার ও বিদ্যালয়ের বয়স্করা কতটা এ ব্যাপারে সচেতন? এই আত্মজিজ্ঞাসা যদি থাকত, তবে কি 'ভগবান আমাকে পৃথিবীতে এনেছেন', 'ভগবানই সর্বশক্তিমান' থেকে সুরু করে 'পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভূতের গল্প', 'দেশ-বিদেশের যাদুকর', 'পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গোয়েন্দা কাহিনী', অরণ্যদেবের অলৌকিক বা ভেক-বৈজ্ঞানিক শক্তিকে সত্য বলে বিশ্বাস করানো ইত্যাদি শিশু-সাহিত্যের আসরে বাজার ছেয়ে যেত? এ সবের বিরুদ্ধে যে প্রতিরোধ একেবারেই নেই তা বলছি না। তবু কিশোর-মানসের ভিত্তিটা যদি দুর্বল, খণ্ডিত ও সংকীর্ণ হয়, তবে বলিষ্ঠ যুক্তিবাদী যুব-মানসের জন্য সভা-সমিতিতে গলা ফাটিয়ে খুব একটা লাভ হবার আশা ঠিক নয়। যুবসমাজের মূল্যবোধহীনতা ও বোহেমিয় বেপরোয়াপনার রূপটার মুখে কোন মুখোশ থাকে না, ওটা প্রত্যক্ষ। কিন্তু তথাকথিত পণ্ডিত-বুদ্ধি-জীবীদের ঐতিহ্যবিমুখতা ও বিজ্ঞান-বিরোধিতার ঝোঁকগুলি বিদ্যা অর্থ ও সামাজিক ইমেজ-এর মুখোশে ঢাকা থাকে বলে চট্ করে বোঝা যায় না। এঁদের বক্তব্য ও আচরণকে শিশু-কিশোররা বৈদিক শিক্ষার মত গ্রহণ করে। তাঁরা জ্যোতিষকে বিজ্ঞান বলে চালু করেন; অর্থাৎ ধর্মবিশ্বাসকে একটা বৈজ্ঞানিক প্রলেপ দিয়ে নিজেদের সঙ্গে আগামী প্রজন্মকেও অন্ধ নিয়তিবাদের মাদুলি-তাবিজে বেঁধে রাখেন। অথচ সারা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও জীববিজ্ঞানীরা বলেছেন—'শিশুর জন্মমুহূর্তে গ্রহ-নক্ষত্রের কোন মাধ্যা-কর্ষণ বা তেজষ্ক্রিয় প্রভাব আদৌ থাকে না। জ্যোতিষ-শাস্ত্র আদৌ কোন বিজ্ঞান নয়।' কিন্তু চশমার দোকানের সঙ্গে চোখের ডাক্তারের চেম্বার লাগানোর মত সোনা-রুপা-হীরা-পান্না-নীলাদি পাথরের দোকানের সঙ্গে জ্যোতিষীর বেদী ও তার বিজ্ঞাপন যেন দিনদিন বেড়ে যাচ্ছে। এ সব কি সমাজের কিশোর ও যুবকদেরই অপসঙ্গীতি বা অবদেবতার চোখ-লাগা?

বেদপাঠ বা মন্ত্র শুনে ফেললে সেকালে শূদ্রের কানে গরম শিসা ঢেলে দেওয়া হত; একালে এখনও উচ্চবর্ণ ব্রাহ্মণদের জন্য নির্দিস্ট কুয়োর জল

কোন তৃষ্ণার্ত হরিজন বালক পান করলে তাকে গাছে বেঁধে পুড়িয়ে মারা হয়। এইসব 'শাস্ত্র-নির্দেশিত' পবিত্র ঘটনাও তো সমাজে উচ্চকোটির ভদ্র সংস্কৃতি (যা সংস্কার বা পরিমার্জনার দ্বারা গৃহীত) বলেই স্বীকৃত! ডঃ সুকুমার সেনের মত শতশত পণ্ডিত-বুদ্ধিজীবী একমাত্র সংস্কৃত ভাষা-সাহিত্যকেই, বেদের ব্যবস্থাপত্রকেই ভারত-সংস্কৃতির আদি উৎস বলেই ধরে রেখেছেন, যেমন গঙ্গার উৎস গঙ্গোত্রী। এই সূত্রেই ১৯৮৩, ১৮ই সেপ্টেম্বর আনন্দবাজার পত্রিকার রবিবাসরীয়তে ডঃ সেন ব্রাহ্মণ্য বা বিশুদ্ধ বাঙালী এবং 'ম্লেচ্ছ বাঙালী'র ভাগ দেখিয়ে আজও সংস্কৃতি ও অপসংস্কৃতির ভাগ্য গননা করেছেন, যদিও 'অপসংস্কৃতি' শব্দটির ব্যাকরণগত শুদ্ধতা স্বীকার করে নিজেই বলছেন যাঁরা 'অপসংস্কৃতি' শব্দের সমর্থক তাঁরা 'ম্লেচ্ছ বাঙালী'। সেকালেও ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির মুনি-ঋষিরা লোক-সংস্কৃতি, লোক-সাহিত্য এবং লোকায়ত দর্শনকে 'ব্রাত্য' ও অস্পৃশ্য মনে করত। একালেও তাঁদের বংশধরদের অনেকের কাছেই শ্রমজীবী গরিব জনগণের বস্তুবাদী সংগ্রামী সংস্কৃতির ঐতিহ্য বহুা 'ম্লেচ্ছ বাঙালী'র কাণ্ড। কিন্তু এতে আশ্চর্য হতে হয় তখনই, যখন এইসব প্রবীণ পণ্ডিতরা ঘরে নাতি-নাতনীদের নিয়ে টেলিভিসনে ভারতীয় উপগ্রহ উৎক্ষেপণের দৃশ্য দেখে সান্ধ্য নৈমিত্তিক গুরুর মন্ত্রপূত তাবিজধোয়া জল পান করেন। কাজেই আজ সুস্থ কিশোর-মানসের জন্য, বলিষ্ঠ যুবমানসের জন্য বয়স্কদেরও উপনয়ন বড়োই জরুরী হয়ে উঠেছে।

আমাদের দেশে ৩২ শতাংশকে সাক্ষর ধরা হয়। প্রশ্ন হল, এই পুরো অংশটাই কি শিক্ষিত? আবার বাকী আটষট্টি শতাংশ নিরক্ষর মানুষের সবাই কি অশিক্ষিত? নিঃসন্দেহে লিখিত ভাষা পড়তে ও বুঝতে পারা শিক্ষার একটি মূল্যবান অঙ্গ। তবু কোন্ লক্ষ্যে, কাদের জন্য এবং কী বিষয়বস্তু সেই লিখিত অক্ষরে ভাষা পাচ্ছে সেটাও আজ বিচার করা, বিশেষ করে জাতীয় শিক্ষা ও উন্নয়ন প্রকল্পের স্বার্থে, একান্তই প্রয়োজন।

ধরা যাক, একটি শিশু বা বয়স্ক নিরক্ষরকে শেখানো হচ্ছে 'সবার উপরে আমার ধর্ম', আমার দেশ' অথবা ঐ 'ভাঙা জমিদার বাড়িতে আজও রাজা প্রতাপ-নারায়ণের প্রেতাত্মা কেঁদে বেড়ায়'। এই ধরণের 'সাক্ষর' মানুষে দেশ ভরে গেলে জাতীয় কলংক বা অভিশাপ ঘুচবে কি? এই ধরণের পুঁথিগত বিদ্যায়

সামন্ততন্ত্রী, স্বৈরতন্ত্রী ও ফ্যাসিবাদী সংস্কৃতির উপাদান থেকে গেছে বলেই দেশে দেশে বর্ণ দাঙ্গা, উগ্র জাতীয়তাবাদ, বিচ্ছিন্নতাবাদ, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ, জাত-পাতের ভেদবুদ্ধি মাথাচাড়া দেয়—সারা দুনিয়ায় মানবতা ও সভ্যতা-বিরোধী যুদ্ধের অভিশাপ বার বার নেমে আসে।

যদি কোন বয়স্ক শিক্ষার্থী 'সদা সত্য বলিবে, মিথ্যা বলা পাপ, পৃথিবী ভগবানের মন্দির, বিদ্বান সর্বত্র পূজা পান ধরণের অক্ষরমালা বা নীতিকথা পড়তে শিখে বসন্ত মহামারীতে টীকা না নিয়ে শীতলার ফুল ছোঁয়ায় কিংবা সমবায় ব্যাংকে না গিয়ে 'চোদ্দ পুরুষের মা-বাপ' মহাজনের শ্রীচরণে হত্যে দেওয়াকেই সার করে চলে, তবে কি ঐ সাক্ষর কৃষক জাতীয় গৌরবের হিসাবে পড়বেন ? অথবা যেসব ডক্টরেট বা অধ্যাপক বিজ্ঞানী সাঁইবাবাদের শিষ্য হন, আঙুলে নানা রঙের পাথর পরে ভাগ্য ফেরাতে চান, তাঁরা আমাদের দেশে সাক্ষরদের কোঠায় থাকলেও সুস্থ সংস্কৃতির পক্ষে যে নেই একথা বলাই বাহুল্য। আমার অভিজ্ঞতা ইংরেজি-মাধ্যম স্কুলগুলিতে কেরিয়ার-বিল্ডার সাক্ষররা না ঘরকা—না ঘাটকা। এরা 'ব্রেন ড্রেন' হওয়াকেই শিক্ষা বা জীবনের সার্থকতা বলে বোঝেন।

সম্প্রতি শিক্ষক জীবনের সুযোগ নিয়ে ক্লাসে ৫০টি কিশোর ছাত্রকে প্রশ্ন করে জেনেছি, আশি শতাংশ পড়ে কমিক্‌স ও বাজারী রহস্যকাহিনী, ১০ শতাংশ ভালবাসে ফেলুদা ধরণের গল্প ও ভূতের গল্প, ৫ শতাংশ পড়ে শিকার ও ভ্রমণকাহিনী, ১ শতাংশ পড়ে শরৎচন্দ্রের গল্প। ১২-শ শ্রেণীর ৫০টি ছাত্রের ক্লাশে প্রশ্ন রাখলাম—'ইস্রায়েল-লেবাননের যুদ্ধে তুমি কার পক্ষে ?' উত্তর : আশি শতাংশ জানে না ব্যাপারটা কি, দশ শতাংশ বললো, যারা চাকরি দেবে তাদের পক্ষে, ১ শতাংশ বললো—স্বাধীনতার জন্য যারা লড়ছে তাদের পক্ষে।

এই যে ভয়াবহ 'জেনারেসন গ্যাপ', এর থেকে মানবিক ও গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যকে বের করে আনতে না পারলে এবং তাকে সমগ্র জাতীয় শিক্ষা প্রকল্পে স্তরে স্তরে সংগঠিত ও সঞ্চালিত করতে না পারলে কেবলই সাক্ষরতার হার বৃদ্ধিতে জাতীয় ও সমাজ উন্নয়নের কর্মসূচী সফল হতে পারে না। এই কারণেই বলছি শিক্ষা মানেই সংস্কৃতি, যার সুস্থ ভিত্তির উপরই গড়ে উঠবে এই বহুজাতিক শ্রমজীবী মানুষের দেশ। এ রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকারের নবপ্রকাশিত প্রাথমিক স্তরের গণিতের বইয়ে যখন দেখলাম টীকা নেওয়া এবং না-নেওয়া গ্রামবাসীর হিসাব, মহাজনী ঋণ ও সমবায় ব্যাঙ্কের গুণগত ও

সংখ্যাগত পার্থক্যের হিসাব শেখানো হচ্ছে, তখনই বুঝলাম গয়লার দুধে জল দেওয়ার অংকের বিরুদ্ধে—সামাজিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে কিশোরমনে একটা সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা হচ্ছে—সুস্থ সমাজমুখী বৈজ্ঞানিক চেতনার বীজও ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে।

বর্তমান সমাজে কেবলই প্রথাবদ্ধ বিদ্যালয়ের গণ্ডীর মধ্যে নয়, প্রথা-বহির্ভূত সর্বস্তরের শিক্ষা প্রকল্পেই এমন সমাজমুখী জীবন্ত উপাদান চাই।